মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

মহাসত্যের সন্ধানে

মহাসত্যের সন্ধানে

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

খায়রুন প্রকাশনী
বিক্রয় কেন্দ্র ঃ বুক্‌স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
দোকান নং- ২০৯, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০
ফোন ঃ ৭১১১৫৯৮২, ৮৩৫৪১৯৬, ০১৭১৫-১৯১৪৭৭, ০১৭১২-১৮৫০০০

www.pathagar.com

মহাসত্যের সন্ধানে
মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

প্রকাশকাল : ১৯৯৮
৮ প্রকাশ
এপ্রিল : ২০১০
বৈশাখ : ১৪১৭
জমাদিউল আউয়াল : ১৪৩১

প্রকাশক :
মোস্তফা তারেকুল হাসান

প্রচ্ছদ শিল্পী :
আবদুল্লাহ যুবাইর

শব্দ বিন্যাস :
মোস্তাফা কম্পিউটার্স
১০/ই-এ/১ মধুবাগ, মগবাজার,ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণ :
আফতাব আর্ট প্রেস, ২/১ তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা

ISBN 984-8455-39-3

মূল্য : ১০০.০০ টাকা

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। এ যুগে বিজ্ঞান অভাবনীয় উন্নতি সাধন করেছে। বিজ্ঞানের আশীর্বাদে মানুষের জীবন প্রচণ্ডভাবে গতিমান হয়েছে। স্থান ও কালের দূরত্ব হ্রাস পেয়ে গোটা পৃথিবী মানুষের হাতের মুঠোয় এসেছে। আধুনিক বিজ্ঞান মানুষের হাতে পারমাণবিক শক্তি ও কম্পিউটার প্রযুক্তি তুলে দিয়েছে। যুগ-যুগান্তরের স্বপ্নকে সফল করে বিজ্ঞান গ্রহলোকে মানুষের অভিযাত্রাকে সম্ভবপর করে তুলেছে। বিজ্ঞানের এই অবদান নিঃসন্দেহে মানুষের সমাজ ও সভ্যতাকে বিপুলভাবে সমৃদ্ধ করেছে। তার মন-মানস ও চিন্তা-চেতনার পরিধিকেও বাড়িয়ে দিয়েছে।

কিন্তু বিজ্ঞানের এই অপরিসীম সাফল্য মানুষের চিন্তার রাজ্যে কিছু কিছু বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি করেছে। এক শ্রেণীর মানুষ ধরে নিয়েছে যে, বিজ্ঞানের কাছেই বিশ্বলোকের সব রহস্যের সন্ধান রয়েছে। বিজ্ঞানই পারে মানুষের সবরকম প্রয়োজন ও চাহিদা মেটাতে। অতএব, বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের কাছে ধর্মের কোন আবেদন নেই। ধর্মের শূন্যস্থান বিজ্ঞানই পূর্ণ করে দিয়েছে। কিন্তু সত্যিই কি ব্যাপারটি তাই? বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সাফল্যের দরুণ ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে? নিঃসন্দেহে এ একটি কঠিন প্রশ্ন। এ যুগের মহান ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত আল্লামা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) এ কঠিন প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছেন তাঁর এই যুগান্তকারী গ্রন্থে। আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বশেষ তত্ব ও তথ্য বিশ্লেষণ করে এ গ্রন্থে তিনি অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছেন যে, ধর্ম মানব জীবনের কোন আপেক্ষিক সত্য নয়, বরং এটি জীবনের সব চেয়ে মৌলিক সত্য। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার ফলে ধর্মের প্রয়োজন এতটুকু ফুরিয়ে যায়নি, বরং তা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

পাঁচটি স্বতন্ত্র ও সুনির্বাচিত প্রবন্ধ নিয়ে এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে। গত ষোলো বছরে এর তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এবং বিদগ্ধ সমাজে ব্যাপক সমাদর লাভ করেছে। ইতিমধ্যে "In Quest of Truth" নামে এর ইংরেজী অনুবাদও পাঠকদের হাতে পৌছেছে। বর্তমান সংস্করণে লেখকের "শাশ্বত সত্তার সন্ধানে" শীর্ষক একটি নতুন প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হওয়ায় গ্রন্থটির কলেবর ও আবেদন পূর্বাপেক্ষা অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া বর্তমান সংস্করণে গ্রন্থটির মুদ্রণ, অঙ্গসজ্জা ইত্যাদির প্রতিও বিশেষ যত্ন নেয়া হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, গ্রন্থটির এ সংস্করণও পাঠকদের কাছে যথোচিত সমাদর লাভ করবে।

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
সেক্রেটারী,
মওলানা আবদুর রহীম ফাউণ্ডেশন

www.pathagar.com

দুটি কথা

আমার লিখিত 'মহাসত্যের সন্ধানে' বই–এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। এজন্য আমি মহান আল্লাহ্ তা'আলার শোকর আদায় করছি।

আমার আজীবনের সাধনা যে 'মহাসত্যের সন্ধানে' নিয়োজিত, যে 'মহাসত্যের সন্ধানে' আমি বাংলা ভাষায় জনগণকে দিতে চেয়েছি জীবনের যাবতীয় সংগ্রাম ও ত্যাগ–তিতিক্ষার মাধ্যমে, তারই বিশ্লেষণ করেছি এই গ্রন্থটিতে। আধুনিক চিন্তায় যে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক দৃষ্টিকোণ প্রকট, এই বইখানিতে বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে সেই দৃষ্টিকোণকে পুরাপুরি অবলম্বনে আত্মনিয়োগ করেছিলাম। বাংলা সাহিত্যে মহাসত্যের সন্ধানে এই দৃষ্টিকোণ আদৌ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়নি, অথচ যুগচিন্তার সমুন্নত মানের প্রেক্ষিতে তা একান্তই কাম্য। আমার সাধনার সর্বোচ্চ এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্যাস এই গ্রন্থখানি জনগণের সামনে উপস্থাপিত করে মহান আল্লাহ্র অর্পিত দায়িত্ব পালনেরই চেষ্টা করেছি মাত্র। এতে আমার নিজরে কোন কৃতিত্ব নেই।

বইখানির প্রথম প্রকাশের পর উচ্চ শিক্ষিত বিদগ্ধ সমাজে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বর্তমান সংস্করণেও সে ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন থাকবে, এই আশা আমি পোষণ করছি।

ঢাকা — মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

নভেম্বর ১৯৮৬

www.pathagar.com

সূচীপত্র

ভূমিকা	সাত
মহাসত্যের সন্ধানে	১
মানব মনের জিজ্ঞাসা	১
প্রশ্নেরজবাব	২
প্রশ্নের স্বরূপ	৩
জবাবেরপর্যালোচনা	৪
বিশ্বলোকের পরিচালক কে	৬
মা'বুদ কে	৯
মানুষের পরিণতি কোথায়	১৭
এ জগৎ ও জীবন অসম্পূর্ণ	১৯
পূর্ণাঙ্গ জীবন জগত কোথায়	২১
মানুষের অসহায় অবস্থা	২৩
মানুষের সীমাহীন অক্ষমতা	২৪
রাসূল (স)–এর নির্ভুল জবাব	২৬
জবাবেরপর্যালোচনা	২৭
জবাবেরতাৎপর্য	২৮
প্রথম বিশেষত্ব	২৯
দ্বিতীয় বিশেষত্ব	৩১
তৃতীয় বিশেষত্ব–কুরআন মজীদ	৩৩
কুরআনেরবৈশিষ্ট্য	৩৩

www.pathagar.com

কুরআনের মুজিযা ৩৯
দর্শন, বিজ্ঞান ঃ ধর্ম ৪৪
আইনেরব্যর্থতা ৪৪
বস্তুবাদীদর্শন ৪৬
প্রেরণা ও অনুপ্রেরণার অভাব ৪৭
নিরুপায়েরউপায় ৪৮
প্রাচীরবিহীন ছাদ ৫২
ধর্মের প্রতি অনীহা কেন? ৫৫
বিজ্ঞানের নামে অবৈজ্ঞানিকতা ৫৭
বিজ্ঞান ধর্মের সমর্থক ৬০
বিজ্ঞানের সর্বশেষ স্বীকারোক্তি ৬৪
বিদ্বেষে আচ্ছন্ন মহাসত্য ৬৭
মানুষের স্বাভাবগত দুর্বলতা ৬৮
শেষ কথা ৬৯
যুক্তিবাদের যুক্তিহীনতা ৭১
নিছক বিবেক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধ ৭৮
ধর্মবিরোধী যুক্তিবাদ ৭৯
শাশ্বত সত্তার সন্ধানে ৯১
শাশ্বত জীবনের সন্ধানে ১১৭

www.pathagar.com

ভূমিকা

আমার জীবনের বিগত পঁচিশ–ত্রিশ বছরের গ্রন্থ–প্রণয়ন সময়ে আমি যেসব বক্তব্য সমাজের সামনে রাখতে চেষ্টা করেছি, সেই মৌল বক্তব্যের মর্মকথাই প্রতিফলিত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থ 'মহাসত্যের সন্ধানে'। কিন্তু এই গ্রন্থের ভঙ্গী, দৃষ্টিকোণ ও উপাদান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই বিচারে আমার এই গ্রন্থখানি এক নতুন আবেদন (Approach) নিয়ে পাঠক সমাজের নিকট উপস্থিত হচ্ছে। বর্তমান পরিবেশ–পরিস্থিতিই যে এই নতুন আবেদন (Approach)–এর কারণ, তা বলার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু একই মৌল বক্তব্যকে যে ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গীতে তুলে ধরা যায় এবং তার চেষ্টাও করা উচিত, 'মহাসত্যের সন্ধানে'–তার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এই গ্রন্থে মোট পাঁচটি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রতিটি প্রবন্ধই তার বক্তব্যের দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ। একটি বক্তব্যের কোন জের টানা হয়নি পরবর্তী প্রবন্ধে, কিন্তু পাঁচটি প্রবন্ধেই পাঠকদের সামনে একই কথা স্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল করে তুলতে চেষ্টা করা হয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে এর মূল বক্তব্য হলঃ ধর্ম মানব জীবনের জন্যে অপরিহার্য। ব্যক্তি ও সমাজ জীবন থেকে তাকে উৎখাত করতে চাওয়া স্বয়ং মানবতার পক্ষেই মারাত্মক পরিণতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে অবধারিতভাবে।

বর্তমান পরিবর্তিত সমাজ পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে আমাদের সামনে অত্যন্ত প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে একটি বিরাট জিজ্ঞাসা, ধর্ম কি আমরা ত্যাগ করেছি, ধর্মকে কি উৎখাত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে? ধর্ম কি এমন জিনিস, যাকে উৎখাত করা না হলে আমাদের জীবন ও জাতীয় সমস্যার কোন সমাধান হচ্ছে না? কিংবা আমাদের সার্বিক বৈষয়িক উন্নয়নের পথে ধর্ম কি একটা মস্তবড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে? একালে বিজ্ঞানের অনেক–অনেক উন্নতি হয়েছে এবং আমরা সব বিজ্ঞানবিদ্ ও বিজ্ঞানবাদী হয়ে গেছি বলেই কি 'ধর্ম'কে বরদাশ্ত করতেও প্রস্তুত হচ্ছি না? –ধর্ম কি অমূলক, ভিত্তিহীন? বিজ্ঞান কি ধর্মের পরিপন্থী? বিজ্ঞানের আনুকূল্য ও অবদান গ্রহণ করতে ধর্ম কি বাধা দেয়? 'ধর্ম' গ্রহণ করলে কি বিজ্ঞানবাদী হওয়া যায় না বা বিজ্ঞানবাদী হলে ধর্মকে ত্যাগ করতেই হবে? — অনাবিল মন ও অপ্রভাবিত (unbiased) মানসিকতা নিয়ে এসব প্রশ্নের সূক্ষ্ম বিচার–বিশ্লেষণ করে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ব্যক্তি এবং সমাজ—উভয়েরই কর্তব্য বলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ঐকান্তিক দাবি।

আমরা এই পৃথিবীর বুকে মায়ের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করা মানুষ; আকাশ থেকে টপকে পড়া কিংবা মাটির গর্ভ থেকে হঠাৎ বের হয়ে আসা ভুঁইফোঁড় কোন জীব নই। এ যদি সত্য হয়, তা হলে মায়ের সম্পর্কে পিতার—তথা গোটা মানব সমাজ ও প্রথম 'মানব–মানবীর সাথে আমাদের সম্পর্ক একদিকে এবং অন্যদিকে পৃথিবীর সম্পর্ক গোটা সৃষ্টিলোকের (whole universe) সাথে আমাদের সম্পর্ক—সম্পর্কের এই দুটি ধারার ধারাবাহিকতা অবলম্বন করেই যে 'মহাসত্যের সন্ধানে' আমাদের অগ্রসর হতে হবে সে কথায় কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। জীবনে মহাসত্য একমাত্র তাই, যা এ দুটো ধারার ধারাবাহিকতার দ্বারা সত্যায়িত। যা এর ব্যতিক্রম তা আমাদের জীবনে একেবারেই গুরুত্বহীন। আর এ দুটি ধারা থেকেই ধর্ম মানুষের জন্য

www.pathagar.com

কল্যাণকর এবং অপরিহার্য বলে অকাট্যভাবে প্রমাণিত। তাই ধর্মকে বর্জন কিংবা অস্বীকারের অর্থ—মানুষের মৌল দুটি ধারাকেই অস্বীকার করা, যা মানবতার জন্য কোনক্রমেই কল্যাণকর হতে পারে না।

বিজ্ঞান কি ধর্মের বিরোধী, পরিপন্থী? ধর্ম ও বিজ্ঞানে কি বৈপরীত্য বা দ্বন্দ্ব আছে? সত্যনিষ্ঠ বিজ্ঞানীরা তা স্বীকার করেন না। এ দুটির মাঝে বিরোধ ও বৈপরীত্যের পরিবর্তে পারস্পরিক সঙ্গতি আনুকুল্য, পরিপূরকতা, সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যই বিরাজিত। দুটি একই লক্ষ্যে ও একই নিয়মে চলে। ধর্ম যেখানে নির্বাক, বিজ্ঞান সেখানে সোচ্চার। অনুরূপভাবে বিজ্ঞান যে পর্যন্ত এসে স্তব্ধগতি, ধর্ম সেখানে সূক্ষ্মতত্ত্ব উদঘাটক। বিশ্বলোক সদা কার্যকর নিয়ম-শৃঙ্খলা ও অন্তর্নিহিত সুসংবদ্ধতা আয়ত্ত করা এবং তার সাহায্যে আমাদের চারপাশে পরিদৃশ্যমান কিংবা অনুভব-যোগ্য বিষয়াদির জ্ঞান অর্জন বিজ্ঞানের লক্ষ্য। আর বিশ্বলোকের চরম লক্ষ্য, উদ্দেশ্যে ও তাৎপর্য সংক্রান্ত এবং তার অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ তা স্বীকার করা, মেনে নেয়া ও অনুরূপ জীবন গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হওয়াই ধর্মের অবদান। বিশ্বলোকে মানুষের স্থান (position), দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ ধর্ম ছাড়া অন্য কোন উপায়ে সম্ভব নয়। বিশ্বলোকের চরম উদ্দেশ্যের উৎস এক সর্বাত্মক ঐকিক ও সর্বব্যাপক (All inclusive) নীতিই হল ধর্মের সারনির্যাস। এই উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠতর উদ্দেশ্য সম্পন্ন সত্তা ও শক্তিকেই আমরা বলি 'আল্লাহ্'। এ আল্লাহ্ যে মৃত (Dead) নন, চিরঞ্জীব, সদাসক্রিয়, বিশ্বলোক প্রতি মুহূর্ত তাঁরই কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, প্রতিপালিত ও পরিচালিত, তা বিজ্ঞানের সর্বশেষ অভিজ্ঞতায় সত্যায়িত। কতগুলো পরিভাষা ছাড়া ধর্ম ও বিজ্ঞানে মৌলিক পার্থক্য কিছুই নেই। পরিভাষাগত পার্থক্যকে মৌলিক পার্থক্য মনে করে নেয়াই হচ্ছে নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

ধর্মে আকীদা-বিশ্বাসের স্থান সর্ব প্রথম ও সর্বাগ্রে। অতএব তাতে যুক্তি ও বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগের অবকাশ নেই বললেও চলে, এই ধারণার মূলে ঐতিহাসিক কারণ যাই থাক, একান্তই আবেগ-উচ্ছ্বাসমূলক (Sentimental) ব্যাপার। প্রকৃত বাস্তবতার (Reality) কোন স্থান নেই তাতে। এই 'দোষে' (?) কেবল ধর্মই দোষী নয়, বিজ্ঞানও এই অভিযোগে সমানভাবে অভিযুক্ত হতে পারে। কেননা এই আকীদা-বিশ্বাস-ধর্মীয় ভাষায় 'ঈমান বিল গায়ব' ছাড়া বিজ্ঞান তো এক কদমও চলতে পারে না। সে কথাটি কি একবারও ভেবে দেখা হয়েছে? বিশ্বলোকে শাশ্বত নিয়ম-শৃঙ্খলা বিদ্যমান এবং মানুষের তথা বিজ্ঞানীর মন তা অনুভব ও অনুধাবন করতে পারে—এই বিশ্বাসটিই হল বিজ্ঞান চর্চা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার মূলমন্ত্র। আর এ 'জিনিস' যে 'ঈমান-বিল গায়ব' ছাড়া আর কিছুই নয়, তা বলা বাহুল্য।

বিজ্ঞানের আর একটি কুঞ্চিকা হল 'মনে করে লওয়া' বা "ধরে নেয়া'। এই কুঞ্চিকা দিয়েই তো মহাসত্যের বন্ধ তালা খুলতে পারা যায়। 'সত্য আছে' এই কথা মনে করে নিয়েই তো বিজ্ঞানের যাত্রা শুরু। তাই কনস্ট্যানটাইন (Constantine) বলেছিলেনঃ 'আমি ঈমান পোষণ করি, যেন আমি জানতে পারি'। 'সত্য' প্রকৃতই বর্তমান, তাই 'সত্যে' অবিশ্বাসীর দ্বারাও তা সত্যায়িত করিয়ে নিচ্ছে অগোচরে, অজ্ঞাতসারে ও অবচেতনভাবে। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফাইন হল'-এর প্রাচীর গাত্রে বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের জার্মান ভাষায় লিখিতঃ 'আল্লাহ্ অতীব সূক্ষ্ম,

www.pathagar.com

কিন্তু বিদ্বেষী নয়' কথাটিও এই সত্যের সত্যতা ঘোষণা করছে উদাত্ত কণ্ঠে। ধর্মের উৎস 'ইলহাম' বা 'অহী' আর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য জানা যায় যুক্তি–প্রমাণ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিংবা সংগৃহীত তত্ত্ব ও তথ্যের উন্নত পদ্ধতির ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণের ভিত্তিতে, এই ধারণাটিই ধর্ম ও বিজ্ঞানের মাঝে বিরোধ আরোপে শক্ত ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু বিজ্ঞান সম্পর্কে এই ধারণাটি যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, আজগুবি, সত্যনিষ্ঠ বিজ্ঞানীরা তা অস্বীকার করতে পারে না। বিজ্ঞানের অধিকাংশ আবিষ্কার–উদ্ভাবনীই যে উক্ত পন্থায় সংঘটিত হয়নি, অভিজ্ঞমাত্রেরই জানা কথা। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার–উদ্ভাবন প্রকৃত ও পন্থায় হয় না, হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থায়, যে পন্থাকে বলা হয় Intuition, তা কে অস্বীকার করতে পারে? বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বস্তুজগৎ এবং ধর্মের ক্ষেত্রে মানবিক তথা মানুষের নৈতিক জীবন, তাই ধর্মের উৎস যেখানে অহী ও ইলহাম, সেখানে বিজ্ঞানের প্রথম উৎস যদি হয় যুক্তি–প্রমাণমূলক তত্ত্ব বিশ্লেষণ, তাহলে দ্বিতীয় এবং আসল ও মৌল উৎস এই Intuition—কেবল অনুভূতি বলেই জানা, স্বজ্ঞাত হওয়া, হঠাৎ করে জানতে পারা, মনে জেগে উঠা, অথবা সরল ভাষায় 'তার মনে এক বিস্ময়কর চিন্তার উদয় হওয়া'। এ দুটোর মাঝে কেবলমাত্র 'ক্ষেত্রে'রই পার্থক্য, মৌলিকতার দিক দিয়ে কোনই পার্থক্য নেই। দুটি ক্ষেত্রেরই উর্ধ্বে রয়েছে অলৌকিক মহাসত্য। সেই অলৌকিক মহাসত্য থেকেই উৎসারিত হয়ে একসঙ্গে ও পাশাপাশি রয়েছে দুটি ক্ষেত্র—একটি বস্তুজগৎ আর অন্যটি মানবিক জগৎ—যাকে বলা হয় আধ্যাত্মিক কিংবা নৈতিক জগৎ।

বস্তুজগতে বিষয়–সংক্রান্ত যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্য একত্রিত হয়ে সামনে বর্তমান থাকা সত্ত্বেও সুস্পষ্ট কোন ধারণা মনে জাগে না। রিক্ত মনের এক আকস্মিক মুহূর্তে আকাশে বিদ্যুৎ চমকের মতই হঠাৎ আলোর ঝলকানি হয়ে যায়, আবিষ্কৃত হয় এক একটা বৈজ্ঞানিক মহাসত্য। কেকিউলের (Kekule) হাতে বেঞ্জেনরিং (Benzenring)–এর আবিষ্কার এ ধরনেরই একটা বিস্ময়কর ঘটনা। কেকিউল আগুনের নিকট তন্ময় হয়ে বসেছিল। সহসা সাপের ন্যায় পরমাণুর চিন্তাটা তার হৃদয় দিগন্তে চমকে উঠল, যেন সেটি নিজের লেজ নিজের মুখের মধ্যে চেপে ধরেছে। এ থেকেই বেঞ্জেনরিং সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক ধারণা অর্জিত হয়েছে।

একজন আবিষ্কর্তা বিজ্ঞানীর একটা স্বগতোক্তি লক্ষণীয়। তিনি বলেনঃ 'আমার চোখে পড়ল, একটা কয়েলের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছিল। কাছেই ছিল একটি ম্যাগনেটিক নিডল। হঠাৎ সেটা নড়ে উঠল, হঠাৎ আমার চোখে পড়ে গেল, প্রথমটায় পড়েনি।' কিন্তু যতবারই নড়ল সেটা কেউ যেন আমার চোখে অঙ্গুলি দিয়ে দেখিয়ে দিল। বিজ্ঞান জগতে যেটা যুগান্তকারী আবিষ্কার সেটা একটা আকস্মিক ঘটনামাত্র। তার জন্য আমি দায়ী হতে পারি না। তাহলে কে দায়ী? কে তার চোখে এটা ধরিয়ে দিল? বস্তুত বিজ্ঞান তার জবাব দিতে পারে না। উপরের দিক থেকে ভারী জিনিসের নিচে পড়ে যাওয়া পৃথিবীতে আদিমকাল থেকেই ঘটছে। সেটা কোন নতুন ঘটনা নয়। নিউটনের কাছেও কিছুমাত্র অভিনব বা অভূতপূর্ব ব্যাপার ছিল না। কিন্তু 'একটা আপেলের বৃন্তচ্যুত হয়ে টপ্ করে মাটিতে পড়া' থেকে সেই নিউটন কর্তৃক মাধ্যাকর্ষণ নিয়মের আবিষ্কার কি 'অলৌকিক মহাসত্য' চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার ব্যাপার নয়?

www.pathagar.com

বস্তুত মানুষ যে মানসিক কার্যক্রমের সহায়তায় বড় বড় ও গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টির সৃষ্টি করে, বিজ্ঞানীরা সে বিষয়ে এখনও কিছুই জানতে পারেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিরাট বিরাট বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উদ্ভাবন তত্ত্ব উদঘাটন এবং এক্ষেত্রের প্রকৃত উন্নয়ন তথাকথিত বৈজ্ঞানিক পন্থা ও পদ্ধতিতে হয়নি। তার অনেকাংশই এক ধরনের 'ইলহাম' এর সাহায্যেই হয়ে থাকে—বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ইতিহাস থেকেই তা প্রমাণিত।

এ ইল্‌হাম বা অহীরই বাস্তবতা আমরা দেখতে পাই সেইসব লোকের জীবনেও, যাঁদের আমরা বলি নবী বা রাসূল। বনি ইসরাঈলীদের মুক্তির ব্যাপার নিয়ে হযরত মূসা (আঃ) চিন্তিত–উদ্বিগ্ন হয়ে মরু পরিক্রমা করে দীর্ঘদিন অতিবাহতি করলেন। অকস্মাৎ এক জ্বলন্ত গাছালরি সাহায্যে তিনি 'ইল্‌হাম' লাভ করলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর জাতিকে শিরক ও বুত–পরস্তি থেকে মুক্ত করার গভীর চিন্তায় তন্ময় হয়েছিলেন। তিনি উজ্জ্বল তারকা, চাঁদ ও পরে বিশ্ব উদ্ভাসক সূর্যকে সৃষ্টিলোকের উৎস রব্ব বলে মেনে নেয়ার ব্যাপারটি বিবেচনা করতে গিয়েই সহসা তাঁর অন্তর চিৎকার করে উঠলঃ নয়, নয়, এর কোন একটিও রব্ব হতে পারে না, রব্ব তো তিনিই, যিনি এই তারকা–চন্দ্র–সূর্য–তথা গোটা বিশ্বলোকের মৌল উদগাতা, স্রষ্টা। তখন তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠলেনঃ

إِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ -

আমি একনিষ্ঠ হয়ে –অন্যান্য সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে আমার গোটা সত্তাকে নিবদ্ধ করছি সেই মহান সত্তার দিকে, যিনি আকাশ–মণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি ও সুসজ্জিত করেছেন এবং আমি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ন ই।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)–এর প্রতিও বিশ্বলোক ও বিশ্ব মানবতার সমস্যার সঠিক সমাধান অনুরূপ পদ্ধতিতে ও আকস্মিকভাবে মক্কার এক পর্বত গুহায় উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ে তাঁকে নির্দেশ করা হয়ঃ

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ -

পড় তোমার সেই রব্বের নামে, যিনি বিশ্বলোকের সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা।

এই দুটি ক্ষেত্রের জন্যই সেই একই মহাসত্যের নিকট থেকে 'হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানি' আসার এ ঘটনাবলী অত্যন্ত বিস্ময়কর হলেও এতে পারস্পরিক বৈপরীত্য বলতে কিছুই নেই। মানুষ যা জানত না, জানে না, তিনিই তো এমনিভাবে মানুষকে জানিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা নিয়েছেন, যার কথা রাসূলের প্রতি প্রথম অহীর শেষ বাক্য হিসেবে বলে দিয়েছিলেনঃ

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ -

তিনিই মানুষকে তাই শিখিয়েছেন, যা সে জানে না।

ধর্মীয় চিন্তা–মতাদর্শ নিছক ঈমান ও বিশ্বাসনির্ভর, আর বিজ্ঞান সফলতার সাথে

www.pathagar.com

স্বীয় বিশ্বাস ও মতাদর্শকে বাস্তবে প্রমাণিত করে দেয়। প্রমাণ বা যুক্তি বৈজ্ঞানিক ধারণাসমূহকে একটা সমগ্রতা ও নিরংকুশতা দান করে, কিন্তু ধর্মীয় ধারণা বিশ্বাস এ জিনিস থেকে বঞ্চিত—যদিও তার অনুগামীরা তার সম্পর্কেও এই ধরনের দাবি করে থাকে। বিজ্ঞান ও ধর্মে পার্থক্য দেখাবার এও একটা কাল্পনিক ও মনগড়া ধারণা। 'বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদি' সম্পর্কিত এ দাবিটি গোড়াতেই ভুল ও ভিত্তিহীন।

গাণিতিক কিংবা যুক্তি–বিজ্ঞানমূলক প্রমাণাদি কতেক বিশেষ অনুমানের সেট (set)–এর নির্বাচন ও পছন্দ করে লওয়ার প্রয়োজন প্রকাশ করে। এ অনুমানসমূহ বাহ্যত পরস্পর সম্পৃক্ত। জ্ঞান–বিজ্ঞানের ধারায় স্বতঃসিদ্ধ রূপে ধরে নেয়া হয় যে, আমাদের জগতের সাথে এইসব অনুমান–স্বতঃসিদ্ধের সম্পর্ক রয়েছে। যুক্তি–বিজ্ঞানের সর্বসম্মত নিয়মাবলীর ভিত্তিতে (যা নিতান্তই অনুমান মাত্র) আমরা এসব অনুমানের পরিণতি ও ফলাফল বের করি; কিংবা বলা যায়, প্রমাণ করি। কিন্তু প্রশ্ন হল, এগুলো যে সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য তা কি করে বিশ্বাস করা যায়। গণিতবিদ গোডেল (Godel) দেখিয়েছেন, বাছাই করা অনুমান সমষ্টি হয় স্বয়ং–সঙ্গতিপূর্ণ (Self consistant) কিংবা তা নয়, সাধারণ ব্যবহৃত অধিকাংশ গণিতেই তা জেনে নেয়া মূলত অসম্ভব। যুক্তি–বিজ্ঞানের বিচারে এটি নিজেই অসঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে এবং তা হয়ত জানতেও পারা যাবে না। তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, পূর্ণ প্রত্যয় ও নিশ্চয়তা সহকারে যুক্তি–প্রমাণ প্রয়োগ করার মত প্রকৃত ও শক্ত কোন ভিত্তিই সেখানে বর্তমান নেই। বস্তুত এমন বহু গাণিতিক 'সত্য' রয়েছে, যা মৌলিকভাবে সাধারণ যুক্তি–বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

বৈজ্ঞানিক ধারণা বা প্রকল্পের (Hypothesis) সত্যতার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় লাভ এবং তার কোন নিরংকুশ অকাট্য প্রমাণ দেয়া একেবারেই অসম্ভব। প্রাকৃতিক জ্ঞান–বিজ্ঞানে কোন 'প্রকল্প'কে 'প্রমাণ' করার উদ্দেশ্যে বাস্তব পরীক্ষার আলোকে যাচাই করা যায়, কর্মোপযোগী প্রকল্প (Working hypothesis) যাচাই করার জন্য নানা পদ্ধতি রচনা করা হয়, যা বাস্তব পরীক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। সেসব প্রকল্প ও নিয়মাবলীকে 'মেনে' নিতে হয়। এ যাচাই ও পরখ কোন কোন প্রকল্পকে ভুলও পমাণ করে দিতে পারে কিংবা তার প্রয়োগ ক্ষমতা (Applicability) ও সত্যতা যথার্থতার প্রতি একটা আস্থা ও বিশ্বাসও জাগাতে পারে, কিন্তু সেজন্য কোন অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন তার ক্ষমতা–বহির্ভূত ব্যাপার।

বাস্তব প্রয়োগের দিক দিয়ে ধর্মীয় বিধানের যথার্থতা প্রমাণযোগ্য নয়, এইরূপ কথার কোন ভিত্তি নেই। ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়া ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র যে আদর্শ স্থানীয় এবং বিশ্বমানবতার পক্ষে সার্বিকভাবে কল্যাণকর হয়—এরূপ কল্যাণ যে অন্য কোন ভাবে গড়া ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্রের দ্বারা লাভ করা সম্ভব নয়, ইতিহাসে তার সত্যতা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু তা কেবল অতীতকালের কিংবা ইতিহাসের ব্যাপারই নয়, আজকের দিনেও যে কোন দেশে তার পরীক্ষণ–নিরীক্ষণ চলতে পারে এবং তার যথার্থতা ও সঠিকতা এবং কল্যাণও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া যেতে পারে। তবে বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের সত্যতা যথার্থতা প্রমাণের জন্য যে দুঃসাহসিক পরীক্ষণ–নিরীক্ষণ ও যাচাই পরখের প্রয়োজন, এক্ষেত্রে সে প্রয়োজন

www.pathagar.com

আরও বেশী। সেই সাহস দেখাবার কেউ আছে কি? এই গ্রন্থের এটাই হচ্ছে একমাত্র জিজ্ঞাসা।

যে কোন বক্তব্য পেশ করার জন্য দুধরনের বাচনভঙ্গি (style) হতে পারে। একটি নিছক 'আদর্শবাদী' আর দ্বিতীয়টি পরীক্ষণমূলক। অন্য কথায়, একটি ভঙ্গী—নিছক দার্শনিক আর অন্যটি বৈজ্ঞানিক। দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে আজ পর্যন্ত আমার বেশ কিছু রচনা পেশ করা হয়েছে। একালের বৈজ্ঞানিক চিন্তা-গবেষণা এবং তার ফলে তত্ত্ব ও তথ্যের ব্যাপক উদঘাটন বাস্তব প্রমাণের ক্ষেত্রটিকে ব্যাপক ও বিশাল বানিয়ে দিয়েছে, তার প্রয়োগ ক্ষেত্রও পূর্বের চাইতে অনেক বেশী সম্প্রসারিত। মনে হয়, এই অবস্থাটি কুরআন মজীদের এই ভবিষ্যদ্বাণীরই বাস্তবতাঃ

سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا - (النمل ٩٣)

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর একত্ব কুদ্‌রাতের অকাট্য প্রমাণাদি তোমাদের অবশ্যই দেখাবেন। ফলে তোমরা তা চিনতে ও জানতে পারবে।

আর আল্লাহ্ তা'আলাই যে তাঁর আয়াত-নিদর্শন ও প্রমাণাদি ক্রমশ ও প্রায় প্রতিদিনই তাঁর বান্দাদের দেখিয়ে যাচ্ছেন এবং নিত্য-নতুন তত্ত্ব ও তথ্য মানুষের সামনে উদঘাটিত হচ্ছে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-উদ্ভাবনের মাধ্যমে। একদিকে নবী-রাসূলগণের জীবদ্দশায় তাঁদের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে এবং অন্যদিকে তাঁদের অন্তর্ধানের পর তাঁদের রেখে যাওয়া আল্লাহ্‌র গ্রন্থ ও তাঁদের দেয়া ব্যাখ্যার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ও ইজতিহাদের সাহায্যে এ কথা অস্বীকার করার সাধ্য কারো নেই। বর্তমান গ্রন্থেই আমি এই নবোদ্ভূত সম্ভাবনাকে সুসংবদ্ধভাবে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করছি মাত্র।

আধুনিক বিজ্ঞান একথা অকপটে স্বীকার করেছে যে, 'বিজ্ঞান মহাসত্যের শুধু আংশিক জ্ঞান দিতে পারে।' তার অর্থ হচ্ছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-তত্ত্ব ও তথ্যের বাইরে বস্তুগত চিন্তা ও গবেষণার আওতা-বহির্ভূত অনেক সত্যই নিহিত রয়েছে। সেই স্থান ও তত্ত্বের উৎস হচ্ছে ধর্ম। ধর্ম অবস্তু এবং বস্তুগত জ্ঞান-গবেষণার বাইরে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও বস্তুগত জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রয়োগকৃত সত্য প্রমাণের পন্থা ও পদ্ধতিতে ধর্মকেও প্রমাণিত করা সম্ভব। এই গ্রন্থের আলোচনা পদ্ধতিতে তা-ই দেখাতে চেষ্টা করা হয়েছে।

আধুনক বিজ্ঞান-প্রভাবিত মন ও মানসকে সামনে রেখে এক বিশেষ প্রয়োজন পূরণার্থে এই গ্রন্থের অবতারণা। এই আবেদন (Approach) কতটা সফল হয়েছে তার বিচার করবেন বিজ্ঞানবিদ্ পাঠক সমাজ। তবু এর ফলে তাদের চিন্তার যদি কিছুটা আলোড়নেরও সৃষ্টি হয়, তাহলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব।

মুহাম্মাদ আবদুর রহীম
১লা জুলাই, ১৯৭৫

www.pathagar.com

মহাসত্যের সন্ধানে

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

মহাসত্যের সন্ধানে

আমাদের সামনে বিস্তৃত এই বিশাল বিশ্ব-প্রকৃতি একখানি বিরাট বই-এর মতই খোলা পড়ে আছে। কিন্তু এ 'বই' খানি বড় আশ্চর্য ধরনের। দুনিয়ায় যে সব বই আমরা পড়ি, তা খুললেই তাতে দেখি গ্রন্থকারের নাম, বইয়ের বিষয় বস্তু। কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির এই 'বই' খানি সে রকমের নয়। এর কোথাও লেখকের নাম নেই, নেই কোথাও এর বিষয়বস্তুর উল্লেখ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ 'বইয়ের' এক একটি 'অক্ষর'-ই নীরব নিঃশব্দ ভাষায় আমাদের জানিয়ে দেয়, কে এর গ্রন্থকার এবং এর বিষয়বস্তু কি।

মানব মনের জিজ্ঞাসা

এ দুনিয়ায় একজন লোক যখন জ্ঞানের চোখ খুলে চারদিকে তাকাতে শুরু করে, তখন দেখতে পায় সে এক বিশাল, বিস্তীর্ণ বিশ্বলোকে দাঁড়িয়ে আছে। স্বাভাবিকভাবেই তার মনে প্রশ্ন জাগেঃ 'আমি কে?' 'কি এই বিশ্বলোক?' তখন সে এই বিশ্ব-প্রকৃতির সাথে পরিচিত হওয়ার জন্যে—নিজেকে ও জগতকে জানবার, বোঝবার জন্যে অধীর হয়ে পড়ে। সে তার নিজের প্রকৃতি-নিহিত সূক্ষ্ম ইঙ্গিত-ইশারা পাঠ করতে ও তার তাৎপর্য অনুধাবন করতে চেষ্টা শুরু করে দেয়। সে এই জগতে যে সব অবস্থার সম্মুখীন হয়, তার মূল কার্যকারণ কি, তা জানবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠে। এ প্রসঙ্গে তার মনে যে সব প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, সেগুলোর সঠিক জবাব পাওয়ার জন্যে সে হয়ে পড়ে অস্থির। কিন্তু এসব প্রশ্নের সত্যিকার জবাব যে কি, তা সে নিজে মোটেও জানে না।

বস্তুত এ পর্যায়ে মানুষের মনে যে সব প্রশ্ন জাগে সেগুলো কোন গভীর সূক্ষ্ম বা জটিল দার্শনিক প্রশ্ন নয়, খুবই সহজ, সরল। সেগুলো হলো মানুষের স্বভাব, প্রকৃতি ও তার অবস্থার অনিবার্য পরিণতি। এসব প্রশ্ন সব মানুষের মনেই জাগে স্বাভাবিকভাবে এবং এদের সম্মুখীন হতে হয় প্রতিটি মানুষকে। এ অনন্ত জিজ্ঞাসা—এই অদম্য কৌতূহল মানব মনে জাগে বলেই মানুষ নিতান্ত জীব পর্যায়ের নয়, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক সৃষ্টি। এখানেই তার বৈশিষ্ট্য, এতেই তার মর্যাদার স্বাতন্ত্র্য। এসব প্রশ্ন শুধু মানব মনেই জাগে এবং এগুলোর জবাব জানবার জন্যেও তাকেই আত্মনিয়োগ করতে হয়। প্রশ্নগুলো এতই প্রবল ও গুরুত্বপূর্ণ যে, এদের জবাব না পেলে কেউ পাগল হয়ে যায়, কেউ আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়, আবার কারো সারা জীবনটাই অতিবাহিত হয়

www.pathagar.com

সীমাহীন অস্থিরতার মধ্য দিয়ে। অনেকে আবার এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব না পেয়ে দুনিয়ার আনন্দ–স্ফূর্তিতে ডুবে গিয়ে নিজেদের মনের অস্থিরতা ভুলে থাকতে চেষ্টা করে। তখন তারা হাতের কাছে যা–ই পেয়ে যায় তাকেই কেন্দ্র করে জীবনের কুন্ডলি পাকায় এবং ভুলে যেতে চায়, যা সে পায়নি। আর এক শ্রেণীর লোক এসব স্বভাবজাত প্রশ্নের ভুল জবাব জানতে পেরে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত পথে চলতে শুরু করে দেয়, শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে যায় নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে।

যে প্রশ্নের কথা এখানে বলা হলো, তার স্বরূপ বোঝাবার জন্যে একটা শিরোনাম দিয়ে বলতে পারিঃ 'সত্যের সন্ধান'। এর বিশ্লেষণ করা হলে দেখা যাবে, এ একটা প্রশ্ন নয়, বহু কয়টি প্রশ্নের সমষ্টি। একটি মূল প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আরো বহু কয়টি অনু–প্রশ্ন। বিভিন্ন শব্দে এ প্রশ্নগুলোর নাম দেয়া যায় বটে, কিন্তু আমরা আলোচনা সহজতর করার জন্যে মূল প্রশ্নটিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে নিতে চাইঃ

১. স্রষ্টার সন্ধান;
২. মা'বুদের সন্ধান;
৩. নিজের পরিণতির সন্ধান।

এ তিনটি বিষয়েরও একটা শিরোনাম দেয়া যায় 'সত্যের সন্ধান'। প্রকৃতির রহস্য উদঘাটন হলো এর প্রধান কাজ এবং পরম ও অনন্য সত্যকে জানা এর চূড়ান্ত লক্ষ্য। এ বিষয়ে যেদিক দিয়েই পর্যালোচনা শুরু করা হোক–না–কেন, তা এই একটি শিরোনামের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। 'সত্যের' এ 'সন্ধান' আমাদেরকে পরম সত্যে ও চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছাতে পারবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

প্রশ্নের জবাব

উপরে যে প্রশ্নাবলীর কথা বলা হয়েছে, তা দেখলে বাহ্যত মনে হয়, এসব প্রশ্নের কোন জবাবই আমরা জানিনে। পর্বতশীর্ষে এমন কোন বোর্ডও ঝোলানো নেই, যাতে এ প্রশ্নের জবাব লিখে রাখা হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে, এ প্রশ্নের মধ্যেই তার জবাব নিহিত রয়েছে। বিশ্ব–প্রকৃতি নিজেই তার সত্তা নিহিত মহাসত্যের দিকে ইঙ্গিত করছে। সে ইঙ্গিত থেকে আমরা যদিও কোন নিশ্চিত ও সন্দেহমূক্ত জ্ঞান লাভ করতে পারিনে, তবুও সে ইশারা ও ইঙ্গিত এতই স্পষ্ট ও অকাট্য যে, কোন উপায়ে যদি আমরা পরম সত্যকে জানতে পারি, তাহলে আমাদের হৃদয় নেচে উঠে, মন বলে উঠেঃ 'পরম সত্যের সন্ধান পেয়ে গেছি', 'এই তো পরম সত্য,' 'সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির এছাড়া আর কোন সত্য বা নিগূঢ় তত্ত্ব হতে পারে না'।

বিশ্বলোকের দিকে তাকালেই মানব মনে সর্বপ্রথম যে জিজ্ঞাসা জেগে উঠে, তা হলো, এ বিশ্বলোকের স্রষ্টা কে, কে এর নির্মাণকারী? আর কে সেই সত্তা, যার

www.pathagar.com

কর্তৃত্বাধীনে বিশ্বলোক নামক এ বিরাট কারখানাটি নিরন্তর, নিরলস চলমান হয়ে আছে—কে চালাচ্ছে একে?

প্রশ্নের স্বরূপ

একালের মানুষের সামনে এ প্রশ্নের একটা মনগড়া জবাব রাখা হয়েছে এই বলে যে, বিশ্ব প্রকৃতির স্রষ্টা বা নির্মাতা কেউ নেই। এটা একটা দুর্ঘটনার পরিণাম হিসাবেই অস্তিত্ব লাভ করেছে। একটা ঘটনা যখন সংঘটিত হয়, তখন তার দরুন সংঘটিত হতে থাকে আরো অনেক ঘটনা। এ ভাবে কার্যকারণ ও ঘটনা-সংঘটনের একটা দীর্ঘ ও নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা (series of accidents) দাঁড়িয়ে যায়। আর এই কার্যকারণ পরম্পরার ফলেই এ গোটা বিশ্বলোকের কারখানাটি চলমান হয়ে আছে।

বিশ্বলোক সৃষ্টির কার্যকারণ সম্পর্কিত এ বিশ্লেষণের দুটো ভিত্তি রয়েছে। একটি হচ্ছে 'দুর্ঘটনা' আর দ্বিতীয়টি কার্যকারণ ধারার নিয়ম (law of causation)। এই ব্যাখ্যা বলছে, আজ থেকে দুই লক্ষ কোটি বছর পূর্বে এ বিশ্বলোকের কোন অস্তিত্ব ছিল না। শূন্যলোকে আজকের মত তখন কোন গ্রহ-নক্ষত্রও ছিল না। কিন্তু শূন্যলোকে ছিল 'বস্তু' বা 'জড়' (matter) আর তা তখন ঘনীভূত ও কঠিন অবস্থায় ছিল না। বরং তা তখন প্রাথমিক বিদ্যুৎ কণা ও প্রোটন-হাঁ-ধর্মী বিদ্যুৎরূপে বিস্তীর্ণ শূন্যলোকে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। অন্য কথায়, সূক্ষ্ম বিন্দু অণু'র একটা পুঞ্জীভূত মেঘমালা সারা বিশ্বলোকে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। এ সময় 'বস্তু' বা 'জড়' সম্পূর্ণ ভারসাম্যযুক্ত (balanced) অবস্থায় পড়েছিল। তাতে কোনরূপ গতি বা কম্পন ছিল না। গাণিতিক দৃষ্টিতে সে সুষমতা ছিল এমন যে, তাতে বিন্দু পরিমাণ ব্যতিক্রম ঘটলেও আর তা অবশিষ্ট থাকতে পারে না। সে ব্যতিক্রম ক্রমশ বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। এই প্রাথমিক ব্যতিক্রম যদি স্বীকার করে নেয়া হয়, তাহলে এ বিশ্লেষণ উপস্থাপকদের ধারণা—তার পরবর্তী সব ঘটনা গণিত-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে, সহজেই প্রমাণিত হবে। কার্যত হলোও তাই, এ পুঞ্জীভূত জড়ে সামান্যতম ব্যতিক্রম ঘটে গেল। যেমন পুকুরের নিটোল পানি যদি কেউ নেড়ে দেয় অথবা একটা ঢিল ছোঁড়ে, তাহলে তরঙ্গের একটা নিরবচ্ছিন্ন ক্রমিক ধারা ছুটতে থাকে। অতঃপর তাই ঘটতে লাগল। কিন্তু প্রশান্ত মহাশূন্যের 'পুকুরে' কে প্রথম কম্পন আর তরঙ্গ জাগিয়ে দিল, সে বিষয়ে কিছু জানা নেই। সে কম্পন ও তরঙ্গ উঠেছে এবং তা নিরন্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে 'জড়' সংকুচিত হয়ে নানা জায়গায় দানা বাধতে ও পুঞ্জীভূত হতে শুরু করল। আর এই দানা-বাঁধা ও পুঞ্জীভূত হওয়া 'বস্তু'কেই আমরা বলি গ্রহ, নক্ষত্র বা নীহারিকা।

বিজ্ঞানের গ্রন্থাবলীতে সৌরজগতের জন্ম রহস্য পর্যায়ে মোটামুটি তিনটি মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি মত হলো, সুদূর অতীতে বিশ্বে ছিল উষ্ণ গ্যাসীয় বস্তুপুঞ্জের

www.pathagar.com

সুবিস্তৃত নীহারিকা। এই বস্তুপুঞ্জ অনবরত পাক খেতে খেতে তার মাঝখানে জমে উঠে খানিকটা বস্তুর ঘন পিন্ড। এই ঘন পিন্ডটি সূর্যের রূপ নেয়। তার চারপাশে বস্তুপুঞ্জ ঠান্ডা হতে শুরু করলে বস্তুপুঞ্জের আকার ছোট হয়ে আসে, কিন্তু ঘোরার বেগ বাড়ে, আবর্তনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। ক্রমে ক্রমে ঘুরন্ত খোলসগুলো পৃথক হয়ে পড়ে এবং জমাট বেঁধে নানা গ্রহ–উপগ্রহের রূপ নেয়। এই মতটি 'লাপ্লাসের নীহারিকাবাদ' নামে অভিহিত।

দ্বিতীয় মতটি হলো মহাবিশ্বে দুইটি নক্ষত্রের এক আকস্মিক নৈকট্যের ফলে সৌর জগতের উৎপত্তি হয়। এ দুটো নক্ষত্রের মধ্যে একটি ছিল সূর্য, অন্য অতি বিশাল নক্ষত্রটি সূর্যের নিকট দিয়ে ছুটে যাওয়ার সময় তার আকর্ষণে সূর্যের বুক থেকে গ্যাসীয় বস্তুপুঞ্জ পটলের আকারে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে পড়ে। এই বস্তুপুঞ্জ সূর্যের চারপাশে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে খন্ড খন্ড হয়ে বিভিন্ন গ্রহ–উপগ্রহে পরিণত হয়। এ হলো জীন্‌সের আকস্মিক নৈকট্যবাদ।

আর তৃতীয় মত অনুসারে উত্তপ্ত গ্যাসীয় সূর্য হতে নয়, শীতল বস্তু কণিকাপুঞ্জ হতে একই সময়ে সূর্য ও সৌর জগতের গ্রহ–উপগ্রহের সৃষ্টি। আদি বিশ্বের শীতল বস্তু কণিকাপুঞ্জে নিরন্তর গতিশীলতার ফলে অসংখ্য ছোট–বড় পাকের সৃষ্টি হয়। অপেক্ষাকৃত বড় একটি বস্তুকণা ঘনীভূত হয়ে আদি সূর্যের কেন্দ্রবস্তু সৃষ্টি হয়। এর চারপাশে ঘুরন্ত অন্যান্য পাকে বস্তু–কণার সমাবেশ নানা আঁকারের শীতল আদি গ্রহ, কণিকা, পিন্ড সৃষ্টি করে। ক্রমান্বয়ে বস্তুর সংকোচন, সংঘাত ও তেজস্ক্রিয়া বিকিরণের ফলে শীতল সূর্যতাপের উদ্ভব ঘটে। সূর্যের প্রচন্ড তাপে ও নিজস্ব অভ্যন্তরীণ সংকোচনের ফলে অন্যান্য গ্রহ পরবর্তী পর্যায়ে বলয় এবং ধূমকেতু, উল্কা প্রভৃতির উৎপত্তিও এই একই আদি বস্তুকণাপুঞ্জ হতে হয়েছে। একে বলা হয় 'ভাইৎসেকার ও শ্মিটের সংশোধিত নীহারিকাবাদ।'

জবাবের পর্যালোচনা

মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বের এ ব্যাখ্যা আধুনিক বিজ্ঞান পেশ করেছে। কিন্তু এই ব্যাখ্যায় এমন কতকগুলো ফাঁক রয়ে গেছে, যার কোন জবাব বিজ্ঞান দিতে পারেনি। এজন্যে এসব মতের প্রচার যত ব্যাপকই হোক না কেন এবং একে যতই চূড়ান্ত বলে ধরে নেয়া হোক না কেন, এই ব্যাখ্যা স্বয়ং বিজ্ঞানীদের মনও কিছুমাত্র পরিতৃপ্ত (convinced) করতে পারেনি। এই ব্যাখ্যা বস্তুত দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদনকারী ও সন্দেহ নিরসনকারী নয়। মনে রাখা আবশ্যক যে, এগুলো বিভিন্ন বিজ্ঞানীর মতামত মাত্র, বিজ্ঞানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। আর আসলে এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলতে কিছু থাকতেও পারে না। বিজ্ঞানের গ্রন্থাবলীতে অপকটে স্বীকার করা হয়েছে এই

www.pathagar.com

বলে, 'এ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে নানারূপ মতবাদ প্রচারিত হয়েছে বটে; কিন্তু আজও নিশ্চিতরূপে রহস্যটির সমাধান করা সম্ভব হয়নি।' বস্তুপুঞ্জে প্রথম 'পাক' এর সৃষ্টি কি করে হলো, দু'টি নক্ষত্রের আকস্মিক নৈকট্য কি করে ঘটে গেল কিংবা 'আদিবিশ্বে শীতল বস্তুকণাপুঞ্জে নিরন্তর গতিশীলতা' কি করে, কোথা থেকে শুরু হলো, তা বিজ্ঞানের জানা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও—বিজ্ঞান নয়, বিজ্ঞানগর্বী লোকেরা দাবি করছে, তারা মহাবিশ্বের 'প্রথম কার্যকারণ' জানতে পেরেছে। আর তার নাম হচ্ছে 'দুর্ঘটনা' (accident) বা আকস্মিকতা। প্রশ্ন হচ্ছে, আদিতে যখন শান্ত-শীতল কিংবা শান্ত-উষ্ণ বস্তু কণিকাপুঞ্জ নিস্তরঙ্গ ও গতিহীন অবস্থায় পড়েছিল, তা ছাড়া অন্য কোন জিনিসই কোথাও ছিল না, তখন এ বিস্ময়কর 'আকস্মিকতা' কিংবা 'দুর্ঘটনা কেমন করে সংঘটিত হলো, যার ফলে গোটা সৃষ্টিলোক 'গতিশীল হয়ে পড়ল? অথচ এই ঘটনার কোন 'কার্যকারণ' মূল বস্তুকণিকাপুঞ্জে নিহিত ছিল না, ছিল না তার বাইরে কোথাও। ছিল না যে, তা বিজ্ঞানীরাও শুধু স্বীকার নয়—বরং দাবিও করেন। তা সত্ত্বেও এরূপ ঘটনা সংঘটিত হলো কেন এবং কি করে, এ প্রশ্ন উত্তরহীনই থেকে গেছে বিজ্ঞানের এই চরম উন্নতির যুগেও।

এ প্রশ্নের জবাবে কেউ কেউ কার্যকারণেরও পিছনে আর একটি কার্যকারণের—ঘটনা-দুর্ঘটনার পূর্বে সংঘটিত অপর এক 'ঘটনা'র অস্তিত্ব বের করতে চেয়েছে। আর তারই দরুন পরবর্তী ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে বলে মনে করাতে চেয়েছেন। কিন্তু এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী মূল সূচনায় এমন একটি ঘটনার কথা বলা হয়েছে যার পূর্বে কোন কার্যকারণের অস্তিত্ব ছিল না—তা অকল্পনীয়ও বটে। মূলত এ একটি ভিত্তিহীন দাবি মাত্র। অথচ এরই উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গোটা সৃষ্টিলোকের আকস্মিক 'দুর্ঘটনায়' সৃষ্ট হওয়া সংক্রান্ত মতবাদের বিরাট প্রাসাদ।

বিশ্বলোক যদি নিছক 'আকস্মিকতা' বা 'দুর্ঘটনা'র-ই পরিণাম হয়ে থাকে, তাহলে ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা যে পথে অগ্রসর হয়েছে, সে পথে অগ্রসর হতে বাধ্য ছিল কেন? সে পথ ছাড়া সম্পূর্ণ ভিন্ন কোন পথে অগ্রসর হলো না কেন, আর হলে কি অসুবিধাটা হতো? নিস্তরঙ্গ 'বস্তুপুঞ্জ' 'পাক' খেতে খেতে মাঝখানে খানিকটা বস্তুর 'ঘন পিন্ড' জমে উঠল কেন? সে ঘন পিন্ডটি হঠাৎ করে 'সূর্যের রূপ' পরিগ্রহ করে বসল কেন? দু'টো নক্ষত্রের এক 'আকস্মিক নৈকট্যের' ফলে 'সৌর জগতে'র উৎপত্তি হতে গেল কোন্ কারণে? অন্য কিছুর উৎপত্তি তো হতে পারত? 'অতি বিশাল নক্ষত্রটি সূর্যের নিকট দিয়ে ছুটে গেল' কেন? আর তার আকর্ষণে সূর্যের বুক থেকে গ্যাসীয় বস্তুপুঞ্জ ছিটকে পড়ল কেন? ছিটকে পড়া বস্তুপুঞ্জ সূর্যের চারপাশে ঘুরতে গিয়ে গ্রহ-উপগ্রহেই পরিণত হলো কেন? বস্তু কণিকাপুঞ্জে নিরন্তর গতিশীলতার ফলে সৃষ্ট 'পাক'-গুলো 'ছোট-বড়' হতে গেল কেন? বড় একটি পাকে বস্তুকণা ঘনীভূত হলো কেন? কেন আদি সূর্যের কেন্দ্র বস্তু সৃষ্টি হলো? চারপাশের ঘূরন্ত অন্যান্য পাকে

www.pathagar.com

বস্তুকণার সমাবেশে নানা আকারের শীতল আদি গ্রহকণিকা পিন্ডই বা সৃষ্টি হলো কেন? সূর্যের প্রচন্ড তাপে ও তার অভ্যন্তরীণ সংকোচনের ফলে বলয়, ধূমকেতু, উল্কা প্রভৃতিরই বা উৎপত্তি হলো কোন্ কারণে? এ ছাড়া অন্য কিছু কি হতে পারত না? তারাগুলো পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ছাই-ভস্মে পরিণত হলো না কেন? নিস্তরঙ্গ বস্তু কণিকাপুঞ্জে গতিশীলতা এসে নিছক গতিশীলতাই থাকল না, ক্রম-বিকাশ ও ক্রম-উন্নতিমূলক গতিশীলতায় পরিবর্তিত হলো কেন? কেন এক বিস্ময়কর ধারাবাহিকতার ফলে তা বর্তমান মহাবিশ্বের অস্তিত্বদানের দিকে দৌড়াতে লাগল? কোন্ শক্তি বলে নক্ষত্রসমূহ অস্তিত্ব লাভ করেই কূল-কিনারাহীন মহাশূন্যে অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে আবর্তিত হতে শুরু করল, আর কে এই আবর্তন চালু করল? মহাবিশ্বের এক দূরতম কোণে সৌরলোককে অস্তিত্ব দিল কে?

কোন্ কারণে পৃথিবীতে এমন সব বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধিত হলো, যার দরুণ এখানে জীবনের উন্মেষ ও স্থিতি সম্ভবপর হয়েছে? অথচ এসব পরিবর্তনের কোন সন্ধান বিশ্বলোকের অসংখ্য সৌরজগতের অন্য কোন একটিতে আজ পর্যন্তও পাওয়া যায়নি। ক্রমবিকাশের এক বিশেষ পর্যায়ে নিষ্প্রাণ, নির্জীব 'বস্তু' থেকে জীবন্ত সৃষ্টির উদ্ভব হওয়ারই বা কি কারণ দেখা দিয়েছিল? ভূপৃষ্ঠে জীবনের উন্মেষ কি করে ও কি কারণে সম্ভব হলো, তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দর্শানো কি সম্ভব? মহাবিশ্বের সংঘটিত একটি দুর্ঘটনার ফলে যখন পৃথিবী অস্তিত্ব লাভ করেছে, তখন এখানে জীবনের উন্মেষ ও সৃষ্টির জন্যেও অনুরূপ কোন-না-কোন দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়া কি অপরিহার্য নয়? তাহলে কোন্ দুর্ঘটনার ফলে পৃথিবীর বুকে জীবনের উন্মেষ ঘটল, কি ছিল তার কারণ?

মহাবিশ্বের এক ক্ষুদ্রায়তন গ্রহে (পৃথিবীতে) বিস্ময়করভাবে এমন সব জিনিস সৃষ্টি হয়েছে, যা আমাদের জীবন, সমাজ ও সভ্যতার জন্যে একান্তই অপরিহার্য। কিন্তু এর কারণ কি? আর সে সব জিনিসও অফুরন্ত হয়েই বা থাকছে কেন? কি এর যুক্তি? কেবল আকস্মিক দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়াই কি এসব ঘটনার পূর্ণ পরম্পরা সহকারে ধারাবাহিকভাবে ঘটে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট কারণ? তারই জন্যে কি এসব লক্ষ কোটি বছর ধরে অব্যাহত হয়ে থাকছে? এতকাল এত শত-সহস্র লক্ষ কোটি বছর গত হয়ে যাওয়ার পরও কি তা নিঃশেষ হয়ে যাবে না—তার ক্রমিক ধারায় বিন্দু মাত্র পরিবর্তনও আসবে না? নিছক দুর্ঘটনা বশত ঘটে যাওয়া ব্যাপারের সাথে এই বাধ্যবাধকতা ও অপরিহার্যতার গুণ কোথা থেকে এলো? এমন বিস্ময়করভাবে অব্যাহত ধারায় ক্রমাগত বিকাশ ও উন্নতি লাভের প্রবণতাই বা এলো কোথা থেকে?

বিশ্বলোকের পরিচালক কে

বিশ্বলোক কি করে অস্তিত্ব লাভ করল, এ পশ্নের জবাব নিয়েই আমরা এ পর্যন্ত

www.pathagar.com

আলোচনা করলাম। এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে, এ মহা বিশ্বলোকের পরিচালক কে? এ বিরাট বিশাল সীমা-পরিসীমাহীন মহাবিশ্ব-কারখানাটিকে এমন সুন্দর এবং সুশৃঙ্খলভাবে কে চালাচ্ছে? উপরোদ্ধৃত সৃষ্টিরহস্য বিশ্লেষণে মহাবিশ্বের 'স্রষ্টা' যাকে বলা হয়েছে, তাকেই এর প্রশাসক, পরিচালক স্বীকার করা যেতে পারে না। তার জন্যে অন্য আর একটি 'কারণ' দাঁড় করানো ছাড়া উপায় নেই। তাই বলা যায়, উপরোদ্ধৃত বিশ্লেষণ স্বরূপেই ও স্ব-প্রকৃতিতেই দুইটি স্বতন্ত্র 'কারণ' বা 'খোদা' স্বীকার করতে চায়। কেননা, প্রথম গতিশীলতার ব্যাখ্যায় কারণ রূপে 'আকস্মিকতা' বা দুর্ঘটনাকে ধরা হয়েছে। কিন্তু তার পরের ক্রমাগত ও 'আকস্মিকতা'কে তো 'কারণ' বলা যেতে পারে না কোন অবস্থাতেই। তার ব্যাখ্যার জন্যে দ্বিতীয় আর এক কারণ বা খোদার সন্ধান অবশ্যই করতে হবে।

এই সমস্যা সমাধানের জন্যে 'কার্যকারণ পরম্পরা নীতি' (principle of causation) পেশ করা হয়েছে। তার অর্থ, প্রথম গতিশীলতার পর বিশ্বলোকে কার্যকারণের এমন একটা ধারাবাহিকতা স্থাপিত হয়ে গেছে, যার দরুন ঘটনার পর ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে অব্যাহত ও নিরবচ্ছিন্নভাবে—ঠিক যেমন কোন বালক বহু সংখ্যক ইট একটির পর একটি দাঁড় করিয়ে পাশের একখানি ইট ঠেলে ফেলে দেয়, তখন সব ইটই একটির পর একটি নিজে নিজেই পড়ে যেতে থাকে। এখন যে সব ঘটনা ঘটেছে, তার 'কারণ' বিশ্বলোকের বাইরে কোথাও নিহিত নেই। শক্ত আইনের অধীনে প্রতিটি ঘটনা পূর্ববর্তী একটি ঘটনার অনিবার্য পরিণাম হয়ে থাকে। আর এই পূর্ববর্তী অবস্থাও তার পূর্বেকার ঘটনাবলীর অনিবার্য পরিণাম ছিল। এভাবে বিশ্বলোকে কার্য ও কারণের একটা অচ্ছেদ্য ধারাবাহিকতা দাঁড়িয়ে গেছে। এমনিভাবে যে অবস্থা বিশ্বলোকের ইতিহাস শুরু করিয়ে দিল, ঠিক তাই পরবর্তী ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতায় চূড়ান্ত ফয়সালা করে দিয়েছে। প্রাথমিক অবস্থা যখন একবার নির্ধারিত হয়ে গেছে,তখন বিশ্ব-প্রকৃতি একই পদ্ধতিতে শেষ লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে, অন্য কোন পদ্ধতিতে নয়। এক কথায়, বিশ্বলোক যে-দিন শুরু হলো, সেদিনই তার পরবর্তী ইতিহাসও সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে।

এই মূলনীতিটিকে বিশ্ব-প্রকৃতির মৌল বিধান মনে করা সপ্তদশ শতকের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ সময়েই গোটা বিশ্বলোককে একটা 'স্বয়ং-চালিত যন্ত্র' প্রমাণ করার আন্দোলন শুরু হয়েছিল। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এ আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। ঐ যুগটি ছিল বিজ্ঞানবিদ প্রকৌশলীদের। বিশ্ব-প্রকৃতির যান্ত্রিক ছাঁচ বা নকশা (model) তৈরীর জন্যে তারা উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। তখন হেল্‌ম হল্‌জ্‌ (Helm Holtz) বলল, 'প্রকৃতি বিজ্ঞানের' চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো যন্ত্র-নির্মাণ বিদ্যায় (mechanics) পরিণত করা, সৃষ্টি ও জীবন যন্ত্রবৎ, এই হলো তার সারকথা। এ নীতির আলোকে বিশ্বলোকের সব বাহ্য মূর্তি বা ব্যাপার (phenomenon)-এর

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা দিতে বিজ্ঞানীরা আজও সক্ষম হননি। কিন্তু তাদের দৃঢ় প্রত্যয় হলো, যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্বলোকের সৃষ্টিরহস্যের ব্যাখ্যাদান সম্ভবপর। তাদের মতে এর জন্যে সামান্য চেষ্টাই যথেষ্ট, তাহলে শেষ পর্যন্ত গোটা বিশ্বলোক একটি সম্পূর্ণ চলমান স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে প্রমাণিত হয়ে যাবে।

মানব জীবনের সাথে এসব ব্যাপার ও বিষয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। কার্যকারণ পরম্পরা নীতির প্রতিটি সম্প্রসারণ এবং বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিটি সফল যান্ত্রিক ব্যাখ্যা মানুষের ইচ্ছা, ক্ষমতা ও প্রয়োগ স্বাধীনতায় বিশ্বাস করা অসম্ভব করে দিয়েছে। কারণ, এ নীতি যদি সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিতে পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে, তাহলে জীবন তো তা থেকে ভিন্ন কিছু হতে পারে না। বস্তুত এরূপ চিন্তা–পদ্ধতির ফলেই সপ্তদশ শতকে 'যান্ত্রিক দর্শন' (mechanical philosophy) উৎপত্তি লাভ করে। যখন আবিষ্কৃত হলো জীবকোষ (living cell)—ও নিষ্প্রাণ নির্জীব–বস্তুর মতো একই রাসায়নিক মৌল উপাদান থেকে গড়ে উঠেছে, তখনই প্রশ্ন উঠেছে, যেসব বিশেষ উপাদান দিয়ে আমাদের দেহ ও মগজ তৈরী হয়েছে, তা কার্যকারণ নীতির আওতার বাইরে থাকবে কি করে? তখন ধরণা জন্মাল এবং জোর গলায় দাবি করা হলো যে, জীবনও একটা বিশেষ 'যন্ত্র', অবিমিশ্র যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। এতদূর বলা হয়েছে যে, নিউটন, বাখ (Bach) ও মাইকেল এ্যাঞ্জেলো (Michael Angelo) মগজ মুদ্রণ যন্ত্র (printing machine) অপেক্ষা মাত্র জটিলতা ও সূক্ষ্মতার দিক দিয়েই ভিন্ন। আর কেবল বাইরের কার্যকারণ অনুযায়ী কাজ করাই তাদের একমাত্র কাজ।

কিন্তু এ কঠিন ও ভারসাম্যহীন অস্বাভাবিক ধরনের কার্যকারণ নীতির প্রতি এখনকার বিজ্ঞানের কোন বিশ্বাস নেই। আপেক্ষিকবাদ (theory of relativity) কার্যকারণ নীতিকে নিছক বিভ্রান্তি (illusion) বা প্রতারণা বলে মনে করে। ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগে বিজ্ঞানের সামনে একথা প্রতিভাত হয়ে উঠে যে, বিশ্ব–লোকে এমন বহু বাহ্য প্রকাশমান (phenomenal) ঘটনা রয়েছে, যার কোন যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়, যেমন আলো ও মধ্যাকর্ষণ শক্তি। এসব ঘটনা বিশ্বপ্রকৃতির যান্ত্রিক ব্যাখ্যাকে বরং বাতিল প্রমাণ করে। তখন এ নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয় যে, এমন কোন যন্ত্র বানানো যায় কি,যদ্দ্বারা নিউটনের চিন্তাধারা, বাখ–এর হৃদয়াবেগ ও মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর কল্পনার পুনরাবর্তন ঘটানো সম্ভব হতে পারে? কিন্তু বিজ্ঞানীরা অচিরেই অনুধাবন করতে সক্ষম হলো যে, প্রদীপের নেভানো আলো ও আপেলের পতনকে কোন যন্ত্র পুনরাবৃত্তি করতে পারে না। প্রাচীন বিজ্ঞান অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে প্রচার করেছিল যে, প্রকৃতি কেবল মাত্র একটি পথই অবলম্বন করতে পারে, যা প্রথম দিন থেকেই কার্যকারণ পরম্পরা ক্রমিক ধারা অনুযায়ী একটি স্তর হিসাবে সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানকে এ মতবাদ ত্যাগ করতে হলো। বিশ্বলোকের অতীত অতটা অটল–অবিচলভাবে ভবিষ্যতের 'কারণ' নয় যতটা পূর্বে

www.pathagar.com

ধারণা করা গিয়েছিল, বিজ্ঞান একথা মেনে নিতে বাধ্য হলো। আধুনিকতম তত্ত্ব ও তথ্যের আলোকে অধিকাংশ বিজ্ঞানীই একমত হয়ে বলেছেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্রোত-প্রবাহ আমাদেরকে এক অ-যান্ত্রিক মহাসত্যের (Non-Mechanical Reality) দিকে প্রবলভাবে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।[১]

বিশ্বলোকের সৃষ্টি ও তার গতিশীলতা সম্পর্কে এ উভয় মতবাদ বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও বিকাশের এক পর্যায়ে পৌঁচেছে বটে; কিন্তু দুটো মতবাদই দৃঢ় প্রত্যয় থেকে বঞ্চিত। আধুনিক কালের চিন্তা গবেষণা এই মতবাদদ্বয়ের ভিত্তি দৃঢ় করে না, বরং আরো দুর্বল করে দিয়েছে। এক কথায়, বিজ্ঞানই এ মতবাদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। মানুষ আবার তার সেই পুরানো অবস্থায়ই ফিরে এসেছে। এখন নতুন করে এ প্রশ্ন প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে, এ বিশাল বিশ্বলোক কে সৃষ্টি করেছে, কে তাকে চালিয়ে নিচ্ছে, নিয়ন্ত্রণ করছে?

মা'বুদ কে

মানুষের দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, আমার মা'বুদ কে? বস্তুত মানুষ নিজের জীবনে একটা বিরাট শূন্যতা মর্মে মর্মে অনুভব করে। কিন্তু সে শূন্যতা পূর্ণ করার উপায় যে কি, তা সে জানে না। শূন্যতার এই তীব্র অনুভূতিকেই এখানে 'মা'বুদের সন্ধান' নামে অভিহিত করা হয়েছে। শূন্যতার এ অনুভূতি দুটো দিক দিয়ে মানুষকে দুর্বল করে দেয়।

আমরা নিজেদের জীবন-সত্তা (Existence) ও বাইরের জগত সম্পর্কে যখন চিন্তা করি, তখন আমাদের মনে দুটি আবেগ জেগে উঠে। এদের একটি হলো কৃতজ্ঞতা বা অনুগৃহীতের আবেগ, আর দ্বিতীয়টি হলো নিজেদের দুর্বলতা ও অক্ষমতার অনুভূতি।

আমাদের জীবনের যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই আমাদের উপর দয়া, অনুগ্রহ ও অবদানের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। দয়া, অনুগ্রহ ও অবদানে আমাদের গোটা জীবন-সত্তাই আচ্ছন্ন ও আবৃত হয়ে আছে, চলছে তার অবিরাম, অবিশ্রান্ত বর্ষণ। তা দেখে এসবের দাতার প্রতি আমাদের হৃদয় সীমাহীন কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ভাবধারায় উদ্বেলিত হয়ে উঠে। মনে এ ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠে যে, আমাদের সর্বোত্তম ভক্তি-শ্রদ্ধা, আনুগত্য ও দাসত্ব ভাবধারার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ সেই অনুগ্রহকারীর সমীপে সবিনয়ে উৎসর্গ করি, নিজেকে নিঃশেষ করে ঢেলে দেই তাঁরই উদ্দেশে। এ দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্বলোকের সৃষ্টিকর্তার সন্ধান আমাদের জন্যে

১. এসব তত্ত্ব ও তথ্য জেমস্ জীনস লিখিত Mysterious Universe গ্রন্থে বিস্তারিত লেখা রয়েছে।

www.pathagar.com

নিছক একটা দার্শনিক পর্যায়ের প্রয়োজনই নয় বরং আমাদের মনস্তত্ত্বের সাথে তা গভীরভাবে সম্পৃক্ত। স্রষ্টা কে, বিশ্বের পরিচালক কে, এ প্রশ্ন আমাদের একটা বাহ্যিক সমস্যার সমাধানের প্রশ্ন নয়। মূলত এ হচ্ছে আমাদের জীবন-সত্তার অভ্যন্তরীণ অ-উপেক্ষণীয়দাবি—একটা প্রবল মনস্তাত্ত্বিক চাহিদাও। আমাদের গোটা সত্তাই এ প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট জবাব পাওয়ার জন্যে উদ্‌গ্রীব, ব্যাকুল।

মানুষ নিজেকে এই বিশ্বলোকে জীবন্ত দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু এ ব্যাপারে তার নিজের চেষ্টা বা চাওয়া-না-চাওয়ার বিন্দু মাত্র অংশ বা অবকাশ নেই। মানুষ নিজেকে এমন একটা পূর্ণাঙ্গ দেহ-সম্পন্ন দেখতে পাচ্ছে, যার চাইতে উত্তম দেহ সত্তার সে কল্পনাও করতে পারে না। এই দেহ সে নিজে রচনা করেনি, নিজের প্রয়োজন অনুপাতেও সে একে প্রয়োজনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সুসজ্জিত করেনি। অথচ এর একটা অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গও তার জন্যে অকেজো বা অপ্রয়োজনীয় নয়। এর যে কোন একটার অনুপস্থিতি বরং তাকে অসম্পূর্ণ, অক্ষম বা পঙ্গু করে দিত। মানুষ তার অভ্যন্তরে—মনে ও মগজে—এমন সব শক্তি ও প্রতিভার অবস্থিতি অনুভব করছে, যা এ দুনিয়ার অপর কোন জীব বা প্রাণীর নেই। অথচ এসব শক্তি, প্রতিভা এবং যোগ্যতা অর্জনের জন্যে সে কিছুই করেনি, সাধ্যও তার ছিল না। আমাদের এই সত্তা আমাদের নিজস্ব সম্পদ নয়, স্বীয় অর্জিত বা স্বনির্মিতও নয়। এটা সম্পূর্ণভাবে দান বিশেষ। কিন্তু এ দানের দাতা কে? কোন্ সে মহান সত্তা যা আমি না চাইতেই এবং আমার কোন চেষ্টা বা যত্ন ব্যতিরেকেই আমাকে এসব নিজ থেকেই দান করলেন? যিনিই তা করে থাকুন, তিনি যে নিজগুণেই মহান এবং অনন্য সাধারণ শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী, তাতে তো আমার কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। সংশয় থাকতে পারে না তারও, যার আছে এরূপ অনুভূতি, এরূপ উদার বিদ্বেষহীন ও আবিলতা-মুক্ত মন ও মানসিকতা। তাই আমার প্রতি এসব অনুগ্রহ কার অবদান, এ প্রশ্ন আমার মনের গভীরে সোচ্চার। আমার গোটা সত্তা, সমস্ত প্রকৃতিই এ প্রশ্নের জবাব নিঃসন্দেহে পেতে চায়, যেন আমি আমার এ মহা অনুগ্রহকারীর প্রতি হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে যথোপযুক্ত কৃতজ্ঞতা জানাতে পারি। এ প্রশ্নের গুরুত্ব কি কোন ন্যায়পরায়ণ মানুষ অস্বীকার করতে পারে?

শুধু দেহ-ই নয়, দেহের বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। এখানে এতসব আগ্রহ দৃষ্ট হবে যা গণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়। দুনিয়ায় আমরা এমন এক অবস্থায় ভূমিষ্ট হই, যখন আমরা থাকি সম্পূর্ণ নিঃস্ব, আপনার বলতে কিছুই থাকে না। তখন এ বিশ্বের কোন কিছুর উপর আমাদের কোন ইখ্‌তিয়ারও থাকে না, আমরা নিজেরা এখানকার কোন মৌলিক জিনিসকে নিজের প্রয়োজন পূরণের উপযোগী করে বানিয়ে নিতেও পারি না। তখন আমাদের প্রয়োজনের কোন শেষ থাকে না। অথচ একটি প্রয়োজনও আমরা নিজেরা পূরণ করতে সমর্থ হই না। তা সত্ত্বেও আমরা যখন দেখতে

www.pathagar.com

পাই যে, আমাদের সব প্রয়োজন পরিপূরণের সুষ্ঠু ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা আগে থেকেই এখানে হয়ে রয়েছে, তখন আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। আমাদের মনে হয়, বিশ্ব প্রকৃতি তার বিপুল সাজ-সরঞ্জাম, আয়োজন ও যাবতীয় ব্যবস্থাপনাসহ পৃথিবীতে মানুষের জন্মগ্রহণের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে। মানুষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সেই সব কিছুই তার সর্বাঙ্গীন সেবায় একান্তভাবে নিয়োজিত হয়ে যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরুন, শব্দ বা ধ্বনি। আমরা নিজেদের মনের চিন্তা-ভাবনা বা কল্পনা এই শব্দের মাধ্যমেই অন্যদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেই। আমাদের মনের পর্দার প্রতিফলিত চিন্তা-কল্পনা জিহ্বা ও কণ্ঠ বা গলার ভিতরে অবস্থিত স্বরযন্ত্রের এক জোড়া পাতলা পর্দার (স্বররজ্জুর) কাঁপুনি হয়ে অন্যদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। আর তা তাদের জন্যে বোধগম্য শব্দে রূপান্তরিত হয় বলে তারা সে শব্দ শুনতে পায়। এই 'শব্দ' করতে পারার জন্যে আমাদের ভিতর ও বাইরে অসংখ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্যে শব্দ উচ্চারণকারীর ফুস্‌ফুস্‌ থেকে নির্গত বায়ু স্বররজ্জু দুটিতে কাঁপুনির সৃষ্টি করে এবং গলা, মুখ-গহ্বর এবং জিহ্বা, দাঁত ও ঠোঁটের অবস্থান দ্বারা এই বায়ু প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। তবেই বিভিন্ন ধরনের শব্দ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। শব্দ অন্যদের শোনানোর জন্য কেবল এতটুকু ব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়। এ জন্যে সে কম্পন নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে হতে হবে। শব্দায়মান বস্তুর কম্পন সংখ্যা প্রতি সেকেন্ডে মোটামুটি ২০ বারের কম এবং ২০,০০০ বারের বেশী হলে সে শব্দ অন্য কেউ শুনতে পাবে না। তাছাড়া শব্দ শুনবার জন্যে শব্দায়মান বস্তু ও শ্রোতার মধ্যবর্তী স্থানে কোন জড় মাধ্যম থাকতে হবে। সাধারণত বায়ুই হয়ে থাকে এই জড় মাধ্যম। বস্তুটির কম্পনের ফলে তার সংশ্লিষ্ট বায়ুস্তর সংকুচিত ও প্রসারিত হবে। সুতরাং কম্পমান বস্তুটির স্পন্দন কেবল তাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। তার প্রভাবে বায়ুতেও পর্যায়ক্রমে সংকোচন ও প্রসারণের সৃষ্টি হবে। বায়ুর স্থিতিস্থাপক ধর্ম আছে বলে এরূপ সংকোচন ও প্রসারণ বায়ুর ভিতর দিয়ে ক্রমে ক্রমে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে বিস্তার লাভ করে। শুধু বায়ুই নয়, যে কোন গ্যাস, তরল বা কঠিন পদার্থের মাধ্যমেও শব্দ বিস্তার লাভ করে। আমরা যেসব শব্দ উচ্চারণ করি তা নিঃশব্দ প্রবাহ রূপে বায়ুর উপর ভর করে এমনিভাবে ছড়িয়ে পড়ে, যেমনি পানির উপরিভাগে (surface) তরঙ্গের উদ্ভব হয় ও তা চারদিকে বিস্তৃতি লাভ করে। আমার মুখ নিঃসৃত শব্দ আপনার কান পর্যন্ত পৌঁছবার জন্যে বায়ুর মাধ্যম অপরিহার্য। এ মাধ্যম না হলে আমার ওষ্ঠদ্বয় শুধু নড়তে দেখবেন, কোন শব্দ শুনতে পাবেন না। একটি মুখবন্ধ ফানুসের মধ্যে বৈদ্যুতিক ঘন্টা রেখে বাজানো হলে তার শব্দ স্পষ্ট শোনা যাবে। কিন্তু ফানুসের ভিতরের বাতাস সম্পূর্ণ বের করে দিয়ে ঘন্টা বাজানো হলে কাচের মধ্যস্থ ঘন্টাটিকে বাজতে দেখা যাবে, শব্দ শোনা যাবে না। কারণ ঘন্টা বাজার দরুন যে কম্পন সৃষ্টি হয় তা ধরে আপনার কর্ণকুহরে পৌঁছাবার জন্য প্রয়োজনীয় বায়ু সেখানে নেই। অবশ্য এ মাধ্যমও

www.pathagar.com

যথেষ্ট নয়। কারণ বাতাসের মাধ্যমে আমাদের শব্দ পাঁচ সেকেন্ডে মাত্র এক মাইল পথ অতিক্রম করে। তার অর্থ, বাতাস শুধু নিকটস্থ পরিবেশে কথোপকথনের জন্যে যথেষ্ট। বাতাস আমাদের কণ্ঠধ্বনিকে দূরবর্তী স্থানে পৌছাতে পারে না। শব্দ যদি শুধু বাতাসের মাধ্যমেই ছড়িয়ে পড়ত, অন্য কোন মাধ্যমের প্রয়োজন না হতো তাহলে দূরবর্তী স্থানে শব্দ পৌছানো অসম্ভব হতো। তাই বিশ্ব-প্রকৃতি আর একটি অত্যন্ত দ্রুতগামী মাধ্যমের ব্যবস্থা করে রেখেছে। তাহলো বিদ্যুৎ প্রবাহ বা আলোক-তরঙ্গ, যার গতি প্রতি সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বা ৩,০০,০০০ কিলোমিটার। এতে বিদ্যুৎ প্রবাহকে ইলেকট্রন টিউবের দ্বারা শক্তিশালী করা এবং বাহক তরঙ্গের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হয়। এ মিশ্রিত তরঙ্গেরই হয় উক্তরূপ গতি। বেতার বার্তা প্রেরণে এ তরঙ্গকেই কাজে লাগানো হয়। বক্তা যখন রেডিও স্টেশনে মাইক্রোফোনে কথা উচ্চারণ করে, তখন সে মাইক্রোফোন সেই শব্দটি ধরে বিদ্যুৎ তরঙ্গে পরিবর্তিত করে, আর ক্যাবল এর সাহায্যে তা ট্রান্সমিটার অ্যানটেনা বা আকাশ-তারের মধ্য দিয়ে চতুর্দিকে পাঠিয়ে দেয়। শব্দটি পৌছতেই ট্রান্সমিটারে কম্পন সৃষ্টি হয়। সেই কম্পন মহাশূন্যে অনুরূপ কম্পনের সৃষ্টি করে দেয়। এ ভাবে সেকেন্ডে মাত্র পাঁচ মাইল দূরত্ব অতিক্রম-সক্ষম শব্দ বিদ্যুৎ তরঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ২ লক্ষ মাইল গতি অর্জন করে এবং নিমিষের মধ্যে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। এই বেতার তরঙ্গই আমাদের রেডিও সেট-এর বেতার তরঙ্গ-গ্রাহকযন্ত্র গ্রহণ করে। বিদ্যুৎ প্রবাহকে পরে লাউড স্পীকারের সাহায্যে শব্দে রূপান্তরিত করা হয়। ফলে হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী বেতার কেন্দ্রে বক্তা যা বলেন, বেতার গ্রাহক যন্ত্রে তা সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে যায় এবং আমরা হুবহু শুনতে পাই।

বিশ্ব-প্রকৃতির বুকে আমাদের কল্যাণের জন্য সংরক্ষিত অসংখ্য ব্যবস্থার মধ্য থেকে এখানে মাত্র একটির কথা সংক্ষেপে বলা হলো। আরও যে হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ ব্যবস্থা রয়েছে তাদের উল্লেখ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষ প্রতি মুহূর্ত এসব ব্যবস্থার বাস্তব সুবিধে ভোগ করছে। এদের কোন একটিও না থাকলে মানুষের জীবন শুধু অচলই নয়, অসম্ভব হয়ে পড়বে। এ সব ব্যবস্থা ছাড়া এ দুনিয়ার বুকে মানুষের জীবন, সমাজ ও সভ্যতার কল্পনাও করা যায় না। এরূপ অবস্থায় মানুষ সুনির্দিষ্টভাবে জানতে চায়, এই বিরাট বিপুল ব্যবস্থাপনা কার অবদান? সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্রতম পরমাণু দ্বারা এ পৃথিবীকে কে গঠন করল, অস্তিত্ব দিল? প্রোটোপ্লাজম নামক জটিল রাসায়নিক পদার্থ কে বানাল, কে তা দিয়ে গঠন করল জীবদেহ, শুরুতে নবজাত পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া, মিথেন, জলিয়বাষ্প, অক্সিজেন, কার্বন-ডাই অক্সাইড ইত্যাদি গ্যাস জমিয়ে রেখেছিল কে, যার ফলে এসব মৌল ও যৌগ উচ্চতাপে, চাপে এবং অনুঘটনের প্রভাবে মিলিত হয়ে সৃষ্টি করল নানা প্রকারের জৈব অণু—ডি·এন· এ· (deoxy ribonucleic acid) ও আর· এন· এ·

www.pathagar.com

(ribonucleic acid)? সেই আদি প্রোটোপ্লাজমের বংশধর কেবল মাত্র সুনির্দিষ্ট দুই শাখায় রূপ নিল কেন?—এক কিংবা তিন বা ততোধিক শাখায় রূপ নিল না কেন? এ প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব কি মানব মনকে শান্ত করার জন্যে অপরিহার্য নয়?

মানুষ এ সব প্রশ্ন নিয়ে যতই চিন্তা করে, যতই দেখতে পায় ও ভোগ করে এখানকার অফুরন্ত কল্যাণকর ব্যবস্থাসমূহ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে, ততই তার হৃদয়-মন ভক্তি-শ্রদ্ধায় অবনমিত হয়ে আসে। সে তার এ অনুগ্রহ দানকারীকে জানতে চায়, একান্ত আপন করে পেতে এবং নিজেকে তাঁরই উদ্দেশ্যে নিঃশেষে উৎসর্গ করে দিতে চায়। বস্তুত উপকারীর কল্যাণ ও অনুগ্রহকে স্বীকার করা, তাঁকে অন্তরের অন্তঃস্থলে স্থান দেয়া এবং তাঁরই উদ্দেশ্যে হৃদয়-মনের গভীর আবেগ ও পবিত্র ভাবধারা ও উৎসর্গ করা মানব প্রকৃতির পবিত্র আকুতি। যে কেউ নিজের জীবন ও বিশ্ব পরিবেশ সম্পর্কে সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিবেচনা করবে, তারই মনে এ ভাবধারা ও আকুতি তীব্র হয়ে উঠবে। এ আকুতির, এ আবেগের কি কোন জবাব নেই? মানুষ কি এই বিশ্বলোকে এতই অসহায়, ইয়াতীম হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে যে, তার হৃদয়ে উদ্বেলিত ভক্তি, শ্রাদ্ধা ও ভালবাসার পরিতৃপ্তি ও চরিতার্থতা সাধনের জন্যে কোন সত্তাই কোথাও বর্তমান থাকবে না? এ বিশ্বলোক কি এমনই একটা অবস্থান যেখানে অনুগ্রহ ও দয়া-দাক্ষিণ্য রয়েছে অফুরন্ত, সীমাহীন অথচ সে সবের দাতার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না, হৃদয়াবেগ চরিতার্থ করার নেই কোন পাত্র বা মাধ্যম?

মা'বুদের সন্ধানের এ হলো একটি দিক। অপর দিকটি হলো, মানুষের বাস্তব অবস্থা স্বভাবতই বিশ্বপ্রকৃতির বুকে কোন-না-কোন আশ্রয় বা সহায় বর্তমান থাকা একান্ত অপরিহার্য করে দিয়েছে। চোখ খুলে তাকালে দেখতে পাই, এ দুনিয়ায় আমরা—মানুষেরা—অতীব দুর্বল, অসহায় ও অক্ষম জীব মাত্র। আমাদের পৃথিবী যে মহাশূন্যে ঝুলন্ত অবস্থায় থেকে সূর্যের চারপাশে উপবৃত্তাকার পথে আবর্তিত হচ্ছে, এ কথাটা একবার গভীরভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ২৫হাজার মাইল। সে তার অক্ষের উপর দাঁড়িয়ে ক্রমাগত ও নিরবচ্ছিন্নভাবে লাটিমের মত ঘুরছে। প্রতি ২৪ ঘন্টায় একবার এই আবর্তন সম্পূর্ণ হয়। তার অর্থ, গড়ে প্রায় এক ঘন্টা সময়ে পৃথিবী তার অক্ষের (axis) উপর ১০৪৮ মাইল পথ অতিক্রম করে। সেই সঙ্গে পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ১৮ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল দীর্ঘ উপবৃত্তাকার পথে প্রতি সেকেন্ডে ১৮ মাইল বেগে প্রদক্ষিণ করছে। পৃথিবীর গতিবেগ বেশী হলে তার কক্ষের ব্যাস বেড়ে যেত এবং ক্রমশ তা সূর্যের আকর্ষণের বাইরে চলে যেত ও ছিটকে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। আর বেগ যদি এর চাইতে কম হতো তাহলে পৃথিবী সূর্যের উপর গিয়ে পড়ত ও জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যেত। সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ একটা নির্দিষ্ট বেগে ঘুরছে বলেই পৃথিবী সূর্য থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকতে পারছে।

www.pathagar.com

আমরা মানবকুল এ দ্রুত গতিবান পৃথিবী–রথের আরোহী। মহাশূন্যে এত দ্রুত ধাবমান পৃথিবীর উপর আমাদের অবস্থিতি নিশ্চিত ও নির্বিঘ্ন করার উদ্দেশ্যেই তার গতিকে একটা নির্দিষ্ট মানে রাখা হয়েছে। যদি তেমন না হতো তা হলে পৃথিবীর বুকে মানুষের অবস্থা—দ্রুত চলমান রেলগাড়ীর চাকার উপর কোন প্রস্তরখন্ড রাখা হলে যেরূপ হতে পারে বলে কল্পনা করা যায়, তার চাইতেও করুণ হতো। কিন্তু এখানে মানুষের অবস্থান নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে গৃহীত ব্যবস্থাদির জন্যেই তা হয়নি। একই সঙ্গে আর একটি স্বাভাবিক ব্যবস্থা হলো মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সদা সক্রিয়তা। এই শক্তি মানুষকে পৃথিবীর দিকে তীব্র আকর্ষণের বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। উপরন্তু তার সঙ্গে রয়েছে উপর থেকে বায়ুর চাপ। বায়ুর যে চাপ প্রতিনিয়ত প্রতিটি বস্তু ও দেহের উপর তা প্রতি বর্গ ইঞ্চির উপর সাড়ে সাত সের হারে পড়ছে বলে এ পর্যন্ত জানা গেছে। তার অর্থ, একজন মধ্যম আকারের মানুষের সমগ্র দেহের উপর প্রায় ২৮০ মন বায়ুর চাপ পড়ছে। এ যে এক অতীব বিস্ময়কর ব্যবস্থা তা কে অস্বীকার করতে পারে। আর এ ব্যবস্থার দরুনই মাহাশূন্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে তীব্র গতিতে আবর্তনশীল পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে থাকা ও অবস্থান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে।

এরপর চিন্তা করুন সূর্য সম্পর্কে। সৌর মন্ডলের রাজা সূর্য হলো একটি তারা। আয়তন ৮ লক্ষ ৬৫ হাজার মাইল। তার অর্থ, সূর্য আয়তনে পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় ১৩ লক্ষ গুণ বড়। সূর্য এটি জ্বলন্ত অগ্নিপিন্ড; উপরিভাগের তাপ প্রায় ৬,০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড—এক জ্বলন্ত অগ্নিময় মহাসমূদ্র বললেও বোধ হয় পূর্ণ বলা হয় না। সূর্যের কাছাকাছি কোন কঠিন জিনিস থাকতেই পারে না। পৃথিবী সূর্য থেকে গড়ে প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার অর্থাৎ ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরত্বে অবস্থান করে। এ দূরত্বের কারণে সূর্যের প্রচন্ড তাপের প্রায় ২০০ কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র পৃথিবীর উপর পড়ে। পৃথিবী যদি সূর্য থেকে বর্তমান অপেক্ষা অর্ধেক কম অর্থাৎ ৪ কোটি ৬৫ লক্ষ মাইল দূরত্বে অবস্থান করত তাহলে সূর্যতাপে কাগজ পর্যন্ত জ্বলে যেত। আর যদি পৃথিবী চন্দ্রের স্থানে থাকত অর্থাৎ দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরত্বে এসে যেত,তাহলে মাটি গলে বাষ্পে পরিণত হয়ে কর্পূরের মত উড়ে যেত। অথচ এই সূর্যের মহান অবদানেই পৃথিবী বুকে জীবনের উন্মেষ এবং অবস্থিতি ও তৎপরতা সম্ভবপর হচ্ছে। সূর্য থেকে পৃথিবীর অবস্থানের এ দূরত্ব ঠিক এ উদ্দেশ্যেই। আর পৃথিবী যদি বর্তমান অপেক্ষা আরও অধিক দূরত্বে চলে যেত তাহলে পৃথিবী বরফে জমে যেত।

এ মহাবিশ্বের এই ব্যাপকতা ও বিশালতাটা একবার ভেবে দেখুন। সেই সঙ্গে ভাবুন সেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্পর্কে, যা এই বিশাল, বিপুল সীমাহীন মহাবিশ্বের সব কিছুকে পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ় বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। আমাদের এই বিশাল সৌরজগতটা অসীম মহাকাশের তুলনায় একটি অতি ক্ষুদ্র এলাকা। যেন সমুদ্রতটে একটি বালুকণা। মহাশূন্য কতদূর বিস্তৃত তা এখনও কল্পনাতীত এবং সেখানে অসংখ্য জ্যোতিষ্ক

www.pathagar.com

পৃথিবী থেকে এতদূরে যে, তাদের দূরত্ব প্রকাশ করতে আলোক বর্ষ একক প্রয়োজন হয়। আলোর বেগ সেকেন্ডে প্রায় ১,৮৬,০০০ মাইল বা ৩ লক্ষ কিলোমিটার। এই বেগে এক বছরের আলো যতদূর যায়, তাকেই এক আলোকবর্ষ দূরত্ব বলে। এক আলোকবর্ষ =১,৮৬,০০০ x ৬০ x ৬০ x ২৪ x ৩৬৫ বা৬,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল (প্রায়) =৬ x ১০মাইল বা ৯·৭ x ১০১২ কিলোমিটার (প্রায়)। বিজ্ঞানীদের মতে এমন অনেক জোতিষ্ক আছে তারা এত দূরে যে, তাদের আলো এখনও পৃথিবীতে এসে পৌছায়নি। মহাবিশ্বের চারদিকে একটিবার ঘুরবার জন্য কত শত কোটি বছর লাগতে পারে তা অনুমান করাও সম্ভব নয়।

আমাদের এ পৃথিবী যে সৌরলোকে অবস্থিত, তা বাহ্য দৃষ্টিতে খুব বড় মনে হলেও মহাবিশ্বের তুলনায় এর কোনই গুরুত্ব নেই। মহাকাশে এর চাইতেও বড় ও বিরাট বিরাট তারা বা গ্রহ রয়েছে সংখ্যাতীত। সেগুলো এই সীমাহীন বিশালতায় বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে। তাদের মধ্যে কোন কোনটি এত বড় যে, আমাদের গোটা সৌর জগতটা তার ভিতরে থাকতে পারে। যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এ অসংখ্য জগতকে কঠিন অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে রেখেছে , তার কল্পনা করাও সহজ নয়। সূর্য যে অসামান্য চুম্বক শক্তিতে পৃথিবী-গ্রহকে নিজের দিকে নিরন্তর আকর্ষণ করছে এবং তাকে মহাশূন্যে ছিট্‌কে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করছে, তা এতই শক্তিশালী যে তা বোঝাতে এতটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে পৃথিবীকে যদি কোন বস্তু দ্বারা বেঁধে রাখতে হতো তবে ঘাসের পাতা যেমন ভূপৃষ্ঠ ঢেকে রাখে তেমনিভাবে অগণিত ধাতব শলাকা দ্বারা ভূপৃষ্ঠকে জড়ানো প্রয়োজন হয়ে পড়ত।

আমাদের এই জীবন যেসব শক্তি ও উপায়-উপকরণ, দয়া-দাক্ষিণ্য ও বাস্তব আনুকূল্যের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল, সে সবের উপর আমাদের কোন ক্ষমতা চলে না। মানুষের জীবন ধারণের জন্যে দুনিয়ায় যেসব ব্যবস্থা নিরন্তর কর্মরত রয়েছে এবং যে সবের অবস্থিতি ছাড়া জীবনের কল্পনা করা পর্যন্ত সম্ভব নয়। এগুলো এত উচ্চমানের ও ব্যাপক এবং এদেরকে বাস্তবায়িত করতে এত অসাধারণ শক্তির প্রয়োজন যে, মানুষ নিজের শক্তি দ্বারা তা করার কথা কল্পনাও করতে পারে না। এখানকার অস্তিত্বমান জিনিসসমূহের জন্য যে কর্মনীতি নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তা নির্ধারণ করা দূরের কথা, সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করাও মানুষের ক্ষমতা-বহির্ভূত ব্যাপার। মানুষ গভীরভাবে অনুভব করছে যে, বিশ্বলোকের সেই সাধারণ শক্তি যদি তার সাথে সহযোগিতা না করত, তা হলে ভূ-পৃষ্ঠে মানুষের বসবাস আদৌ সম্ভব হতো না।

এই ধরনের একটি জগতে মানুষ যখন নিজের ক্ষুদ্রতম ও সহায়-সম্বলহীন অস্থিত্ব দেখতে পায়, তখন সে আরো বেশী অসহায় বোধ না করে পারে না। সীমাহীন সমুদ্রের

www.pathagar.com

উত্তাল তরঙ্গের মাঝে পড়ে একটা পিপীলিকা নিজেকে যতটা অসহায় মনে করে, দুনিয়ার মানুষের অসহায়ত্ব বোধ তার চাইতেও বেশী। সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত সে পিপীলিকাটি যেমন করে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করে, মানুষও এখানে তেমনিভাবে কূল-কিনারাহীন অসহায়ত্বের মধ্যে নিজেকে রক্ষা করতে চেষ্টিত হয়। মানুষ এই আশা নিয়ে বেঁচে থাকে যে, বিশ্বলোকের এই অথৈ সমুদ্রে কেউ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসুক। সে এমন এক সত্তার আশ্রয়ে নিজেকে সমর্পণ করে দিতে চায়, যিনি হবেন বিশ্বলোকের এসব শক্তিরও অনেক উর্ধ্বে এবং যার আশ্রয়ে সে নিজেকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত ও নিরাপদ মনে করতে পারবে। মানব মনের এই আবেদনেরই অন্য নাম তার আশ্রয়দাতার অনুসন্ধান।

মা'বুদের এ সন্ধান মূলত মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশ। তার আস্থা, ভরসা ও নির্ভরতার ভাজন হতে পারে এমন এক সত্তার সন্ধানে মানুষ উদগ্রীব। আধুনিক যুগে জাতি, দেশ বা জন্মভূমি ও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যকে মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত অনুসন্ধানের জবাব রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আধুনিক সভ্যতার বক্তব্য হলো নিজের জাতি, জন্মভূমি ও রাষ্ট্রকে এই মর্যাদা দাও; তাই হবে তোমাদের শ্রদ্ধা-ভক্তির কেন্দ্রস্থল। অবশ্য এসবকে মা'বুদ রূপে পেশ করা হয়নি বা সরাসরি মানুষকে বলা হয়নি এগুলোকে মা'বুদ বলে গ্রহণ করতে অথচ কার্যত এগুলোকে যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তার অর্থ সেই চূড়ান্ত আনুগত্য, যা একমাত্র মা'বুদেরই পাওনা। মানুষের মনে ও জীবনে এক মা'বুদের যে স্থান ও গুরুত্ব হতে পারে, ঠিক সেই স্থান ও গুরুত্বই এসবকে দেবার জন্যে পরোক্ষভাবে আহবান জানানো হচ্ছে। কিন্তু মানব হৃদয়ে মা'বুদ সন্ধানের যে আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, মানুষের মনস্তত্ত্বে তার কার্যকারণ অনেক গভীরে সমাহিত ও বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, সম্প্রসারিত। তা এমন এক মহান সত্তার সন্ধানে ব্যাকুল, যিনি গোটা বিশ্বলোকের নিয়ন্ত্রক, পরিব্যাপক। কোন ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে মানুষের মা'বুদ সন্ধানের কোন জবাব পাওয়া যেতে পারে না। আধুনিক সভ্যতা এক্ষেত্রে যে সব জিনিস পেশ করছে, তা খুব বেশী হলেও একটি সমাজ গড়ে তোলার কাজে কিছুটা সাহায্য করলেও করতে পারে কিন্তু তা মানবীয় হৃদয়াবেগের সান্ত্বনা হতে পারে না কখনো। সেজন্যে এক বিশ্বব্যাপক মহাসত্তার প্রয়োজন। মানুষের ভালোবাসা, ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আত্মোৎসর্গের লক্ষ্য কেন্দ্র বা আধার হবার যোগ্যতা থাকতে পারে এমন এক সত্তার, যিনি আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। মানুষের আশ্রয় হওয়ার জন্যে সন্ধান করা হচ্ছে এমন এক শক্তির, যা হবে গোটা বিশ্বলোকের প্রশাসক ও পরিচালক। সে যতদিন এমন এক সত্তার সন্ধান না পাবে, ততদিন তাকে আশ্রয়হীনতা ও অসহায়ত্ব বোধের মহাশূন্যতায় হাবুডুবু খেতে হবে। তা থেকে অন্য কিছু তাকে মুক্তি দিতে পারে না—পারবে না। এ অভাব, এ শূন্যতার পরিপূরণ অন্য কারো বা অন্য কিছুর দ্বারা সম্ভব হবে না।

www.pathagar.com

মানুষের পরিণতি কোথায়

মহাসত্যের সন্ধানের তৃতীয় পর্যায় হলো মানুষের পরিণাম ও পরিণতির সন্ধান। মানুষ জানতে চায়, সে কোথা থেকে এখানে এল এবং এখান থেকে কোথায় যাবে। সে নিজের মধ্যে অনুভব করে বিপুল কর্মোদ্দীপনা, সীমাহীন আশা-আকাঙ্খা। সেগুলোর পরিতৃপ্তি ও চরিতার্থতা কিরূপে হবে, তা সে জানতে চায়। সে পেতে চায় বর্তমান সীমাবদ্ধ জীবনের তুলনায় এক অনন্ত জীবন। কিন্তু তা কোথায় পাওয়া যাবে—তা সে জানে না। মানুষের মধ্যে রয়েছে বহু নৈতিক ও মানবীয় অনুভূতি। কিন্তু তার প্রায় সবই এখানে নির্মমভাবে উপেক্ষিত, অবহেলিত। তাহলে মানুষ কি তার মনমত জগত পাবে না? এই প্রশ্ন মানব মনে কেন উদয় হচ্ছে, দানা বাঁধছে, তার বিশ্লেষণ হতে পারে—বিশ্বপ্রকৃতির অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আর সম্ভবত এই তার উপযুক্ত সময় ও ক্ষেত্র।

জীব বিজ্ঞানীদের ধারণা, মানুষ তার বর্তমান আকার আকৃতিতে তিন লক্ষ বছর ধরে ভূ-পৃষ্ঠে বসবাস করছে। তার তুলনায় বিশ্বলোকের বয়স দুই লক্ষ কোটি বছর। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, অতীতে বিশ্বে ছিল উষ্ণ গ্যাসীয় বস্তুপুঞ্জের সুবিস্তৃত নীহারিকা। পরে তাতে গতির সঞ্চার হয়। বস্তুপুঞ্জ অনবরত পাক খেতে খেতে তার কেন্দ্রস্থলে জমে উঠে খানিকটা বস্তুর ঘন পিন্ড, যা পরে সূর্যের রূপ নেয়। তার চারপাশে ছিট্‌কে পড়া বস্তুপুঞ্জ ঠান্ডা হয়ে জমাট বেঁধে নানা গ্রহ-উপগ্রহের রূপ নেয়। এগুলোকেই আমরা তারা বা নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ কিংবা নীহারিকা বলি। এ টুকরোগুলো গ্যাসভর্তি ভয়াবহ গোলক রূপে কতকাল পর্যন্ত মহাশুন্যে আবর্তিত হচ্ছিল, তার হিসেব কারো জানা নেই। প্রায় দুইশত কোটি বছর পূর্বে সূর্যের চাইতে বড় কোন বিরাটকায় এক নক্ষত্র মহাশূন্যে ভ্রমন করতে করতে সূর্যের অতি নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় তার আকর্ষণে সূর্যের বুকে মহা ঝড় সৃষ্টি হয়। সেই বিশাল নক্ষত্রটি সূর্যের নিকট থেকে দূরে সরে যাওয়ার মুহূর্তে তার আকর্ষণ শক্তি এত বেশী বৃদ্ধি পেয়ে গেল যে, সূর্যের বুক থেকে গ্যাসীয় বস্তুপুঞ্জ মহাশূন্যে ছিট্‌কে পড়ে গেল। এই বস্তুপুঞ্জই পরে ঠান্ডা হয়ে সৌরলোকের বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহে পরিণত হয়। সেই থেকে এসব গ্রহ-উপগ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। আমাদের এই পৃথিবীও অনুরূপ একটি গ্রহ মাত্র (লাপ্লাসের নীহারিকাবাদ ও জীন্‌সের আকস্মিক নৈকট্যবাদের কথা আমরা পূর্বে অন্য প্রসঙ্গে বলেছি)।

পৃথিবী আদিতে একটি প্রচন্ড অগ্নি বলয়রূপে সূর্যের চারদিকে আবর্তিত হচ্ছিল। কিন্তু মহাশূন্যে ক্রমাগত তাপ নিষ্কাশনের ফলে পৃথিবী ধীরে ধীরে ঠান্ডা হতে হতে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে শীতল হয়ে যায়। ভূ-তাত্ত্বিকদের ধারণা, আমাদের এই পৃথিবীর বয়স প্রায় ৫০০ কোটি বছর। অতীতে আদি পৃথিবী ছিল অতিশয় উষ্ণ। পৃথিবীর বুকে

www.pathagar.com

সজীব পদার্থ সৃষ্টির জন্যে আর্দ্র ও নাতিশীতোষ্ণ পরিবেশ গড়ে উঠতে কেটে যায় প্রায় ২৫০ কোটি বছর। প্রায় ১ শত ২৩ কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীতে প্রথম জীবনের উদ্ভব হয়। প্রোটিন ডি. এন. এ. ও আর. এন. এ. ইত্যাদি অণু একত্রিত হয়ে সাগরের লোনা পানি প্রবাহ সৃষ্টি করে জীব–কণার আধার–প্রোটোপ্লাজম। এর পর নানা ধরনের প্রাণীর সৃষ্টি ও মৃত্যু হতে থাকে। বহু সহস্র বছর কাল ধরে পৃথিবীতে শুধু এসব জীব–জন্তুই বসবাস করেছে। তারপর সমুদ্রে উদ্ভিদ ও স্থলভাগে ঘাস গজাতে শুরু করে। এভাবে দীর্ঘকাল ধরে অসংখ্য প্রকারের ঘটনা এখানে সংঘটিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এখানে মানুষের অনুকূল পরিবেশ গড়ে ওঠে এবং তখন পৃথিবীর বুকে মানুষের অবির্ভাব সংঘটিত হলো।

এ মতবাদ অনুসারে পৃথিবীর বুকে মানুষের সূচনা হয়েছে ৩ লক্ষ বছর পূর্বে। এই সময়টা খুব দীর্ঘ নয়, বরং খুবই কম। বিশ্বলোক কাল ও সময়ের যে দূরত্ব অতিক্রম করেছে, তার তুলনায় মানব ইতিহাসের বর্ণিত সময়কাল এক নিমিষের অধিক নয়। তার পরে 'মানবতার একক'–কে ধরলে জানা যাবে যে, একজন মানুষের বয়সের গড় একশ' বছরেরও কম। এ হলো একদিকের ব্যাপার। সেই সঙ্গে আর একটি গভীর সত্য সামনে রাখতে হবে যে, বিশ্বলোকে মানুষের চাইতে উত্তম ও উন্নত আর কোন সত্তা আছে বলে জানা যায়নি। আসমান–যমীনের লক্ষ ও শত কোটি বছরের আবর্তনের ফলে যে সর্বোত্তম সত্তা বিশ্বলোকে অস্তিত্ব লাভ করেছে, তা হলো মানুষ। সমগ্র সৃষ্টিলোকের উপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ও অস্তিত্বমান জগতে সর্বাধিক মর্যাদাবান সত্তা এই মানুষের আয়ুষ্কাল মাত্র কয়েকটি বছর, তার বেশী নয়। অথবা যে সব মৌলিক উপাদানের সংমিশ্রণে মানুষের সৃষ্টি, সে সবের বয়স শত কোটি কিংবা লক্ষ কোটি বছর। আমাদের অস্তিত্বের পূর্বে এগুলো বর্তমান ছিল, আমাদের মৃত্যুর পরও থাকবে অনন্তকাল ধরে। বিশ্বনিখিলের যা সার–নির্যাস, তার বয়স হবে এ বিশ্ব ভুবনের বয়সের তুলনায় অনেক কম। ইতিহাসের দীর্ঘাতিদীর্ঘ সময়ে অসংখ্য ঘটনা কি শুধু এজন্যে সন্নিবদ্ধ ও সন্নিবেশিত হয়েছিল যে, মাত্র কয়েক দিনের জন্যে মানুষ নামে এক জীব সৃষ্টি হবে এবং তারপর সব নিঃশেষ হয়ে যাবে?

বর্তমান ভূ–পৃষ্ঠে যত মানুষ আছে তার মধ্যে প্রতিটি মানুষ যদি ছয় ফুট লম্বা, আড়াই ফুট চওড়া ও এক ফুট মোটা হয়, তা হলে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতায় এক মাইল আয়তন বিশিষ্ট একটি বাক্সে সব মানুষকে বন্ধ করা যেতে পারে। কথাটা আজগুবি মনে হলেও নিতান্ত সত্য। পরে মানুষ ভর্তি এই বাক্সটিকে সমুদ্রতীরে নিয়ে সামান্য একটু ধাক্কা দিলেই গভীর পানিতে গিয়ে পড়বে। তারপর শত শত বছর অতিবাহিত হয়ে যাবে। মানব বংশ কাফনে আচ্ছাদিত হয়ে চিরকালের জন্যে পড়ে থাকবে। দুনিয়ার স্মৃতিপট থেকে মুছে যাবে মানুষ নামের জীব, যারা এখানে দূর অতীতের কোন এককালে বসবাস করত। সমুদ্রের উপরিভাগে আজকের মতই নিয়মিতভাবে তুফান

www.pathagar.com

আসতে থাকবে। সূর্য এমনিভাবেই রশ্মিবিকিরণে চতুর্দিক আলোকোজ্জ্বল করে তুলতে থাকবে। ভূ–মন্ডল প্রতিনিয়ত স্বীয় মেরুদন্ডের উপর আবর্তিত হতে থাকবে। বিশাল বিশ্বলোকের সীমাহীন পরতে পরতে বিস্তীর্ণ অসংখ্য সৌরলোক মানুষের এত বড় একটা দুর্ঘটনাকে কোনই গুরুত্ব দেবে না। কয়েক শত বছর পর একটা উঁচু টিবি নীরব ভাষায় সাক্ষ্য দেবে, এই হচ্ছে বিশ্বমানবতার সমাধি। বহুকাল পূর্বে তাদের মাত্র একটি বাক্সে বন্দী করে সমাধিস্থ করা হয়েছিল।

প্রশ্ন হচ্ছে, মানবতার মূল্য কি এতটুকু? মৌল উপাদান–বস্তু চূর্ণ–বিচূর্ণ করুন, কুটে কুটে গুড়া করুন, তা কখনো নিঃশেষ হয়ে যাবে না। বাহ্যাবস্থা তার যাই হোক, তার অস্তিত্ব অবশ্য বজায় থাকবে। কিন্তু এ 'বস্তু' দিয়ে তৈরী সেরা সৃষ্টি মানুষের কি কোন স্থায়িত্ব নেই? যে মানুষের জীবন সারা বিশ্ব–নিখিলের সারনির্যাস সে মানুষকে এত সহজে খতম করা যেতে পারে, মন তা বিশ্বাস করতে চায় না। মানুষ কি এতই অন্তঃসারশূন্য যে, তার ক্ষুদ্রায়তন জন্মভূমিতে সে কয়েকটি দিনের জন্যে আবির্ভূত হবে, আর তার পরে নিঃশেষে ধ্বংস হয়ে যাবে? শুধু এতটুকুতেই কি মানব জীবনের চূড়ান্ত পরিনতি? মানুষের সমস্ত জ্ঞান–বিজ্ঞান, সাধনা ও তার সব সাফল্য ও চরিতার্থতা সংক্রান্ত যাবতীয় ঘটনার ইতিহাস মানুষের সঙ্গে সঙ্গেই চিরদিনের জন্যে লুপ্ত হয়ে যাবে? আর বিশ্বভূবন শাশ্বত ও স্থায়ী হয়ে থাকবে–যেন মানুষ নামের কোন সত্তাই কোন কালে এখানে ছিল না–এটা কি করে বিশ্বাস করা যায়?

এ জগৎ ও জীবন অসম্পূর্ণ

এ পর্যায়ে আরো একটা কথা তীব্রভাবে মনে বিঁধে। মানুষের জীবন যদি দুনিয়াতেই নিঃশেষ হয়ে যায় এবং তারপর আর কিছুই না থাকে তাহলে বলতে হবে এ ক্ষণস্থায়ী জীবন মানুষের আশা–আকাঙ্খা পরিপূরণের জন্য মোটেই যথেষ্ট নয়। মানুষ চায় দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে। মৃত্যু কারোরই ইপ্সিত নয়। সে পেতে চায় সব দুঃখ, ব্যথা ও কষ্ট থেকে মুক্তি এবং সুখ–সমৃদ্ধিপূর্ণ জীবন। কিন্তু প্রকৃত সুখ ও সম্ভোগ লাভ কি এখানে কারো পক্ষেই সম্ভব? তা সম্ভব নয়, কারণ সবার জন্যে মৃত্যু অবধারিত। এ সীমাবদ্ধ ও নশ্বর জীবনে সে কামনা–বাসনার কিছু পায় না। মানুষ সত্যিই যা কিছু চায়–কামনা করে, এই বস্তুজগত তা পাওয়ার কিছুমাত্র অনুকূল নয়। বাঞ্ছিতের পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে গেলেই মানুষ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। বিশ্বলোক মানুষের পক্ষে খানিকটা বেশ অনুকূল, তারপরই প্রতিকূল। তাহলে এই জগতটা কি মানুষের জন্যে বানানো হয়নি?

মানুষ কি এই জগতে ভুলবশতই এসেছে, পথ ভুলে? যে জগত তার জন্যে বানানো হয়নি, তাকেই কি সে ভুল করে 'আপনার' করে পেতে চেয়েছে? মানুষের সমস্ত

www.pathagar.com

কামনা-বাসনা, চিন্তা ও কল্পনা কি নিতান্তই অবাস্তব? মানব মনে যে সব কামনা-বাসনা জাগে তা কি শুধু এজন্যে যে, তা নিয়ে মানুষ কাজ করবে ও চলে যাবে? বিগত হাজার হাজার বছর ধরে মানব মনে যেসব অনুভূতি জেগেছে, তার কোন মনযিল নেই? অতীতে কি তার কোন ভিত্তি নেই, নেই ভবিষ্যতে কোন স্থিতি ও বাস্তবতা?

অথচ বিশ্বলোকে মানুষই এমন জীব, যার আগামীকাল (Tomorrow) সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আছে। ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা করা একমাত্র মানুষেরই বিশেষত্ব। মানুষ চায় তার ভবিষ্যতকে উত্তম ও উন্নততর করে গড়ে তুলতে। ভবিষ্যতের কথা সৃষ্টিলোকে আর কেউই ভাবে না—তার জন্যে বাস্তব পদক্ষেপ নেয় না, এমন কথা অবশ্য চূড়ান্তভাবে বলা চলে না। পিপীলিকারাও ভবিষ্যতের প্রয়োজনে খাদ্য সঞ্চয় করে, বাবুই পাখি বাসা বানায়। কিন্তু ওদের এ কাজ তো সচেতনভাবে নয়, নিতান্তই অবচেতনভাবে, স্বভাবগত অভ্যাস হিসেবে। খাদ্য সঞ্চয় করে রাখার কিংবা নীড় রচনার পিছনে ওদের বিবেক বুদ্ধির কোন সচেতন সিদ্ধান্ত ও সক্রিয়তা থাকে না, যোগ্যতাও নেই। এ ক্ষমতা একমাত্র মানুষেরই রয়েছে এবং সচেতনভাবে সে-ই ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে, তার আয়োজনে আত্মনিয়োগ করে। মানুষ ও অন্যান্য জীব-প্রাণীদের মধ্যে এটাই পার্থক্য। এ পার্থক্যের দরুনই অন্যান্যের তুলনায় মানুষের অনেক বেশী সুযোগ-সুবিধা থাকা বাঞ্ছনীয়।

জন্তু-জানোয়ারের ক্ষেত্রে আজকের জীবনটাই একমাত্র সত্য জীবন। ওদের জীবনে 'কাল' বলতে কিছু নেই। তাহলে মানুষের জীবনেও কি 'কাল' (কল্য) বলতে কিছু নেই? - তা-ই যদি হয়, তাহলে বলতে হবে, এটা স্বাভাবিক নয়। মানব মনে কল্যের চিন্তা চিরভাস্বর। সে জন্যে মানুষ যতটা জীবন 'আজ পাচ্ছে', তার চাইতে অনেক বেশী জীবন লাভ করার তার অধিকার থাকা উচিত। মানুষ চায় 'কল্য' কে অথচ তাকে দেয়া হয়েছে শুধু 'অদ্য' তা কি করে হতে পারে?

এমনিভাবে আমরা যখন আমাদের সমাজ-জীবনের দিকে তাকাই, তখন খুব বড় একটা শূন্যতার অনুভূতি আমাদের কঠিনভাবে পীড়া দেয়। একদিকে রয়েছে বস্তু জগত। তা সর্বদিক দিয়ে পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ বলে মনে হয়। একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম বিধানের মধ্যে তার সবটা শক্তভাবে বাঁধা রয়েছে। তার প্রতিটি ব্যাপার পূর্ব থেকে বেঁধে দেয়া পথে অবিশ্রান্ত ছুটে চলেছে। অন্য কথায়, বস্তুজগত ঠিক তেমনি, যেমনটা তার হওয়া উচিত। কিন্তু মানব জগতটা সে রকমের নয়। এখানকার অবস্থা যেমনটা কাম্য, অবস্থাটা তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা স্পষ্ট লক্ষ্য করছি, একজন মানুষ আর একজনের উপর অন্যায়ভাবে জুলুম করছে। অন্যজন তা নীরবে সয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত দু'জনেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে। একজন জালিম আর একজন মজলুম

www.pathagar.com

হিসেবে। কিন্তু জালিমকে তার জুলুমের কোন শাস্তি ভোগ করতে আমরা দেখি না, আর মজলুমকেও দেখি না তার জুলুম সহ্য করার কোন প্রতিফল পেতে। তাহলে জালিম তার জুলুমের শাস্তি না পেলে আর মজলুম তার জুলুম সহ্য করার প্রতিফল না পেলে এ দু'জনার জীবন সম্পূর্ণ হতে পারল না। এক ব্যক্তি সর্বাবস্থায় সত্য কথা বলে, সৎভাবে চলে। ফলে তাকে খুব কষ্টে-সৃষ্টে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। আর এক ব্যক্তি মিথ্যা ও প্রতারণাকে নিজের স্বার্থোদ্ধারের উপায় রূপে গ্রহণ করছে। যেখানে যার কাছ থেকে যতটা পারে, লুটে-পুটে নিয়ে সে বাহ্যত সীমাহীন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভরা জীবন উপভোগ করে। এরূপ অবস্থাতেই যদি দুনিয়া নিঃশেষ হয়ে যায়, তাহলে কি দু'জনের এ ভিন্ন ভিন্ন জীবন-পরিণামের কোন ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে? সম্ভব কি তার যথার্থ কারণ বিশ্লেষণ করা? একটা জাতি আর একটা জাতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার ধন-সম্পদ ডাকাতের ন্যায় লুটে নেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুনিয়ায় তার সুনাম সুখ্যাতির অন্ত থাকে না। কেননা তার হাতে রয়েছে প্রচার প্রোপাগান্ডা চালাবার শানিত হাতিয়ার। পক্ষান্তরে নির্যাতিত জাতির মর্মান্তিক দুরবস্থা সম্পর্কে বিশ্ববাসী কিছুই জানতে পারে না, বিশ্বের দরবারে সে জাতির আর্তনাদ পৌঁছায় না, পৌঁছাবার কোন উপায় বা বাহন তাদের করায়ত্ত নেই বলে। কিন্তু এ দুটি জাতির প্রকৃত অবস্থা কি বিশ্ববাসীর নিকট কখনই উদঘাটিত হবে না?. দু'জন লোক কিংবা দুটি জাতির পরস্পরে কোন বিশেষ বিষয়ে মতভেদ হয়-হয়েই থাকে। ফলে দু'পক্ষের মাঝে প্রবল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। শুরু হয় রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। উভয় পক্ষই নিজেকে নিরপরাধ এবং অপর পক্ষকে অপরাধী প্রমাণ করতে প্রাণপণ চেষ্টা চালায়। কিন্তু দুনিয়ার জীবনে এ দু'পক্ষের মামলার কোন চূড়ান্ত মীমাংসা হয় না। দু'পক্ষের মাঝে নিরংকুশ ইনসাফ ও সুবিচার করবে, এমন কোন আদালতও দুনিয়ায় নেই। আধুনিক যুগকে আনবিক যুগ বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু আসলে এ যুগটাকে চরম স্বেচ্ছাচারিতার যুগ বলাই উচিত। আজকের মানুষ কেবল নিজের মত ও ইচ্ছা এবং কামনা-বাসনা পূরণের পথেই চলতে চায়। তার সে মত ও ইচ্ছা যথার্থ কিনা, তার কামনা-বাসনা ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তি-যুক্ত কিনা, সে চিন্তা করতে সে কখনই প্রস্তুত নয়। এমন কি, নিজের মত ও পথের ভুল বুঝতে পেরেও মানুষ তাকেই আঁকড়ে ধরে থাকে, ভুল স্বীকার করতে রাযী হয় না। শুধু তাই নয়, পূর্ণ শক্তি দিয়ে সে নিজের ভুলকে নির্ভুল ও পরম সত্য বলে প্রমাণ করতে চেষ্টার ত্রুটি করে না। এ যে কত বড় প্রতারণা, কি বিরাট ধোঁকাবাজি, তা বলে শেষ করা যায় না। কিন্তু এই ধোঁকা ও প্রতারণার আবরণ ছিন্ন হয়ে পরম সত্য কি কোন দিনই উদ্‌ঘাটিত হবে না?

পূর্ণাঙ্গ জীবন জগত কোথায়

এদৃষ্টিতে বিচার বিবেচনা করলে স্বীকার করতেই হবে, এ জগত মোটেও সম্পূর্ণ

www.pathagar.com

নয়, নিতান্ত অসম্পূর্ণ। এর পরিপূর্ণতার জন্যে এমন আর একটি জগত একান্ত অপরিহার্য, যেখানে প্রত্যেকেই যথাযথ 'স্থান' ও 'মর্যাদা' পাবে। বস্তুজগতে আমরা দেখতে পাই যেখানে যতটুকু শূন্যতা রয়েছ, তা পরিপূরণের ব্যবস্থা ও আয়োজন সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যমান। তাই বস্তুজগতে কোনরূপ শূন্যতা বা অসম্পূর্ণতা গোচরীভূত হয় না। শূন্যতা ও অপূর্ণতা বিরাটভাবে রয়েছে মানবিক জগতে। তা ভরাট করার কোন ব্যবস্থা নেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যে মহাশক্তিমান সত্তা বস্তুজগতকে এমনিভাবে পূর্ণত্ব দান করেছেন, মানব-জগতের অসম্পূর্ণতা ও শূন্যতা পরিপূরণের শক্তি ও সামগ্রী কি তাঁর নিকট ছিল না? আমাদের অনুভূতির বিচারে কোন কোন কাজ ভালো এবং কোন কোন কাজ মন্দ বিবেচিত হয়। কিছু কিছু কাজ সম্পর্কে আমাদের বাসনা এই যে, এগুলো হোক ও হতে থাক, আর কিছু কিছু কাজ না হলেই ভালো। এটা আমাদের মনের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা বিশেষ। কিন্তু এ স্বাভাবিক প্রবণতার সম্পূর্ণ বিপরীত সব কাজই এখানে নিত্য সংঘটিত হচ্ছে। মানব প্রকৃতি যে কাজ পছন্দ করে না—যে সব কাজ না হওয়াটাই সে চায়, তাই এখানে ঘটে যাচ্ছে। মানব প্রকৃতির এই অনুভূতির তাৎপর্য এই হতে পারে যে, বিশ্বলোক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে বাতিলের পরিবর্তে সত্যেরই জয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহলে সর্ব ব্যাপারের প্রকৃত সত্য কি কোন দিন উদঘাটিত হবে না? বস্তু জগতে যা পূর্ণ হচ্ছে মানব জগতে তা পূর্ণ হবে না কেন?

এ হলো কতগুলো মৌলিক প্রশ্ন। এবং এ প্রশ্নগুলোর সমষ্টিরই নাম অমরা শুরুতে বলেছি "মানবতার পরিণতির সন্ধান।" যে কেউ এসব অবস্থা দেখবে ও এসব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে, তাকে অবশ্যই মানসিক অস্থিরতা ও উদ্বিগ্নতায় নিমজ্জিত হতে হবে। তার মনে এ অনুভূতি জাগবে যে, যা সে দেখতে পাচ্ছে তাই যদি হয় জীবন, তাহলে এ জীবন নিতান্ত অর্থহীন। একদিকে সে দেখতে পায়, বিশাল বিশ্বলোকে যা কিছু রয়েছে, তা সবই যেন কেবল মানুষের জন্যে, মানুষের জন্যেই এই বিরাট ও ব্যাপক আয়োজন। কিন্তু সেই সঙ্গে এও লক্ষ্য করা যায় যে, মানুষের জীবন এতই সংক্ষিপ্ত এবং অসহায় যে, মানুষকে এখানে কেন সৃষ্টি করা হলো, তা-ই বোঝা যায় না।

অবশ্য এসব প্রশ্ন সম্পর্কে আজকাল লোকদের মধ্যে এক নতুন প্রবণতা দেখা দিয়েছে। সাধারণত তাদের মনোভাব হলো, এসব প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামানো একটা নিতান্ত অর্থহীন ঝঞ্ঝাট। তাদের ধারণা, এসব দার্শনিক প্রশ্ন; বাস্তবতার সাথে তাদের দূরতম সম্পর্কও নেই। কাজেই এসব বাদ দিয়ে জীবনে যতটুকু সময় পাওয়া যায়, তাই সুখময়, স্ফূর্তিময় করে তুলতে চেষ্টা করা কর্তব্য। ভবিষ্যতে কি হবে না হবে, বর্তমানেই বা কি হচ্ছে ও হতে যাচ্ছে, তা ঠিক কিংবা বেঠিক, তা নিয়ে অনর্থক মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। এই হচ্ছে এ যুগের বস্তুবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি।

www.pathagar.com

এ একটা জবাবের মত জবাব বটে। কিন্তু এ জবাব সম্পর্কে অন্ততঃ এতটুকু বলা যায় যে, যারা এইরূপ মনোভাব পোষণ করে, তারা মানবতার মর্যাদা পর্যন্ত এখনো পৌঁছতে পারেনি। তারা জানে না, চেনে না, মানবতা ও মনুষ্যত্ব কাকে বলে। তারা বাহ্যিক জিনিসকে প্রকৃত ব্যাপার মনে করে নিয়েছে। নিত্যকার ঘটনাবলী চিরন্তন জীবনের গভীরতর রহস্য উদঘাটন চেষ্টায় মনোনিবেশ করার আহবান জানাচ্ছে, কিন্তু তারা মাত্র কয়েকদিনের জীবন নিয়ে মেতে রয়েছে। মানবীয় মনস্তত্ত্বের ঐকান্তিক দাবি হলো, নিজের মনোবাসনা ও আশা-আকাঙ্খা চরিতার্থ করার জন্যে এক ব্যাপকতর ও বিশালতর জগতের সন্ধান করা। কিন্তু এ নির্বোধেরা কায়ার বদলে ছায়াকে, আলোর পরিবর্তে আঁধারকে নিয়ে মগ্ন হয়ে রয়েছে। বিশাল বিশ্বলোক উদাত্ত কণ্ঠে বলছে, "এ জগত তোমাদের জন্যে একেবারেই অসম্পূর্ণ, তাই এক সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ জগতের সন্ধানে আত্মনিয়োগ কর।" কিন্তু সে ডাক মানুষের কানে প্রবেশ করে না। তারা এ অসম্পূর্ণ অস্থায়ী দুনিয়ায় নিজেদের সুখের জীবন-প্রাসাদ রচনা নিয়েই ব্যস্ত। পূর্ণাঙ্গ জগতের নাকি তাদের কোন প্রয়োজন নেই। বস্তুজগতের অবস্থা নিশ্চিতভাবেই দাবি করছে, জীবনের একটা পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এখানকার অধিবাসী মানুষ 'সূচনা' নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। পরিণাম ও পরিণতির ব্যাপারে তারা একেবারে নির্বিকার। একে উটপাখীর ভূমিকা ছাড়া আর কি-ই বা বলা যেতে পারে! জীবনের যদি কোন পরিণাম থেকেই থাকে, তাহলে তা অবশ্যই সামনে আসবে। কেউ যদি তার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি দেখায়ও, তবু তাতে তার উপস্থিতি প্রতিরুদ্ধ হবে না—কেউ তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। অবশ্য এ ধরনের লোকদের চরম ব্যর্থতা যে অবধারিত, তাতে সন্দেহ নেই। বস্তুত বর্তমানের এই জীবনকে পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ মনে করা এবং একে 'সুখময়' করার চেষ্টা অত্যন্ত হীনতা ও নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কি হতে পারে! মানুষ যদি নিজের জীবন ও এই বিশ্বলোক সম্পর্কে খানিকটা গভীরভাবে চিন্তা করে, তাহলে এ ধরনের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির অসারতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রকৃত সত্যকে এড়িয়ে থাকতে চাওয়া ও তার সম্মুখীন হবার সাহস না থাকার দরুনই এ ধরনের মনোভাবের সৃষ্টি হতে পারে। যারা না বুঝে, না শুনে জীবন যাপন করতে চায়, কেবল তারাই প্রকৃত সত্যকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করার ধৃষ্টতা দেখায়।

মানুষেরঅসহায়অবস্থা

এ পর্যন্ত আলোচনায় যেসব প্রশ্ন তুলে ধরা হয়েছে, এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে চিন্তা করলে এ প্রশ্নগুলো মানব মনে অত্যন্ত প্রকটভাবে জেগে উঠে। বস্তুত বিশ্বলোকের একজন স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক থাকা অপরিহার্য। কিন্তু সে স্রষ্টা সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। সে যে কে, তা আমাদের অজ্ঞাত। আমরা প্রতিমুহূর্ত কারো সীমাহীন ও নিরবচ্ছিন্ন দয়া-অনুগ্রহে আচ্ছন্ন, আচ্ছাদিত, অভিসিক্ত। আমরা

www.pathagar.com

অন্তরতরা কৃতজ্ঞতা ও শোকরের পবিত্র ভাবধারা নিয়ে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমরা তাঁর সামনে অফুরন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আত্মোৎসর্গের অর্ঘ্যসহ নিবেদিত হতে চাই। কিন্তু তেমন কোন সত্তাই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। এ বিশাল জগতে আমরা সীমাহীন অক্ষমতা ও অসহায়তার মধ্যে পড়ে রয়েছি। আমাদের একটি আশ্রয়ের প্রয়োজন, যেখানে পৌছে আমরা নিজেদের সম্পূর্ণ সুরক্ষিত ও নিরাপদ মনে করতে পারব। কিন্তু তেমন কোন আশ্রয় আমাদের চোখের সামনে নেই। সেই সঙ্গে আমরা যখন আমাদের জীবন ও বয়স সম্পর্কে চিন্তা করি, তখন আমরা স্পষ্টভাবে একটা চরম অসামঞ্জস্যতা ও স্বতঃবৈপরীত্যের সম্মুখীন হয়ে হতবাক হয়ে যাই। আমরা লক্ষ্য করি, মহাবিশ্বের বয়সকাল ৩ শত কোটি বছর; কিন্তু এ বিশ্বের নির্যাস যে মানুষ, তার বয়স আঙ্গুলে গণা কয়েকটি বছর মাত্র। বিশ্বপ্রকৃতি আমাদের অন্তরে জাগিয়ে দেয় কত শত আশা-আকাঙ্খা, কামনা-বাসনা। কিন্তু এ দুনিয়ায় সে সবের চরিতার্থতার কোন ব্যবস্থাই নজরে আসে না। এর চাইতেও মারাত্মক ধরনের স্বতঃবৈপরীত্য বস্তুজগৎ ও মানব জগতের মধ্যে বিরাজিত। বস্তুজগৎ তো সবদিক দিয়ে সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ মনে হয়; অন্ততঃ কোন শূন্যতা বা অসম্পূর্ণতা আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। আর থাকলেও সঙ্গ সঙ্গেই তা পূর্ণ হওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু মানব-জগতে বিরাট শূন্যতা রয়েছে। সেরা সৃষ্টির অবস্থা অন্যসব সৃষ্টির তুলনায় খুবই নিকৃষ্ট, করুণ। আমাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, পেট্রোলের নতুন কোন কূপ আবিষ্কৃত হলে, ছাগল-গরুর বংশ বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেলে, অধিক ফসল ফলার খবর পেলে মানুষ আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়, উল্লাসে নেচে উঠে। কিন্তু মানব বংশের সামান্য বৃদ্ধিতেও আমরা শঙ্কিত ও আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ি। তা যেন দুনিয়ার মানুষ সইতে পারে না। তাই অনতিবিলম্বে বংশ বৃদ্ধি প্রতিরোধের জন্যে সর্বশক্তি নিয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ যে চরম বৈপরীত্য, অসঙ্গতি ও আত্মবিরোধ সেটুকু অনুধাবনের যোগ্যতাও আমরা হারিয়ে ফেলি। কিন্তু কেন, কি কারণে?

এগুলো বড় বড় প্রশ্ন। এ প্রশ্নগুলো চারদিক থেকে আমাদের ঘিরে রেখেছে। এ কাল্পনিক নয়, আর মনের পটে যেমনি স্বতঃই ভেসে উঠে, তেমনি বাইরের জগৎ থেকেও কাঁটার মত আমাদের সর্বাঙ্গে বিঁধে। অথচ আমরা জানি না এসব প্রশ্নের কি জবাব। বস্তুত এগুলো হচ্ছে জীবনের নিগূঢ় সত্য জানবার প্রশ্ন। জীবন তো আমরা পেয়েছি; কিন্তু তার নিগূঢ়, নিবিড় পরম সত্য যে কি, তা আমাদের অজানাই রয়ে গেছে। তা কেউ আমাদের বলে দিচ্ছে না। কিন্তু জীবনদাতা যিনি, তিনিও কি তা বলে দেন নি।---তা কি করে হয়?

মানুষের সীমাহীন অক্ষমতা

এ মহাসত্য জানবার জন্য আমারা যখন আমাদের বিবেক-বুদ্ধি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা

www.pathagar.com

শক্তির প্রয়োগ করি, তখন স্পষ্ট বুঝতে পারি, বাঞ্ছিত সত্যের সন্ধান করা আমাদের শক্তির বাইরে। আজ পর্যন্ত এ পর্যায়ে যে মত আমরা ঠিক করেছি, তা নিতান্ত আন্দাজ বা অনুমান মাত্র। আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ। একটা বিশেষ আকার থেকে ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট জিনিসও আমরা এ চোখ দিয়ে দেখতে পাই না। একটা বিশেষ দূরত্বের বাইরে কিংবা অন্ধকারে ডুবে থাকা বা আড়ালে পড়ে থাকা জিনিস আমাদের চোখে আসে না। এ সত্য একান্ত বাস্তব ও অনস্বীকার্য। অনুরূপভাবে বিশ্বলোক সম্পর্কেও মানুষের জ্ঞানের পরিধি খুবই সংকীর্ণ। দৃষ্টিসীমার বইরে—সে দৃষ্টি চর্মচোখের কিংবা যান্ত্রিক চোখের হোক—কি হচ্ছে বা কি আছে, তা জানার কোন সাধ্য আমাদের নেই। সামগ্রিক মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমরা নিতান্ত অসম্পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। জ্ঞান অর্জনের প্রাথমিক উপায় বা মাধ্যম আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়। কিন্তু প্রকৃত ও মহাসত্য ইন্দ্রিয়ানুভূত নয়, ইন্দ্রিয়নিচয়ের আওতার মধ্যে নয়।

এ পৃথিবী যখন অস্তিত্ব লাভ করেছে, তার তুলনায় মানুষের জীবন তা অতীব সংক্ষিপ্ত এবং অত্যন্ত গুরুত্বহীন। আর পৃথিবীটা নিজে মহাবিশ্বের অসীমতার তুলনায় এক বিন্দু বা সমুদ্রতটের একটি বালুকণার সমানও নয়। এরূপ অবস্থায় মহাবিশ্ব সম্পর্কে মানুষ যেসব কল্পনা করে তা সাত অন্ধের হাতী দেখার হাস্যকর অবস্থারই শামিল। মহাবিশ্বের অসীমতা সম্পর্কে আমরা যখন কল্পনা করতে চেষ্টা করি, তখন আমাদের চরম অজ্ঞানতা আমাদের অহমিকাকে বিদ্রূপ করে। বস্তুত মাহাবিশ্ব কতদূর বিস্তৃত তা কল্পনাতীত। বিজ্ঞানীরা নাকি বলেছেন, সূর্যের ৮০ হাজার কোটি (৮০ খর্ব) বছর বয়স। এই পৃথিবীর বয়স দুইশত কোটি বছর। আর মাত্র তিন কোটি বছর পূর্বে নাকি এখানে জীবনের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু তার তুলনায় ভূ-পৃষ্ঠে বসবাসকারী বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের ইতিহাস পনেরো-বিশ হাজার বছরের বেশী নয়। এই প্রেক্ষিতে চিন্তা করলে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মানুষ এই যে মাত্র কয়েক হাজার বছর তথ্য সংগ্রহের জন্যে পেয়েছে, মূলত মহাবিশ্বের বুকে নিহিত গভীর রহস্য উদঘাটনের জন্যে প্রয়োজণীয় সময়ের তুলনায় এ সময়টা অতি ক্ষদ্রাতিক্ষুদ্র পরিসর, অত্যন্ত নগণ্য। এ জন্যে আমাদের বিবেক-বুদ্ধিকে অত্যন্ত বিনয় সহকারে স্বীকার করতে হয় যে, মহাবিশ্বের বিস্তৃতি, ব্যাপকতা ও বিশালতা সীমা-পরিসীমাহীন। আর তাকে জানবার ও বোঝবার জন্যে আমাদের বিবেক-বুদ্ধি অক্ষম, নগণ্য। আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা, যোগ্যতা দ্বারা কখনই তাকে বোঝতে পারব না আমরা।

এভাবে আমাদের জ্ঞান ও অধ্যয়ন পর্যবেক্ষণ আমাদের এমন এক স্থানে ছেড়ে দেয়, যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পাই আমাদের সামনে এমন কতগুলো পশ্ন প্রকট হয়ে রয়েছে যার জবাব সন্ধান করা একান্ত পরিহার্য, যে জবাব না পেলে মানব জীবন একেবারে অর্থহীন ও তাৎপর্যশূন্য হয়ে যায়। কিন্তু এ পশ্নগুলো নিয়ে আমরা যখন চিন্তা-ভাবনা করি, তখন আমরা সহজেই টের পেয়ে যাই যে, আমাদের ক্ষুদ্র ও

www.pathagar.com

সীমাবদ্ধ যোগ্যতা, প্রতিভার বলে এসব প্রশ্নের জবাব লাভ করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। বিশ্বলোক অন্তর্নিহিত মহাসত্য অবলোকন করার নেই আমাদের চোখ বা দৃষ্টি, নেই তাকে সরাসরি অনুভব করার মত শক্তি আমাদের মন ও মানসের।

রাসূল (স)—এর নির্ভুল জবাব

ঠিক এরূপ অবস্থায়ই একটি গম্ভীর কণ্ঠস্বর আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হয়। তাতে বলা হয়ঃ 'যে মহাসত্য তোমরা জানবার জন্যে এত উদ্‌গ্রীব, সে সম্পর্কে মহাবিশ্বের মূল অধিকর্তা কর্তৃকই আমাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। আর তা হলো ঃ

> এই বিশাল বিশ্বলোকের একজন সৃষ্টিকর্তা (আল্লাহ্) রয়েছেন। তিনিই গোটা বিশ্বলোক নিজের শক্তিতে সৃষ্টি করেছেন, নিজের ইচ্ছেমত এটাকে গড়ে তুলেছেন। আর তাঁর অসাধারণ শক্তিবলে এ বিশ্বলোকের সুষ্ঠু পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করেছেন। তোমরা যা কিছু লাভ করছ, তা সব তিনিই তোমাদের দিয়েছেন ও দিচ্ছেন; তিনি দিচ্ছেন বলেই তোমরা পাচ্ছ। সব ব্যাপারের মূল ও পূর্ণ কর্তৃত্ব তাঁরই হাতে নিবদ্ধ। বস্তুজগতের কোথাও যে তোমরা কোন বিরোধ, বৈপরীত্য দেখতে পাও না, তার কারণ, প্রতিটি জিনিস যথাযথভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। আর তার বিপরীত দিকে মানব জগৎ যে অসম্পূর্ণ ও অসমাপ্ত মনে হয়, চরম উচ্ছৃঙ্খলতা লক্ষ্য করা যায় তার কারণ, মানুষকে স্বাধীনতা দিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে। বিশ্বনিয়ন্তার ইচ্ছা হলো, তাঁর বিধান বস্তুজগতে যেরূপ প্রত্যক্ষভাবে কার্যকর হচ্ছে মানুষ তা নিজেদের ইচ্ছানুসারে ও সাধ্যানুসারে নিজেদের জীবনে পুরোপুরি কার্যকর করে তুলুক। তিনিই বিশ্বলোকের স্রষ্টা, তিনিই এর পরিচালক ও ব্যবস্থাপক। তাঁরই নিরবচ্ছিন্ন ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণে তা চলছে। মানুষের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়াবেগ পাওয়ার একমাত্র অধিকারী তিনিই। তোমাদের আশ্রয় দিতে সক্ষম একমাত্র তিনিই। তিনি তোমাদের জন্যে এক অসীম জীবনের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। সে জীবন যাবতীয় আশা-আকাঙ্খা ও কামনা-বাসনার চূড়ান্ত পরিতৃপ্তি ও চরিতার্থতার পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা। সেখানে সত্য, অসত্য, হক্ ও বাতিল ভিন্ন ভিন্ন করে দেয়া হবে। নেক্‌কার লোকদের তাদের নেক কাজের এবং অন্যায়কারীদের অন্যায় কাজের প্রতিফল দেয়া হবে। তিনিই আমার মাধ্যমে তাঁর কিতাব তোমাদের জন্যে পাঠিয়েছেন। সে কিতাবের নাম 'আল-কুরআন'। যে লোক তা মেনে চলবে সে-ই হবে সফলকাম। আর যে তা মানবে না—মানতেঅস্বীকার করবে, তাকে লাঞ্ছিত ও অবমানিত করা হবে।

বস্তুত এ হচ্ছে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর কণ্ঠস্বর। আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে আরবের মরুভূমি থেকে এ বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছিল। আজও সে

www.pathagar.com

কন্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে যায়নি। আজও বিশ্বমানবতার প্রতি তাঁর পয়গাম হলো, 'যদি প্রকৃত রহস্য জানতে চাও, তাহলে আমার এ আহ্বানের প্রতি মনোনিবেশ কর এবং আমি যা কিছু বলছি তা গভীরভাবে চিন্তা-বিবেচনা কর।'

জবাবের পর্যালোচনা

এ আওয়াজ কি প্রকৃত সত্যের সঠিক ব্যাখ্যা নয়? এ আকুল আহ্বানে কি আমাদের সাড়া দেয়া উচিত নয়? এ আহ্বানের সত্যতা যাচাই করতে চাও কোন্ সব ভিত্তির মানদণ্ডে?

এক শ্রেণীর লোকের ধারণা, তারা এ মহাসত্যকে তখনি স্বীকার করবে, যদি তা নিজেদের চর্মচক্ষে নিরীক্ষণ করতে পারে, পারে হাতে স্পর্শ করতে। অন্যথায় এ সত্য—তা যত বড় সত্য ও অকাট্যই হোক না কেন, তারা স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত নয়। অর্থাৎ চরম ও পরম সত্যকে তারা নিজেদের চক্ষে প্রত্যক্ষ করতে চায়। কিন্তু দেখতে চাওয়ার বা স্পর্শ করতে চাওয়ার এই প্রবণতা বা দাবি কি যুক্তিসঙ্গত? যদি কেউ গণিত শাস্ত্র ছাড়াই বিজ্ঞানের অধ্যয়ন করতে চায় এবং বলে যে, বিজ্ঞানের সেসব আবিষ্কারই সে মেনে নেবে, যা তার নিজের চোখে দেখতে পাবে; গণিত শাস্ত্রের যুক্তি-প্রমাণ তার নিকট অগ্রহণযোগ্য, তাহলে এটা যেমন হাস্যকর ব্যাপার হয়, এও ঠিক তেমনি। কারণ, একজন লোকের এরূপ দাবি বা প্রবণতার অর্থ হলো, তার নিজের যে শক্তি-সামর্থ্য আছে, সে বিষয়ে তার নিজেরই কোন সঠিক ধারণা নেই।

পর্যবেক্ষণ শক্তি মানুষের আছে, তা সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু তা যে নিতান্ত সীমাবদ্ধ, তাও অনস্বীকার্য। 'পরম সত্য' আমাদের পর্যবেক্ষণ বহির্ভূত জিনিস। আমরা তা অনুভব করতে পারি না। অতীতে এক সময়ে মনে করা হতো, চারটি জিনিসের সমন্বয়ে এ জগৎ সৃষ্টঃ আগুন, পানি, মাটি আর বায়ু। অন্য কথায়, প্রাচীনকালের মানুষ আজকের দৃষ্টিতে একটা নিতান্ত ভুল ধারণা পোষণ করত। তারা মনে করত, 'পরম সত্য' দর্শনযোগ্য। কিন্তু আধুনিক গবেষণা এ মতকে সম্পূর্ণ ভুল বলে প্রমাণ করেছে। এক্ষণে জানা গেছে, দুনিয়ার সমস্ত জিনিস তার সর্বশেষ বিশ্লেষণে অণুর ক্ষুদ্রতম ও সূক্ষ্মতর পরমাণু সমন্বয়ে গঠিত। পৃথিবীর সকল বস্তুরই গঠন পরমাণু সমন্বয়ে সম্ভব হয়েছে। একটা মধ্যম আকারের আপেল আমাদের এই গোটা পৃথিবীর তুলনায় যতটা ক্ষুদ্র, একটা 'এটম' বা অণু একটা আপেলের তুলনায় ততটা ক্ষুদ্র। এক একটা পরমাণু এক একটা সৌরজগৎ যেন। সৌরজগতের কেন্দ্রে যেমন সূর্য, তেমনি পরমাণু কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস। সূর্যের চারদিকে যেমনি গ্রহগুলি ঘুরছে, নিউক্লিয়াসের চারদিকে তেমনি প্রবলবেগে আবর্তিত হচ্ছে ইলেকট্রন। নিউক্লিয়াসে রয়েছে প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি

www.pathagar.com

মৌলিক কণা। প্রোটন ও ইলেকট্রনে বিদ্যুতের পরিমাণ সমান, কিন্তু বিপরীতধর্মী। সেন্টিমিটারের পাঁচ হাজারতম অংশ পরিধিবিশিষ্ট একটি বিদ্যুৎকণা তার নিজ কেন্দ্রের চতুর্দিকে এক সেকেন্ডে শত কোটিবার আবর্তিত হচ্ছে। এর কল্পনা করা বা সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ধারণা করতে চেষ্টা করাও নেহায়েত নিষ্ফল ব্যাপার। বিশেষত অভ্যন্তরীণ-অন্তর্নিহিত জগতের সর্বশেষ সীমা যে এই, তাও আমাদের অজানা। অন্তর্নিহিত এসব জগতের অভ্যন্তরে এর চাইতেও ক্ষুদ্রতর জগতের অবস্থিতি যে অসম্ভব একথা তো জোর করে বলা যায় না।

আমাদের পর্যবেক্ষণ শক্তি যে অত্যন্ত দুর্বল, তা এ থেকেই প্রমাণিত। এখানে প্রশ্ন উঠে, ইলেকট্রন ও প্রোটনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু—যেগুলো পরস্পর মিলিত হয়ে একটা কেন্দ্র গড়ে তোলে, তা কিভাবে বজায় থাকে? এই প্রোটন ও নিউট্রন কেন্দ্রের বাইরে বের হয়ে পড়ে না কেন? এ দু'টোকে কোন্ জিনিস যুক্ত করে রাখে? বিজ্ঞানীদের ধারণা, এ দুটো বস্তু–অণুর মাঝে এক প্রকারের শক্তি নিহিত রয়েছে। এই শক্তিই কেন্দ্রের বিদ্যুৎ ও অ-বিদ্যুৎ অণুসমূহকে পরস্পর কঠিন বন্ধনে বেঁধে রাখে। এর নাম দেয়া হয়েছে Binding Energy 'কেন্দ্র–বন্ধনী শক্তি'। তার অর্থ, বস্তু তার সর্বশেষ বিশ্লেষণে 'শক্তি'। এ শক্তি কি দর্শনযোগ্য? কোনরূপ শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারাও এ শক্তিকে দর্শন করা সম্ভব নয়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, 'মহাসত্য' এমন এক সত্তা যা দর্শন করা সম্ভব নয়, মানব–চক্ষু তা কখনই দেখতে পারে না। তা হলে যা চর্মচক্ষে দেখা যায় না, তা কি মেনে নেয়ার অযোগ্য? –যদি তা–ই হয়, তাহলে এ বিশ্বলোকের বাস্তবতাকেও অস্বীকার করতে হবে। তাই নয় কি?

এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্র রাসূল যা বলেন, যে–সব মহাসত্যের সত্যতা মেনে নেয়ার জন্যে আমাদের তিনি আহ্বান জানান, তা মানবার জন্যে যদি আমরা এই শর্ত আরোপ করি যে, নিজেদের হাতে স্পর্শ করতে এবং চক্ষে দেখতে পারলেই আমরা তা মানতে পারি, তাহলে তা কি যুক্তিসঙ্গত কথা হবে? ইতিহাসের কোন ছাত্র যদি শিক্ষককে বলে, ইস্ট–ইন্ডিয়া কোম্পানীকে আমার সামনে উপস্থিত করা হলে ও বাস্তবে দেখিয়ে দিলে তবেই আমি তার অস্তিত্ব মানব, নতুবা অতীতে কোন এক সময় বিদেশী বণিকরা এখানকার শাসন ক্ষমতা দখল করে নিয়েছিল তা আমি কিছুতেই মানব না, তখন সে শিক্ষকের যে দশা ঘটে, এ–ও কি সেই একই ব্যাপার নয়?

জবাবের তাৎপর্য

আল্লাহ্র রাসূলের এ আহ্বান সত্য কি অসত্য, তা আমাদের মেনে নেয়া উচিত কি উচিত নয়, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিভাবে সম্ভব হতে পারে? কোন্ ভিত্তিতে এর সত্যাসত্য ও গ্রহণ উচিত–অনুচিতের ফয়সালা করা সঙ্গত? আমাদের

www.pathagar.com

বিবেচনায় আল্লাহ্র রাসূলের এই আহ্বানের তিনটি মৌলিক বিশেষত্ব রয়েছে, যেগুলো তাঁহার আহ্বানকে গ্রহণ করার অনুকূলে। বিশেষত্বগুলো হলোঃ

১. আল্লাহ্র রাসূল এই বিশ্বলোকের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাতেই রয়েছে আমাদের সব সমস্যা ও জটিলতার সঠিক সমাধান। আমাদের ভিতরে ও বাইরে যত প্রশ্নই জাগে, তা-ই হচ্ছে সে সবের সঠিক জবাব।

২. জীবনের পরিণতি সম্পর্কে তাঁর যে দাবি, তার একটা অকাট্য দলীলও তাঁর কাছে রয়েছে। পরবর্তী জীবনে যে পরিণতি অনিবার্য তার একটা নমুনা এখানেই আমাদের দেখানো হচ্ছে, আমাদের এই জীবনে।

৩. আল্লাহ্র রাসূল যে কিতাবকে আল্লাহ্র কিতাব বা কালাম বলে দুনিয়ার সামনে উপস্থাপিত করেছেন, তাতে এতসব অসাধারণ ও অলৌকিক বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য সন্নিবেশিত যে, তা বিবেচনা করলে এটা যে বাস্তবিকই একটা লোকাতীত মহাশক্তির কালাম, তাতে কোন সন্দেহ থাকে না। কোন মানুষ এ ধরনের কালাম রচনা করতে পারে না।

এবার আমরা এ তিনটি বিশেষত্বের মানদন্ডে রাসূলের আহ্বানের যথার্থতা যাচাই করে দেখতে চাই।

প্রথম বিশেষত্ব

রাসূলের এ আহ্বানে প্রথম ও প্রধান বিশেষত্ব হলো এই যে, তাঁর ডাক পুরোপুরি মানবীয় মনস্তত্ত্বের অনুরূপ ও তার সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন অর্থাৎ যে প্রকৃতির উপর মানুষের সৃষ্টি, এই বাখ্যার স্বরূপ এবং প্রকৃতিও ঠিক তাই। এ ব্যাখ্যার ভিত্তি এক আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাসের উপর সংস্থাপিত, আর এক আল্লাহ্র বিশ্বাস ও তাঁর চেতনা মানব-প্রকৃতিরঅন্তর্ভূক্ত—মানুষের প্রকৃতির সাথে একাকার হয়ে মিলে মিশে রয়েছে। তার দুটি লক্ষণ অত্যন্ত দৃঢ়। একটি এই যে, মানব-ইতিহাসের সমস্ত জানা সময় কালে (Known historical period) অধিকাংশ মানুষই (বলতে গেলে সবাই) আল্লাহ্র অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্ সংক্রান্ত চেতনা থেকে বঞ্চিত রয়েছে কালের এমন কোন অধ্যায় অতিক্রান্ত হয়নি। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানব-ইতিহাসের সর্বসম্মত সাক্ষ্য এই যে, আল্লাহ্র চেতনা মানব প্রকৃতির অত্যন্ত তীব্র ও দৃঢ়তর চেতনা। দ্বিতীয়ত যখনি মানুষের জীবনে কোন নাযুক ও বিপদ সংকুল মুহূর্ত আসে, তখন তার দিল স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আল্লাহ্কে ডেকে উঠে। যেখানে কোন আশ্রয় থাকে না, সেখানে মানুষ একান্তভাবে আল্লাহ্র আশ্রয় সন্ধান করে। আল্লাহ্তে বিশ্বাস যে মানুষের প্রকৃতিগত ব্যাপার, এটা তার আর একটি অকাট্য নিদর্শন। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, আল্লাহ্ বিশ্বাসী, আধুনিকতাবাদী অথবা যে কোন প্রাচীন

www.pathagar.com

পন্থী হোক না কেন মানুষ এ ধরনের কোন নাযুক পরিস্থিতিতে পড়লে যখন সাধারণ মানবীয় শক্তি ও উপায় ব্যর্থ হয়ে যায়, তখন সে এমন এক শক্তিকে আকুলভাবে ডাকে, ডাকতে বাধ্য হয়, যিনি সকল শক্তিমানের অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী, যিনি সকল শক্তির আধার। স্ট্যালিনের ন্যায় একজন আদর্শগত দিক দিয়ে আল্লাহ্–অবিশ্বাসী ব্যক্তির জীবনেও এর স্পষ্ট নিদর্শন মেলে। মিঃ চার্চিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন অবস্থা সম্পর্কে তাঁর লিখিত গ্রন্থে (৪র্থ খন্ড, ৪৩৩ পৃঃ) একথা উল্লেখ করেছেন। ১৯৪২ সনের শঙ্কাকুল অবস্থায় হিটলার যখন গোটা ইউরোপের জন্য বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, মিঃ চার্চিল তখন মস্কো গমন করলেন। তিনি মিত্রবাহিনীর সামরিক কার্যক্রম সম্পর্কে তাঁর যুদ্ধ পরিকল্পনা মিঃ স্ট্যালিনকে শোনালেন। পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ শুনে যখন স্ট্যালিনের কৌতূহল ও ঔৎসুক্য বেড়ে গেল, তখন তাঁর কণ্ঠে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হলো, 'আল্লাহ্ এই পরিকল্পনাটি সফল করে তুলুন' (The Mind Al-Quran Build's—By Dr. Sayed Abdul Latif—P-94)। আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রমাণের জন্যে এর চাইতে বড় দলীল বোধ হয় আর কিছু না দিলেও চলে।

নবীর বক্তব্যের আর একটি বিশেষত্ব হলো এই যে, মানুষের মনে স্বভাবত যেসব মৌলিক প্রশ্ন জাগে, মানুষ যেসব বিষয়ে জানতে চায় সেসব কিছুর জবাব ও সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ রাসূলের এ বক্তব্যে রয়েছে। বিশ্বলোক পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়নে যে সব জিজ্ঞাসা মানব হৃদয়ে প্রকট হয়ে উঠে, তার যথার্থ উত্তর রাসূলের কথায় ভাস্বর হয়ে রয়েছে। বিশ্বলোক পর্যবেক্ষণে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এই বিশাল জগৎ কোন পূর্ব–পরিকল্পনা ও পদ্ধতি ছাড়াই আকস্মিকভাবে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। বিশ্বলোকের সৃষ্টিকর্তা একজন অবশ্যই রয়েছেন, রাসূলের বক্তব্যে এই সিদ্ধান্তের পূর্ণ প্রতিফলন রয়েছে। নিরপেক্ষ বিশ্ব–অধ্যয়ন যা বলে, রাসূলের উপরোদ্ধৃত ভাষণও তাই বলে। আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, বিশ্বলোক নিছক একটা যান্ত্রিক ব্যবস্থা (Mechanical system) নয়। তার পশ্চাতে একটি অনন্যসাধারণ লোকাতীত 'মন' অবশ্যই সদা সক্রিয় রয়েছে, যা বিশ্বলোককে প্রতিনিয়ত চালিয়ে নিচ্ছে। রাসূলের বক্তব্যেও ঠিক এই কথাই উচ্চঃস্বরে ঘোষণা করা হয়েছে। আমাদের প্রতি অপরিসীম অনুগ্রহদানকারী কে, কঠিন বিপদকালে মানুষ আশ্রয় পায় কার কাছে—এ ছিল আমাদের মনের স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা। রাসূলের বিশ্ব–বিশ্লেষণে এর জবাব মেলে। বিশাল দীর্ঘায়ু–সম্পন্ন বিশ্বলোকে মানুষের জীবন এত স্বল্পায়ু কেন? আমরা তো চাই জীবন হবে অনন্ত, দীর্ঘস্থায়ী। আমাদের প্রয়োজন এমন এক বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্র, যেখানে আমাদের আশা–আকাঙ্খা, হৃদয়াবেগ ও কামনা বাসনা পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হবে। রাসূলে করীমের বক্তব্যে ও বিশ্ব–বিশ্লেষণে তার জবাব রয়েছে। তাছাড়া সত্যের সত্যতা ও বাতিলের বাতুলতা সুস্পষ্ট হওয়া এবং ভালো ও মন্দের

www.pathagar.com

আলাদা আলাদা সত্তায় প্রতিভাত হওয়াও মানবীয় অবস্থার ঐকান্তিক দাবি। প্রত্যেকটি জিনিসকে তার যথোপযুক্ত স্থান ও মর্যাদা দেয়া তাকীদও মানব মনের স্বভাবধর্ম। রাসূলুল্লাহ্ (স)–এর বক্তব্যে তাই বলা হয়েছে। নির্দেশ করা হয়েছে তার জন্যে চূড়ান্ত সময়। এককথায়, মানব জীবনের যাবতীয় প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ জবাব তাতে রয়েছে। সে জবাব এতই উত্তম, এতই সুস্পষ্ট ও অকাট্য যে, তার চাইতে পূর্ণাঙ্গ জবাব আর কিছুই হতে পারে বলে মানুষ কল্পনা পর্যন্ত করতে পারে না। বিশ্বলোক অধ্যয়নে যে সমস্ত প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা মানব মনে প্রবল ও প্রকট হয়ে উঠে, তার সব কিছুরই সুষ্ঠু সমাধান সেখানে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় বিশেষত্ব

রাসূলের দাওয়াতের দ্বিতীয় উজ্জ্বল বিশেষত্ব এই যে, জীবনের পরিণতি সম্পর্কে তাতে যে মত পেশ করা হয়েছে, তার একটা বাস্তাব নিদর্শন আমরা দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যক্ষ করি। সে দাওয়াতে বলা হয়েছে, এমনিভাবে জালিম ও মজলুম নিয়ে দুনিয়া নিঃশেষ হয়ে যাবে না। পরিণতিতে শেষদিনে বিশ্বলোকের মহাপ্রভু আত্মপ্রকাশ করবেন এবং সত্য ও মিথ্যা, পূণ্যবান ও পাপীকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দাঁড় করিয়ে দেবেন। সে দিনটির আগমনে বিলম্ব শুধু ততটুকু সময়, যতটুকু লাগবে এ বিশ্বের অস্তিত্বের জন্যে নির্দিষ্ট করা সময়কাল অতিবাহিত ও নিঃশেষিত হতে তার বেশী এক মুহূর্তও নয়।

এই কথাটি বলে দিয়েই তিনি দায়িত্ব সেরে দেন নি। সেই সঙ্গে এও তাঁর দাবি যে, 'আমি যা বলি তার অকাট্য প্রমাণও রয়েছে। আর তা হলো সেদিন যে আদালত বা বিচারালয় দাঁড় করা হবে, বিশ্বমালিক তার একটা বাস্তব নমুনা (model) আমার দ্বারা এ দুনিয়াতেই দেখিয়ে দেবেন। আমার দ্বারাই তিনি এখানে মহাসত্যকে বিজয়ী করবেন এবং বাতিল ও মিথ্যাকে করবেন পরাজিত, পর্যুদস্ত। তাঁর অনুগতদের তিনি সম্মান দেবেন, আর না–ফরমানদের অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করবেন। এ এক সুনির্দিষ্ট ঘটনা এবং তা অবশ্য এখানেই সংঘটিত হবে। দুনিয়ার যত লোক ইচ্ছা তাঁর বিরোধিতা বা সব শক্তিই নিয়োগ করুক না কেন, তাঁকে নির্মূল করার সাধ্য কারো নেই। পরকাল হওয়া যেমন সুনিশ্চিত, কেউ তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, অনুরূপভাবে আমার জীবনে সেই দিনটির নমুনা দেখানোও অনিবার্য, অপ্রতিরোধ্য। সেটাই হবে সেই অনিবার্য দিনটির নিদর্শন। তা অকাট্যভাবে প্রমাণ করবে যে, বিশ্বলোক সুবিচার ও ন্যায়–পরায়ণতার (justice) উপর প্রতিষ্ঠিত। আর আমি এমন এক সত্তার প্রতিনিধি, যাঁর শক্তি সর্বোপরি, যাঁর উপর কেউ নেই—থাকতেপারে না। এই শক্তিই একদিন নিজের সমক্ষে দাঁড় করিয়ে সব মানুষের চূড়ান্ত ফয়সালা করবেন।

www.pathagar.com

আসলে নবীর এই কথাটি তাঁর একটা চ্যালেঞ্জবাণী। এ চ্যালেঞ্জ তিনি বিশ্ব মানবের সমক্ষে দিয়েছে, যখন তিনি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ একা। তাঁর দেশ—তাঁর জন্মভূমিই তাঁকে স্থান দিতে প্রস্তুত নয়; তাঁর নিকটতম আত্মীয়–স্বজনও তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেছে, সমর্থন প্রত্যাহার করেছে। বৈষয়িক উপায়–উপকরণ, শক্তি–সামর্থ্য কিছুই তাঁর করায়ত্ত নয়ঃ এই ধরনের এক ব্যক্তি দৃঢ় প্রত্যয় ও বলিষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন; 'আমি বিজয়ী হবই এবং আমকে কেন্দ্র করে এ দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র আদালত প্রতিষ্ঠিত হবেই'। তাঁর কথা শুনে লোকেরা তাঁকে ঠাট্টা ও বিদ্রুপ করেছে; কিন্তু তিনি পুরোপুরি ধৈর্য সহকারে নিজের কাজ করে গেছেন। এই সময় দেশের অধিকাংশ লোক মিলে তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত করে। দেশ ত্যাগ করে চলে যেতে তাঁকে বাধ্য করা হয়। তাঁকে নির্মুল ও সর্বস্বান্ত করে দেয়ার জন্য তারা প্রাণপণ চেষ্টা চালায়। কিন্তু তাঁর জীবন–সংকল্প ও আদর্শ–নিষ্ঠার দৃঢ় প্রাচীরগাত্রে এ সব আঘাত–প্রতিঘাত খেয়ে চুরমার হয়ে যায়। তাদের সব অপচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে যায়। এতদ্‌সত্ত্বেও অল্পসংখ্যক লোক তাঁকে বলিষ্ঠ সমর্থন জানায়, তাঁর আহ্বানের প্রতি পূর্ণ ঈমান ও আস্থা এনে তা পুরোপুরি গ্রহণ করে এবং তাঁর পেছনে অবিচল হয়ে দাঁড়ায়। ফলে একদিকে থাকে অতি স্বল্প ও নগণ্য সংখ্যক লোক, আর অপরদিকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা। একদিকে ধন–ঐশ্বর্য ও সাজ–সরঞ্জামের প্রাচুর্য এবং বিপুলতা অন্যদিকে সহায় সম্বলহীনা। একদিকে দেশের অধিবাসী জনতা ও প্রতিবেশীদের সাহায্য ও সমর্থন, অন্যদিকে, আপনজন ও বাইরের লোকদের সম্মিলিত শত্রুতা। এ যে কি নাযুক পরিস্থিতি, তা সহজেই অনুমেয়, এরূপ অবস্থায় তাঁর সঙ্গী–সাথীরা স্বাভাবিকভাবেই ঘাবড়ে যান। রাসূলের নিকট তাঁরা বারবার জানতে চান, "প্রতিকূল অবস্থার এ আঁধার রাত্রির অবসান হবে কবে? আর কতকাল এ ভীতি–সন্ত্রস্ত অবস্থায় দিন কাটাতে হবে আমাদের? কবে আমাদের সুদিন আসবে। তাঁদের এসব প্রশ্নের জবাবে বারবার তিনি বলেন, "ঘাবড়ে যেও না সঙ্গী–সাথীরা! আল্লাহ্‌র চূড়ান্ত ফয়সালা অবশ্যই আসবে। দুনিয়ার কোন শক্তিই সেইদিনের আগমন রোধ করতে পারে না"।

রাসূলের দেয়া এ চ্যালেঞ্জ পনের–বিশ বছরের মধ্যেই পূর্ণ মাত্রায় বাস্তবায়িত হয়। এরই অল্প সময়ের মধ্যেই মানবেতিহাসে এক বিস্ময়কর ঘটনা সংঘটিত হয়। এক নিঃস্ব, নিসঙ্গ ব্যক্তি এককভাবে যেসব দাবি নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন, ঠিক সে ভাবেই সেসব দাবি বাস্তবতা লাভ করে। বিরুদ্ধবাদীরা সে দাবির একবিন্দু ক্ষতি বৃদ্ধি করতে সমস হয় না। হক্ ও বাতিল পৃথক পৃথকভাবে ও স্বরূপে প্রতিভাত হয়ে উঠে। কোন্‌টি হক্ কোন্‌টি বাতিল, তা লোকদের নিকট স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানদার ও তাঁর অনুগত লোকেরা বিজয়, সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হয়। আর আল্লাহ্‌র না–ফরমান লোকেরা পরাজিত, পর্যুদস্ত হয়ে তাঁদের পদানত হতে বাধ্য হয়।

www.pathagar.com

বস্তুত নবীর আহ্বান বিশ্বমানবকে শুরুতেই যে পরিণতির আগাম সংবাদ দিয়েছিল, তার একটা বাস্তব রূপায়ণ দুনিয়ার বুকেই ঘটে গেল। কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য এটা শিক্ষার একটা পূর্ণাঙ্গ নিদর্শন ও আদর্শ (ideal) হয়ে দাঁড়াল। কিয়ামতের দিন এ নিদর্শনের পূর্ণত্ব সাধিত হবে। তখন শুরু থেকে শেষদিন পর্যন্ত সমস্ত মানুষের আল্লাহ্‌র আদালতে উপস্থিত হতে হবে এবং সেখানেই তাদের সম্পর্কে চূড়ান্ত ফয়সালা গ্রহণ করা হবে।

তৃতীয় বিশেষত্ব—কুরআন মজীদ

রাসূলের আহ্বান সত্যতা প্রমাণকারী তৃতীয় বস্তু হচ্ছে 'কুরআন মজীদ'। কুরআন মজীদ আল্লাহ্‌র কালাম। আল্লাহ্‌র কালাম রূপেই তনি তা দুনিয়ার মানুষের সামনে উপস্থিত করেছেন। এ কালাম দুনিয়ায় এসেছে চৌদ্দশ' বছর আগে। কিন্তু এই দীর্ঘকালেও তার সত্যতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁর বলা একটা কথা—একটা অক্ষরও মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি। দুনিয়ার কোন মানুষের রচিত গ্রন্থ কি এতটা নির্ভেজাল, শাশ্বত ও চিরভাস্বর হতে পারে?

অন্য কথায় কুরআন মজীদ স্বতঃই প্রমাণ করে যে, তা আল্লাহ্‌র কালাম। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ-ই এ ধরনের কালাম রচনা করতে পারে না। এই কুরআনের অসংখ্য দিক বিবেচনাযোগ্য। এখানে আমরা তার মাত্র তিনটি দিক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করব।

এক. কুরআনের অসাধারণ বর্ণনাভঙ্গী

দুই. তার বর্ণনাসমূহের অসঙ্গতি ও স্ববিরোধিতা মুক্ত হওয়া (Free From inconsistency)।

তিন. তার চিরন্তন রূপ।

কুরআনের বৈশিষ্ট্য

এক. কুরআন মজীদ এক অনন্যসাধারণ কালাম। তা যখন পড়া হয় স্বতঃই অনুভূত হয়, তা আল্লাহ্‌র কালাম ছাড়া কিছু হতে পারে না। কালাম-রচয়িতা এক সুউচ্চ পরিমন্ডলে থেকে কথা বলছেন, যেখানে কোন মানুষই পৌছতে পারে না। তার বর্ণনাভঙ্গীর স্বতঃস্ফূর্ততা, তার উদ্দাম গতিস্রোত,তার কথা বলার বিচিত্র ধরন—সাফ সাফ ও চূড়ান্ত কথা বলে দেয়ার ভঙ্গী বিস্ময়করভাবে মানুষের কথা থেকে ভিন্ন। তা থেকে সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায় যে, তা অবশ্যই বিশ্ব-মালিকের কথা। এতে আল্লাহ্ তাঁর-ই সৃষ্ট মানুষকে সম্বোধন করেছেন এভাবে যে, মানুষ তাঁর বান্দা এবং তিনি সব

www.pathagar.com

মানুষের মাবুদ। বান্দাদের প্রতি মা'বুদের সম্বোধন যে রকম হতে পারে, এ কালামে ঠিক তাই রয়েছে।

কুরআনে বিশ্ব–লোকের নিগুঢ় তত্ত্ব ও সত্য (reality) সম্পর্কে বক্তব্য দেয়া হয়েছে। এতে মানুষের পরিণাম ও পরিনতি এবং তার জীবন সংক্রান্ত সব প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য অবস্থা সম্পর্কে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। এইসব কথাই এমন অকাট্য ও চূড়ান্ত ভঙ্গীতে পেশ করা হয়েছে যে, মনে হয় বাস্তবে সেই সব কিছু হুবহু ঘটে যাচ্ছে। ঘটনাবলী তার বর্ণনাভঙ্গীর মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও প্রকট হয়ে উঠেছে। কুরআন পড়ার সময় স্পষ্ট মনে হয়, মানুষকে প্রকৃত সত্য শুধু জানিয়ে দেয়া হচ্ছে না,বরং চোখের সামনে সাকার করে তোলা হচ্ছে। পাঠক ঘটনাবলীকে যেন কিতাবের পৃষ্ঠায় পড়ছে না, রূপালী পর্দায় তা নিজ চক্ষে অবলোকন করছে। কথার এই দৃঢ়তা স্পষ্ট বলে দেয়, তা এমন এক মহান সত্তার কালাম, যিনি প্রকৃত সত্যকে তার আসল রূপেই দেখছেন না, বরং তিনি নিজেই তা ঘটাচ্ছেন। প্রকৃত সত্যকে নিজ চক্ষে প্রত্যক্ষ না করতে পারলে কেউ–ই নিজের কথাকে এতটা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারে না। এখানে শুধু নমুনা হিসাবে একটা ছোট সূরা উদ্ধৃত করে তার শুধু তরজমা পেশ করছিঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ - وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ - وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ - وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ - عَلِمَتْ
نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ - يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ - الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ
فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ - كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ - وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ - كِرَامًا
كَاتِبِينَ - يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ - إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ - وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ - يَصْلَوْنَهَا
يَوْمَ الدِّينِ - وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ - وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ - ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا
يَوْمُ الدِّينِ - يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا - وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ -

দয়াময় অনুগ্রহশীল আল্লাহ্‌র নামে—

যখন আকাশমন্ডল ফেটে চৌচির হবে, যখন তারকাসমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে ঝরে পড়বে, যখন সমুদ্রসমূহ দীর্ণ–বিদীর্ণ করা হবে, আর যখন কবরসমূহ খুলে দেয়া হবে, তখন প্রত্যেকেই তার আগে ও পরের সব কৃতকর্ম জানতে পারবে।

হে মানুষ, কোন্‌ জিনিস তোমাকে তোমার সেই মহান আল্লাহ্‌র ব্যাপারে ধোঁকায় নিমজ্জিত করেছে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে সুস্থ সঠিক বানিয়েছেন, তোমাকে সুষমতা দান করেছেন এবং যে প্রতিকৃতিতে চেয়েছেন তোমাকে সংযোজিত করেছেন। কখ্‌খনও নয়, রবং (আসল কথা হলো) তোমরা

www.pathagar.com

(পরকালের) শাস্তি ও পুরস্কারকে মিথ্যা মনে করছ। অথচ তোমাদের উপর পরিদর্শক (সর্বতোভাবে দর্শক, পর্যবেক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক) নিযুক্ত রয়েছে এমন সর্বসম্মানিত লেখক, যারা তোমাদের প্রতিটি কাজই জানে।

নিঃসন্দেহে সত্যপন্থী লোকেরা সুখ-শান্তিতে থাকবে এবং নিশ্চয়ই পাপপন্থীরা জাহান্নামে যাবে। বিচারের দিনই তারা তাতে প্রবেশ এবং তা থেকে কখ্খনই পালাতে পারবে না। আর তুমি কি জান সেই বিচারের দিনটি কি? আবার (জিজ্ঞাসা করি,) তুমি কি জান সেই বিচারের দিনটি কি? তা সেই দিন, যখন কারো জন্য কিছু করার সাধ্য আর কারোরই থাকবে না। সেদিন ফয়সালার চূড়ান্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারভুক্ত থাকবে। –আল-ইনফিতার

মূল কালাম পেশ করার পর তার অনুবাদ লেখা হলো। মনে রাখা আবশ্যক, মূল কালাম আল্লাহ্‌র। আর তরজমা অক্ষম মানুষের। মূল কালামের বর্ণনা-বলিষ্ঠতা অনুবাদে কখনই বিমূর্ত হয়ে উঠতে পারে না। মূল কালামের আসল বক্তব্য সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট করে বিবেচনা করা যেতে পারে, কত দৃঢ় প্রত্যয়, নিশ্চয়তা ও বলিষ্ঠতা প্রকাশ পেয়েছে তাতে। এই কালামে জীবনের সূচনা ও চরম পর্যায় সম্পর্কে সব কথাই বলে দেয়া হয়েছে। জীবন ও বিশ্বলোক সম্পর্কিত বিষয়ে লিখিত কোন গ্রন্থেই এতটা বলিষ্ঠতা ও দৃঢ় প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতে পারে না। শত শত বছর ধরে মানুষ বিশ্বলোকের নিগূঢ় তত্ত্ব ও সত্য সম্পর্কে গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনা করছে। বড় বড় দার্শনিক ও বিজ্ঞানী এর উপর কত কিছু লিখেছে কিন্তু এরূপ দৃঢ় প্রত্যয় আত্মবিশ্বাস নিয়ে কিছু বলা বা লেখা কি কারো পক্ষ সম্ভবপর হয়েছে? এ যুগ বিজ্ঞানের চরম উন্নতির যুগ। বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে গেছে বলে দাবি করা হচ্ছে। তা সত্ত্বেও বিজ্ঞান একথা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে যে, বিজ্ঞান এখনো চূড়ান্ত ও নির্ভুল সত্য উদঘাটনে সক্ষম হতে পারেনি—তা এখনো অনেক, অনেক দূরেই রয়ে গেছে। অথচ কুরআন প্রতিটি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সব জ্ঞান, তত্ত্ব ও তথ্য চূড়ান্তভাবে আয়ত্ত করেই কথা বলছে। আর যিনি বলছেন, তাঁর সামনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত—বাইরে থেকে অন্তর্নিহিত সুদূরবর্তী সত্য পর্যন্ত সবকিছু সূর্যালোকের মতই ভাস্বর, সমুজ্জ্বল। এর বাইরে আর কোন সত্য নেই, আর কারো কোন বক্তব্যও থাকতে পারে না। কেউ কিছু বললে তা হবে চরম বিভ্রান্তি।

দুই. কুরআন মজীদ যে আল্লাহ্‌র কালাম, এর দ্বিতীয় প্রমাণ হলো, সৃষ্টি ও জ্ঞান—তথা অধিবিদ্যা সংক্রান্ত যাবতীয় নিগূঢ় তত্ত্ব (Metaphysics) থেকে শুরু করে সামাজিক ও তামুদ্দুনিক বিষয়সহ সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে অকাট্য উক্তি কুরআন মজীদে উদ্ধৃত হয়েছে। সেসব কথায় কোথাও একবিন্দু বৈপরীত্য (Inconsistency) খুঁজে পাওয়া যায় না। এ কালাম দুনিয়ায় নাযিল হওয়ার পর

www.pathagar.com

দেড় হাজার বছর গত হয়েছে। এ সময়ে মানুষ অনেক তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করেছে, অনেক নতুন কথা জানতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু কুরআনের উক্তির মধ্যে আজ পর্যন্ত কোন বৈপরীত্য বা অসমঞ্জস্যতা প্রকাশ পায়নি। অথচ দুনিয়ায় এ পর্যন্ত এমন কোন দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটেনি, যাঁর কথায় কোনরূপ পারস্পরিক বৈপরীত্য পাওয়া যায় না এবং যা সর্বপ্রকার মতবৈষম্য থেকে মুক্ত ও পবিত্র। এ সময়ের মধ্যে বহু দার্শনিক বিবেক–বুদ্ধি ও জ্ঞান–প্রতিভাবলে জীবন ও বিশ্বলোকের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দিতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু খুব বেশী সময় না যেতেই তাদের মতামতে বৈপরীত্য, অসঙ্গতি ও সামঞ্জস্যহীনতা প্রকট হয়ে পড়েছে। কালস্রোত তাদের সেসব মতামত প্রত্যাখ্যান করে বিস্মৃতির অতলতলে ডুবিয়ে দিয়েছে।

কোন কথা, উক্তি বা মতামত মতাদর্শের পারস্পরিক বৈপরীত্য মুক্ত হওয়া অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, তা প্রকৃত নিগূঢ় সত্যেরই প্রতিধ্বনি; তারই সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রকৃত নিগূঢ় সত্য সম্পর্কে যার কোন জ্ঞান নেই কিংবা যার রয়েছে নিতান্ত আংশিক বা স্থূল জ্ঞান, সে যখনি এ সম্পর্কে কিছু বলবে তা অনিবার্যভাবে পারস্পরিক বৈপরীত্যের শিকার হবে। সে একটি দিকের ব্যাখ্যাদান করতে গিয়ে অন্যদিকগুলোর প্রতি সুবিচার করতে পারবে না—সামঞ্জস্য রক্ষা করে কথা বলতে সক্ষম হবে না। একটি দিককে উন্মুক্ত করতে গিয়ে সে অন্য দিকটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবে। জীবন ও বিশ্বলোকের ব্যাখ্যাদান একটা বিরাট ও ব্যাপক ব্যাপার। এ বিষয়ে কিছু বলার জন্যে নিগূঢ় সত্য সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক জ্ঞান অপরিহার্য। মানুষ যেহেতু সীমাবদ্ধ যোগ্যতা, প্রতিভা ও জ্ঞান–শক্তির অধিকারী, সেহেতু সব নিগূঢ় সত্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান একসঙ্গে লাভ করা তার সাধ্যের অতীত। তাই প্রকৃত নিগূঢ় সত্যের সবদিক সম্পর্কে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ জ্ঞান–লাভ করা এবং তার ভিত্তিতে কোন মতাদর্শ রচনা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। ঠিক এ কারণেই মানব–রচিত দার্শনিক মতাদর্শে পারস্পরিক বৈপরীত্য, অসঙ্গতি ও স্ব–বিরোধিতা অনিবার্য। কেবলমাত্র কুরআন মজীদ এবং জীবন ও বিশ্বলোক সংক্রান্ত তার যাবতীয় উক্তি ও ঘোষণা এ দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। আর তাই অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, কুরআন প্রকৃত নিগূঢ় সত্যের সঠিক ও নির্ভুল ব্যাখ্যা। তার বিপরীত যা কিছু, তা সবই ভুল,অসত্য ও প্রকৃত ব্যাপার বিরোধী কথা। দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটিকে আরও স্পষ্ট করে তুলতে চেষ্টা করা যাকঃ

(ক) জীবন সম্পর্কে রচিত গ্রন্থের একটা অধ্যায়ে জীবনে দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ অবশ্যম্ভাবী। সে কর্তব্য ও দায়িত্ব নির্ধারণে বিভিন্ন দিক ও অবস্থার মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। একটা দিক সম্পর্কে যদি এমন কোন সিদ্ধান্ত দেয়া হয় যা অপর একটি দিকের বিপরীত তাহলে বুঝতে হবে, তাতে ভারসাম্য রক্ষিত হয়নি। জীবনের দায়িত্ব নির্ধারণে এরূপ ভারসাম্যহীনতা শুধু

www.pathagar.com

অবাঞ্ছিতই নয়, মারাত্মকও। যেমন, নারী ও পুরুষের মর্যাদা, অধিকার ও কর্মসীমা নির্ধারণ সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। আজকের অত্যাধুনিক যুগের সিদ্ধান্ত হলো, নারী ও পুরুষের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় সাম্য ও সমতা রক্ষা করতে হবে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে কাজ করার সমান অধিকার নারী-পুরুষ উভয়েরই থাকতে হবে। কিন্তু এ সামাজিক সিদ্ধান্তটি মানব প্রকৃতির তথা জীববিজ্ঞানের (Biology) এক মহাসত্যের পরিপন্থী। কারণ, জীববিজ্ঞানের বিচারে নারী-পুরুষে আদপেই কোন সমতা বা সাম্য নেই। উভয়ে সমানভাবে জীবনের বোঝা বহনের যোগ্য নয়—কার্যত তা করছে না, করতে হয়ও না। পক্ষান্তরে কুরআনের সিদ্ধান্ত জীববিজ্ঞানের এই চূড়ান্ত সত্যের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। কুরআন সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে নারী ও পুরুষের জন্যে আলাদা করে যে দায়িত্ব, কর্তব্য ও মর্যাদা নির্ধারণ করে দিয়েছে তাই স্বাভাবিক। উভয়ের দৈহিক গঠন, আকার-আকৃতির বিচারেও এটা সঙ্গতিপূর্ণ। কুরআনের বিধান ও বাস্তব ব্যাপারের মধ্যে কোন বৈপরীত্য, আত্মবিরোধ ও অসঙ্গতি দেখানো সম্ভব নয়। এসব ত্রুটি শুধু মানবীয় চিন্তা ও মতাদর্শেরই বিশেষত্ব।

(খ) মার্ক্স তাঁর বিপ্লবের দর্শনে বলেছেন যে, একটা বিশ্বব্যাপক সাধারণ আকর্ষণ-বিধান অনুসারে তারা সমূহ যেমনি গতিশীল, অনুরূপ অনিবার্য বিধান ও সামাজিক ক্ষেত্রে তেমনি পরিবর্তন ঘটায়। এ বিধান অব্যাহত ও নিরন্তরভাবে কার্যরত, আর তার ফলে মানব জীবনেও বিপ্লব ও পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে থাকে। কিন্তু এ দর্শন প্রচার করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেই 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' বলে হাঁক দিলেন। এ দুটো কথা একসঙ্গে ও একই সময় যে সঠিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তা অনস্বীকার্য। সামাজিক বিপ্লব, বিবর্তন যদি সত্যিই ঐতিহাসিক কার্যকারণের অনিবার্য পরিণতি হয়েই থাকে তাহলে সেজন্যে রাজনৈতিক চেষ্টা, সাধনা ও সংগ্রামের প্রয়োজন হবে কেন? আর রাজনৈতিক চেষ্টা সাধনার ফলেই যদি বিপ্লব আনতে হয়, তাহলে ঐতিহাসিক কার্যকারণের অনিবার্য দর্শন নিতান্ত অমূলক, তার কোনই অর্থ নেই।

কুরআনের ঘোষণা এর বিপরীত। কুরআন মানুষের চেষ্টা-সাধনাকে শুধু সমর্থনই করেনি, তার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্বও আরোপ করেছে। এজন্যে কোন ঐতিহাসিক অনিবার্যতার প্রশ্ন অবান্তর। কুরআনের দর্শন হলো, জীবনে যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়, তা মানুষের নিজস্ব চেষ্টা-সাধনা ও সংগ্রামের ফলেই সম্ভব। বস্তুজগতের ন্যায় মানবীয় জগতে ঘটনাবলীর অনিবার্য কার্যকারিতার কোন স্থান নেই। মানবীয় চেষ্টা-সাধনা ঘটনাবলীর রূপায়ণ করে। মানুষ যেরূপ চায়, সেরূপ ঘটনাই সাধারণত সংঘটিত হয়। মানুষ ঘটায় বলেই তা ঘটে। বিশ্বপ্রকৃতিরও যে একটা বিধান রয়েছে এখানে তা অস্বীকার করা হচ্ছে না। প্রকৃতির ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিধানই প্রধান সংঘটক। কিন্তু সে বিধানের ধর্ম হলো, মানবীয় চেষ্টা-সাধনার সাথে আনুকূল্য রক্ষা

www.pathagar.com

করে সে চেষ্টা–প্রচেষ্টাকে পরিণতি পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়া। মানবীয় চেষ্টা–সাধনা সে বিধানের বহিঃপ্রকাশ বা ফসল নয়। এজন্যেই কুরআনের মূল কর্মদর্শন ও তার আহ্বানে কোন বৈপরীত্য দেখা দেয়নি। কুরআন মানুষকে আহ্বান জানায় তার আদর্শ বাস্তাবায়নের উদ্দেশ্যে সাধনা ও সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করতে। এতে করে কুরআন তার উপস্থাপিত কর্মদর্শনেরই সত্যতা ও যথার্থতা ঘোষণা করেছে, তার প্রতিবাদ করেনি বা বিপরীত মতও উপস্থাপন করেনি। পক্ষান্তরে মার্ক্সীয় দর্শন তার বাস্তব কর্মসূচীর সাথে বিবাদমান। বস্তুত কমিউনিস্ট দলগুলোর অস্তিত্বই মার্ক্সীয় দর্শনের সোচ্চার প্রতিবাদ মাত্র। কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোর শেষ বাক্য তার প্রথম বাক্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কুরআন প্রদত্ত আদর্শাবলীর সাথে মানব রচিত দার্শনিক মতাদর্শের তুলনামূলক আলোচনা করলে এ ধরনের স্ববিরোধিতার প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে এবং কুরআন যে বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র কালাম এবং এ সব ত্রুটি থেকে মুক্ত তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হবে।

(গ) কুরআনের তৃতীয় বিশেষত্ব এই যে, তা প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে এ দুনিয়ায় রয়েছে। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কত বিপ্লব সংঘটিত হলো, ইতিহাসের ধারায় কত ওলট–পালটের ব্যাপার ঘটে গেল; কালস্রোতে কতইনা আবর্তন–বিবর্তন দেখা দিল, কিন্তু এ সত্ত্বেও কুরআনের একটি কথাও ভুল বা মিথ্যা প্রমাণিত হলো না। কালস্রোতের প্রতিটি পর্যায়েই তা সমসাময়িক বিবেক–বুদ্ধিগত সম্ভাবনা ও সামাজিক, তামুদ্দুনিক প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে ক্রমাগতভাবে তার যোগ্যতা ও উপযোগিতার বাস্তব পরিচয় দিয়ে এসেছে। তার উপস্থাপিত শিক্ষার ব্যাপকতা কোন একটি স্থানে বা ক্ষেত্রেই কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন বা ব্যাহত হয়নি। বরং তা প্রতিটি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিত্য নব সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধান দিতে সক্ষম হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ে মানব সমাজে এমন কোন সমস্যা দেখা দেয়নি, যার সুষ্ঠু সমাধান পেশ করতে কুরআন মজীদ অক্ষম প্রমাণিত হয়েছে, এটা বস্তুত এই মহান গ্রন্থের একটা বিরাট বিশেষত্ব। এরূপ বিশেষত্ব কোন মানব–রচিত গ্রন্থ আজ পর্যন্ত লাভ করতে পারেনি—সম্ভবও নয়। মানব মস্তিষ্কপ্রসূত প্রতিটি দর্শনই কিছু দিন পর মিথ্যা, অসত্য ও অচল বা সেকেলে (Old Primitive) প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু শতাব্দী কেটে গেল, কুরআন মজীদের সত্যতা ও উপযোগিতার একবিন্দু ব্যতিক্রম দেখা দেয়নি।

একথা সত্য যে, কুরআনের বিধান অবতীর্ণ হয়েছিল তখন, যখন আরবের অসভ্য, বর্বর ও উচ্ছৃঙ্খল গোত্রসমূহ সমন্বয়ে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সে বিধান মানব–রচিত বিধানের ন্যায় তাৎক্ষণিক কাজ সম্পন্ন করে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। ফুরিয়ে যায়নি তার শাশ্বত মূল্যমান। তারপর কালের যে কোন স্তরে সংঘটিতব্য ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণে কুরআন মজীদ তার অফুরন্ত সামর্থ্য দেখিয়ে এসেছে। আর আজকের চরম উন্নত যুগেও কুরআন শুধু

www.pathagar.com

বর্তমানের প্রয়োজন পূরণেই সামর্থ নয়, বরং অনন্তকাল পর্যন্ত তার এ দক্ষতা অক্ষুণ্ন, অমলিন ও অব্যাহত হয়ে থাকবে। প্রকৃতপক্ষে এটা হচ্ছে এমন একটা পূর্ণাঙ্গ বিধান, যা জীবনের যাবতীয় সমস্যার সঠিক সুষ্ঠু ও সম্যক সমাধান দিতে সক্ষম। এ বিধান আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে যেমনি তার শ্রেষ্ঠত্ব ও সক্ষমতা প্রমাণ করেছে, আজকের যাবতীয় দার্শনিক মতাদর্শের মুকাবিলায়ও তার শ্রেষ্ঠত্ব তেমনি অনস্বীকার্য। মাত্র দেড় হাজার বছর কেন—দেড় লক্ষ বছর পরও তা তেমনি শাশ্বত প্রমাণিত হবে।

কুরআনের মু'জিযা

আসলে এ হলো কুরআনের মু'জিযা। এই মু'জিযাই অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, তা কোন কালের, কোন মানুষের কল্পনাপ্রসূত নয়, তা একমাত্র আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধান। জীবন সম্পর্কে কুরআন প্রথম দিন যেসব মতাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছিল, ব্যক্তি ও সমাজ পর্যায়ে কর্মের যে ধারা, পদ্ধতি বা ব্লু-প্রিন্ট উপস্থাপিত করেছিল, বর্তমান সময়ে তা যেমনি পুরাতন, অকেজো ও সেকেলে প্রমাণিত হয়নি, তেমনি তাতে এক বিন্দু ক্রটি জরা বা জড়তাও দেখা দেয়নি। এ সময়ের মধ্যে কত দর্শন প্রকাশিত ও প্রচারিত হলো, আর দৃষ্টির আড়ালে সরে গেল। কত ব্যবস্থা গড়ে উঠল, আর চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু কুরআনের মতাদর্শের সত্যতা, যথার্থতা এবং তার বাস্তব কর্মব্যবস্থার কল্যাণকামিতা আজও চির অম্লান, ভাস্বর হয়ে রয়েছে। আজও তা সমানভাবে সর্বজনমান্য। আলো, বাতাস পানির মতই তা কালের বন্ধনের উর্ধ্বে। কাল বিবর্তনের কোন প্রভাবই তার উপর প্রতিফলিত হতে পারে না। কেননা এ দুয়েরই স্রষ্টা এক শাশ্বত সত্তা।

এই উভয় দিক সম্পর্কে এখানে একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করলে মূল বক্তব্য অনেকটা প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

শুরুতেই কুরআন দাবি করেছিল, বিশ্বলোকেরও উদ্ভাবক একটি 'মন', যা নিজ ইচ্ছায় এর উদ্ভাবন ও সৃষ্টি করেছে এবং তাকে চালিয়ে নিচ্ছে। কুরআন যে সময়ে এ দাবি পেশ করেছিল, ইউরোপে তখনো সিনেমার যুগ শুরু হয়নি। তারপর অসংখ্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁরা বলিষ্ঠ কণ্ঠে দাবি তুলেছেন, বিশ্বলোক নিছক একটা 'জড় যন্ত্র' মাত্র। তা স্বয়ংক্রিয়, সচল, নিজ শক্তি ও ব্যবস্থার তাকীদে চলমান। প্রায় দু'শ বছর পর্যন্ত মানুষের মন ও মগজের উপর এ মতাদর্শের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন এ ধারণা জন্মেছিল, মানবীয় জ্ঞান হয়ত বুঝি কুরআনের দাবিকে মিথ্যা প্রমাণ করে ফেলেছে। কিন্তু কিছুকাল না যেতেই বিশ্বলোকের গভীর সূক্ষ্ম অধ্যয়ন বিজ্ঞানীদের নিকট আর এক দিগন্ত উদ্‌ঘাটিত করল। বিজ্ঞানীরা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন—জীবন ও বিশ্বলোকের ব্যাখ্যা একমাত্র বস্তু ও

www.pathagar.com

জড় বিধানের ভিত্তিতে দেয়া সম্ভবপর নয়। বিজ্ঞান এক্ষণে কুরআনে ঘোষিত মতাদর্শের দিকে প্রত্যাবর্তন করছে। স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে, বিশ্বলোকের মূলে একটি 'মন' (Mind) বর্তমান, যা স্ব-ইচ্ছায় একে চালাচ্ছে। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার জেমস্ এই পরিবর্তনটির ব্যাখ্যা করে লিখেছেন ঃ

জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্রোত বিগত কয়েক বছরের মধ্যে অত্যন্ত দ্রুত একটা নতুন মোড় নিয়েছে। ত্রিশ বছর পূর্বে আমাদের ধারণা ছিল কিংবা আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে, আমরা এমন এক চূড়ান্ত সত্যের পানে অগ্রসর হচ্ছি, যা স্বরূপে যান্ত্রিক। স্পষ্ট মনে হচ্ছিল, বিশ্বলোক অণু-পরমাণুর এক অসংবদ্ধ, অবিন্যস্ত স্তূপের সমন্বয়, যা নিতান্ত আকস্মিকভাবেই একত্রিত হয়ে পড়েছে। আর যে সবের কাজ হলো উদ্দেশ্যহীন ও অন্ধ শক্তিগুলোর অধীন (যা সম্পূর্ণ চেতনাহীন) কিছু কালের জন্যে একটা তাৎপর্যহীন নৃত্য শেষ হয়ে যাওয়ার পর নিছক একটা মৃত বিশ্বলোক পড়ে থাকবে। এই নিতান্ত যান্ত্রিকতার জগতে অন্ধ শক্তিগুলোর কার্যতৎপরতাকালে জীবন নেহায়েত একটা দুর্ঘটনার ফলেই সঞ্চারিত হয়েছে। বিশ্বলোকের একটা খুবই ক্ষুদ্র কোণ কিংবা এ ধরনের কয়েকটি দিক কিছু সময়ের জন্যে ঘটনাবশতই চেতনাসম্পন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু আধুনিক জ্ঞান-তথ্যের আলোকে প্রাকৃতিক জগতসীমা পর্যন্ত বিজ্ঞানের এ কথার উপর প্রায় ঐকমত্যের সৃষ্টি হয়েছে যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্রোতধারা আমাদেরকে এক অ-যান্ত্রিক মহাসত্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

আরও পরে তিনি লিখেছেনঃ

আধুনিক জ্ঞান-তথ্য আমাদেরকে অতীত মত ও ধারণা সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করছে, যা আমরা খুব তাড়াহুড়ো করে রচনা করে নিয়েছিলাম অর্থাৎ আমরা আকস্মিকভাবে এমন এক বিশ্বলোকে এসে গেছি যার নিজের জীবনের সাথে কোন সম্পর্ক নেই অথবা যা নিয়মিতভাবে জীবনের সাথে শত্রুতা পোষণ করে।———

এক্ষণে আমরা জানতে পেরেছি যে, বিশ্বলোক এমন এক সৃষ্টিকর্তা ও ব্যবস্থাপক-নিয়ন্ত্রক শক্তির (Designing or controlling power) অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ পেশ করেছে, যা আমাদের ব্যক্তিগত মনের সাথে অনেকটা মিলে মিশে যায়।—— Modern Scientific Thought, p.104

তাহলে একথা স্বীকৃতব্য যে, মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান বার বার হোঁচট খেয়েও এই বিংশ শতকে ঠিক সেখানেই এসে পৌছেছে, যেখানে দাঁড়িয়ে কুরআন বিশ্ব-মানবকে আহ্বান জানিয়েছিলেন দেড় হাজার বছর পূর্বে, নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক—তথা এক বর্বর (?) যুগে।

www.pathagar.com

এখন দ্বিতীয় দিকের একটা দৃষ্টান্ত পেশ করা যাক। ইসলাম সামাজিক, পারিবারিক জীবনের জন্য যে বিধান রচনা করেছে, তাতে একজন পুরুষকে একসঙ্গে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে। ইসলামের পর যখন পাশ্চাত্য সভ্যতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, তখন তা এ বিধানের বিদ্রূপ করেছে একে জাহিলী যুগের বর্বরতা বলে। পাশ্চাত্য সভ্যতার দৃষ্টিতে এ ব্যবস্থা দ্বারা নারী সমাজের প্রতি নাকি ভয়ানক অবিচার করা হয়েছে। আর এরূপ অবস্থার ভিত্তিতে কখনও কোন উন্নতমানের সভ্য সমাজ, সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে না বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে। খৃষ্টবাদে একাধিক বিবাহের যদিও বা কিছুটা অবকাশ ছিল; পাশ্চাত্য সভ্যতা এ ব্যবস্থাকে কলমের এক খোঁচায় সভ্যতাবহির্ভূত ব্যবস্থা বলে উড়িয়ে দিল এবং একজন পুরুষের পক্ষে তার এক স্ত্রী বর্তমান থাকা অবস্থায় অন্য স্ত্রী গ্রহণকে অত্যন্ত লজ্জাকর ও অবাঞ্ছিত কাজ বলে অভিহিত করল। এ প্রচারণা এতটা জোরেসোরে চালানো হলো যে, সমাজের একজন পুরুষ একসঙ্গে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বা কোন নারী কোন পুরুষের দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় বা চতুর্থ স্ত্রী হওয়ার দুঃসাহস দেখাতে রাযী হলো না।

কিন্তু বাস্তব অবস্থা বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধজনিত অবস্থা অকাট্যভবে প্রমাণ করে দিল যে, একাধিক বিবাহ জীবনের একটি বাস্তব প্রয়োজন। কোন কোন ব্যক্তির—আর অনেক সময় গোটা সমাজের পক্ষে এটা অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয় যে, দু'টি কাজের মধ্যে যে কোন একটি তাকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। হয় ব্যভিচার ও যৌন উচ্ছৃঙ্খলতাকে মেনে নিতে হবে, নতুবা একসঙ্গে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের নিয়ন্ত্রিত ও শর্তভিত্তিক অনুমতি দিতে হবে। যদি প্রথমটি গ্রহণ করা হয়, তাহলে গোটা সমাজকে যে চরম ও মারাত্মক বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়া হবে, তাতে একবিন্দু সন্দেহ থাকতে পারে না। আর দ্বিতীয়টি গ্রহণ করা হলে সমস্যারও সমাধান হয়ে যায়, স্বাভাবিক অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণ হয় এবং কোনরূপ নৈতিক, পারিবারিক ও সামাজিক বিপর্যয়ও দেখা দেয় না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে বিশেষ করে ইউরোপে যে পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল, তাতে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সবকয়টি দেশেই নারীদের সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পেয়ে যায়। বিবাহযোগ্য বিপুলসংখক পুরুষ যুদ্ধে নিহত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই স্বামীহারা ও বিবাহযোগ্যা নারীর সংখ্যা এত বেড়ে গেল যে, তাদের যৌন প্রয়োজন পূরণ একটা কঠিন সমস্যা হয়ে দেখা দিল। যে যুদ্ধ শেষ হয়েছে প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে;কিন্তু এতদিনেও এ সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়নি। ১৯৫৫ সানের পরিসংখ্যান অনুযায়ী একজন পুরুষের তুলনায় আটজন স্ত্রীলোক স্বামীহীনা ছিল। এ যুদ্ধের মাশুল জার্মানীকে সবচাইতে বেশী দিতে হয়েছে। যেখানে স্বামীহীনা ও পুরুষ সন্ধানী কত যে যুবতী নারী ছিল, তার হিসাব করাও সম্ভব হয়নি। বিবাহযোগ্য মেয়েদের জন্য সেখানে স্বামী সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে দেখা দিল। পরিণামে সেখানে অভিভাবকহীন ও অবৈধ সন্তানের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়ে গেল। যারা এতিম হয়ে

www.pathagar.com

গিয়েছিল তারা হলো সম্পূর্ণ আশ্রয়হীন। যে সব নারী স্বামী বঞ্চিতা হয়ে গিয়েছিল, তারা তাদের স্বাভাবিক যৌন প্রয়োজন মেটানোর জন্য অবৈধ পন্থা গ্রহণে বাধ্য হলো ও অবাধে তাই করতে শুরু করে দিল।

কিন্তু সমাজ জীবনের পক্ষে এটা যে কত বড় অভিশাপ তা বুঝতে কষ্ট হয় না। তবু পশ্চাত্য মানসিকতা নিজেদের ভুল স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়নি । কোন মুসলিম দেশের জনৈক প্রধানমন্ত্রীর এক স্ত্রী বর্তমান থাকতে দ্বিতীয় স্ত্রী গহণের সংবাদ শুনে জনৈক ইউরোপীয় প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী বলেছিলেন, ''মেয়েটিকে যদি তার এতই পছন্দ ছিল, তাহলে বিয়ে করার কি প্রয়োজন ছিল, মেয়েটিকে এমনি রেখে (kept) দিল না কেন? জবাবে বলা হলো, ''তা কি করে হতে পারে? আমাদের সমাজে বিয়ে ছাড়া একটা মেয়েকে রাখা যায় না।'' তিনি বললেন ,''সে তো মান্দাতার আমলের নিয়ম। এ যুগে এভাবে কোন মেয়েকে রাখা এবং তাকে ভোগ করা কিছুমাত্র অন্যায় নয়। অন্যদের কথা আর কি বলব, আমার নিজের ঘরেই তাই চলছে''। এ দৃষ্টান্তটা কল্পনা প্রসূত নয়, একেবারে বাস্তব ঘটনা। বস্তুতঃ ইউরোপীয় সমাজে এখনো তাই চলছে। তবে মনে হচ্ছে, সেদিন বেশী দূরে নয়, যখন অবস্থা তাদের ভুল স্বীকার করতে বাধ্য করবে। তখন তারা বুঝতে পারবে, নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তারা যে নীতি অনুসরণ করে চলছে, তার ফলে গোটা সমাজই মারাত্মক ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। আর তার পরিণামে তারা নিমজ্জিত হচ্ছে পংকিলতা ও নানাবিধ যৌন অপরাধের অতল সাগরে। এর দরুন কত জটিল ধরনের অপরাধ নিত্য সংঘটিত হচ্ছে, তার কোন ইয়ত্তা নাই। এখানেই ইসলামের সাথে মানবীয় দর্শনের ভিত্তিতে রচিত সমাজ ব্যবস্থার পার্থক্য এবং এ পার্থক্য মৌলিক। মানব রচিত দর্শন ও আদর্শের সাথে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধানের এই বিরোধ চিরন্তন ও শাশ্বত। আর এখানেই কুরআনের বিশেষত্ব সুপ্রকট।

বস্তুত কুরআন এ জটিল মানবিক সমস্যাটির অতীব সুন্দর ও সুষ্ঠু সমাধান দিয়েছে। মানুষকে রক্ষা করেছে বহু বিরাট ক্ষতি ও অবক্ষয় থেকে।

এ ছিল কুরআনের মতাদর্শ ও তার বিধি-বিধান সংক্রান্ত দুটি দৃষ্টান্ত। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, মানব রচিত মতাদর্শ ও আইন-বিধান নিত্যনতুন তৈরী হতে থাকে আর কিছুদিন না যেতেই তা বাতিল হয়ে যায়—সমাজ তা বাতিল করে দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু কুরআন মজীদ প্রথম দিন যা কিছু বলেছে, তা শুধু বর্তমানে নয় বরং অনন্তকাল পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে; পরিবর্তনের কোন প্রয়োজনই হবে না। কুরআন দেড় হাজার বছর পূর্বে যতটা সত্য এবং সকল মানুষের জন্যে কল্যাণকর ছিল, আজও তাই রয়েছে—থাকবেও। কুরআনের এ বিশেষত্ব প্রমাণ করে যে, এটা এমন এক 'মন' থেকে নিঃসৃত যার নিকট অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এবং নিকট ও দূর, ভিতর ও

www.pathagar.com

বাইরের সব সত্য ও তথ্য সম্যকভাবে সমুদঘাটিত ও সমুজ্জ্বল। কুরআনের এই শাশ্বত বিশেষত্বই প্রমাণ করে, কুরআন আল্লাহ্র কালাম; আল্লাহ্র কালাম ছাড়া এরূপ শাশ্বত আর কারও কালাম হতে পারে না। এটাও প্রমাণ করে যে, কুরআনই বিশ্বমানবতার জন্যে একমাত্র কল্যাণকর বিধান। কুরআন ছাড়া আর যা কিছু তার বিপরীত, সেগুলো শাশ্বতও নয়, মানুষের জন্য কিছুমাত্র কল্যাণকরও নয়।

এ হলো একটা সত্যনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ এবং সর্বপ্রকার প্রভাবমুক্ত ও আবিলতাশুন্য মনের বিশ্বলোক অধ্যয়নের ফসল। এ অধ্যয়ন বস্তুতই মানুষকে প্রকৃত সত্যের মুখোমুখী দাঁড় করে দিয়েছে। মহাসত্যের বদ্ধ দুয়ার তার সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এ আলোচনার শুরুতে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল, 'আমরা কি, কি এই বিশাল বিশ্বলোক?' এর জবাব বহু লোক নিজেদের মন থেকে বহু রকম দিতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিচার–বিশ্লেষণে দেখা গেছে, সে সব জবাব প্রকৃত সত্যের সঠিক বিশ্লেষণ দিতে পারেনি। এ সময়েই বিশ্বনবীর আহ্বান আমাদের শ্রুতিগোচর হলো। আমরা তারও চুল–চেরা বিচার–বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করে দেখলাম। বিশ্বলোকের পরিমন্ডলে রেখেও আমরা তার যথার্থতা পরখ করলাম, ইতিহাসের পটভূমিতে তার গুরুত্ব পরীক্ষা করা হলো। প্রকৃতির গভীরে অবতরণ করেও তাকে চিনতে চেষ্টা করেছি। আমরা দেখলাম, বিশ্বলোক, ইতিহাস, ও মনস্তত্ত্ব এসবই সম্মিলিতভাবে তার সত্যতা স্বীকার করছে। আমাদের সব জ্ঞান, সংগৃহীত তত্ত্ব ও তথ্য এবং আমাদের সুস্থ সর্বোত্তম অনুভূতি তার সমর্থন করেছে পূর্নমাত্রায়। যে মহাসত্যের সন্ধানে আমরা উদগ্রীব ছিলাম, সেই সত্যই তার আসল রূপ ও সত্তা নিয়ে আমাদের সামনে প্রতিভাত। আমরা সত্যের সন্ধান পেয়েছি। সত্যের সন্ধান পাইনি, এ কৈফিয়তের কোন সুযোগ আর থাকতে পারে না। এ সত্যকে আমরা গ্রহণ করব, কি বর্জন করব, তাই এখন একমাত্র বিচার্য।

আল্লাহ্ আমাদের এ মহাসত্য পুরোপুরি গ্রহণ করার তওফিক দিন—আমীন।।

www.pathagar.com

দর্শন, বিজ্ঞান ঃ ধর্ম

বিগত কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস এক কথায় ধর্মের বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহ ঘোষণার ইতিহাস। প্রাচীনকাল থেকে মানব জীবনে ধর্মের বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব ছিল। চিন্তা ও কর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধর্মই মানব জীবনের পথপ্রদর্শকের দায়িত্ব পালন করেছে—একথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য। কিন্তু শিল্প-বিপ্লব ও বিজ্ঞানের অভাবিতপূর্ব অগ্রগতির পর মানুষ যখন সামাজিক ও তামাদ্দুনিক দিক দিয়ে এক নতুন অধ্যায়ে উত্তরণ করেছে, তখন মানুষ অতীতের সব কিছু থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নেয়ার জন্যে দৃঢ় সংকল্প হয়। অত:পর তারা ধর্মের চিরাচরিত পথ পরিহার করে নিজেদের গড়া নতুন পথে অগ্রসর হতে শুরু করে। গাড়ী বদলের সঙ্গে সঙ্গে দিক পরিবর্তন করার প্রয়োজনও তারা অনুভব করে। কিন্তু বিগত শতাধিক বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা মানুষের এ সিদ্ধান্তের ভুল দেখিয়ে দিয়েছে। বস্তুত মানব জীবনের সমস্যাবলীর সমাধানের উদ্দেশ্যে এভাবে যত চেষ্টা-প্রচেষ্টাই চালানো হয়েছে, তার প্রত্যেকটি চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমান কালে মানুষ এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন, যেখান থেকে সেই পুরাতন অবস্থায় ফিরে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় আছে বলে মনে হয় না। আর আজ একথা জোর করে বলা যেতে পারে যে, মানবতার এই কাফেলা তার নির্ভুল লক্ষ্য পানে চলার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। যে ধর্ম অতীতে মানুষের জীবন-বিধান ছিল, ভবিষ্যতের মানবতার জন্যে সেই ধর্মই হবে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান।

আইনের ব্যর্থতা

অতীতে সমাজ জীবনে ধর্মের প্রভাব সর্বাত্মক। বলতে গেলে ধর্মই ছিল জীবন। জীবন বলতে ধর্ম জীবনই বোঝাত, ধর্মহীন বা ধর্মশূন্য জীবন ছিল অসম্ভব, কল্পনার অতীত। শুধু ব্যক্তি জীবনেই নয়, সামাজিক বা সমষ্টিগত জীবনের রূপও ছিল তাই। যুগ-যুগান্তর ধরে মহান ব্যক্তিদের প্রচার ও শিক্ষাদানের ফলে মানুষের মনে এক বিশেষ ধরনের ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, তার বিপরীত কিছু করা তো দূরের কথা, চিন্তা করাও মহাপাপ বিবেচিত হতো। ধর্ম পরিত্যাগ করার পর এই শক্ত বাঁধন যখন আর থাকল না, তখন সংস্কারমূলক আইন বিধান সেই শূন্যস্থান দখল করে বসল। অন্য কথায়, আল্লাহ্‌র আনুগত্যের পরিবর্তে আইনের শাসন স্থাপিত হতে চাইল। আইন একটা সুনির্দিষ্ট বিধি বিশেষ। সামাজিক দিক দিয়ে বাধ্যতামূলক মনে করা হয়।

www.pathagar.com

তার বিরুদ্ধাচরণ হলে মানুষ হয় দন্ডনীয় । এই সময় সব দেশেই ব্যাপকভাবে এই ধরনের আইন রচিত হয়। বলতে গেলে জীবনের সব ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ হতে জারি করা হলো নানা ধরনের প্রশাসনিক আইন। নাগরিকদের জন্যে কোন্‌টি সঠিক আচরণ আর কোন্‌টি নয়, কোন্‌টি ভাল ও ন্যায় আর কোন্‌টি নয়, তা সরকারই বলে দিতে শুরু করলেন। কিন্তু এসব আইনের শুধু একটি ফায়দাই পাওয়া গেল। তাহল এই যে, যেসব অন্যায় ও পাপ পূর্বে সোজাসুজি সংঘটিত হতো, তা এক্ষণে বাঁকা পথে, ভিন্ন নামে হতে লাগল। আইন পাপ ও অন্যায়ের বাহ্যিক রূপ বদলে দিল বটে, কিন্তু আসল পাপ ও অন্যায়কে বন্ধ করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো।

সরকার দেখতে পান, ব্যবসায়ীরা ভেজাল মিশানোর কাজ, মওজুদদারী ও চোরাচালানী করছে এবং নানাভাবে জনগণকে কষ্ট দিচ্ছে। এসব বন্ধ করার জন্যে সরকার আইন জারি করেন। আর সে আইনকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রায় ক্ষেত্রে দেখা যায়, ব্যবসায়ীরা বহাল তবিয়তে নিজেদের কায়-কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। তার কারণ তারা যথেষ্ট পরিমান ঘুষ দিয়েই যে রক্ষা পেয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতেও কায়-কারবার চালাবার নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা লাভ করেছে তা বোঝতে কষ্ট হয় না। বেশ্যাবৃত্তির অপরিসীম সামাজিক ও নৈতিক অনাচার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে আইন করে দেয়া হয়। কিন্তু পর মুহূর্তেই আরও ব্যাপকভাবে এই কারবার চলতে দেখা যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে। মোট কথা, সব দেশের সরকারের কাজই হলো আইন পাস করা, অর্ডিন্যান্স জারি করা । আর সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রয়োজন হওয়া মাত্রই তা করা হয়। কিন্তু ফায়দা তার তেমন কিছুই দেখা যায় না। হয় শুধু এতটুকু যে, পথিক তার পথ বদলে দেয়, চলার ধরন পরিবর্তন করে। বিশেষ কোন জিনিসের আমদানী-রফতানী বন্ধ করা হলে তা চোরা-পথে আসা যাওয়া শুরু করে। জনস্বার্থে কোন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেঁধে দেয়া হলে তা খোলা বাজার থেকে উধাও হয়ে যায় এবং কালোবাজারের গোপন পথে পূর্বের তুলনায় অনেক চড়া দামে কেনা-বেচা হতে থাকে অনায়াসে। নতুন কোন ট্যাক্স ধার্য করা হলে কিংবা ট্যাক্সের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হলে অমনি জাল হিসাব রাখা শুরু হয়ে যায়। কোন জিনিসের স্বল্পতা কিংবা অভাবহেতু তার উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করলেই সে জিনিসের কালোবাজারী ও জাল পারমিট ইস্যু করা শুরু হয়ে যায়। কোন ব্যবস্থাপনা বা শিল্প জাতীয়করণ করা হলে কর্মচারীরা এতই লুটপাট শুরু করে দেয় যে, তাতে সরকারকে মুনাফা লাভের পরিবর্তে বিপুল পরিমাণের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। এমনিভাবে সমাজে বহু দুর্নীতি, অনাচার আইনের নাকের ডগা দিয়ে বেকসুর পার পেয়ে যায়। এক কথায়, সমগ্র সমাজব্যাপী আইন ও বাস্তবতার মধ্যে প্রচন্ড লুকোচুরি খেলা চলতে থাকে। আর এই খেলায় চরম ব্যর্থতা যে আইনের ভাগ্যলিপি হয়ে দাড়ায়, তা বলার প্রয়োজন করে না। আইনের শাসনের এই নিদারুণ

www.pathagar.com

ও মর্মান্তিক পরিণতির কথা কেউ অস্বীকার করতে পারেন কি? — কিন্তু কেন এমন হয়?

বস্তুবাদী দর্শন

উত্তম সমাজ গঠন প্রসঙ্গে মানুষের সামনে দ্বিতীয় জিনিস ছিল বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছল জীবন যাত্রা। এর মূলে যে দর্শন নিহিত, তা হলো মানুষের আয়-উপার্জন যখন বৃদ্ধি পাবে, তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যখন তারা সহজেই পেতে পারবে, তখন তাদের পক্ষে দুর্নীতিতে লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজন থাকবে না। মানুষ আপনা আপনি সদাচারী ও নীতিপরায়ণ হয়ে যাবে। মানুষ তো আর শুধু শুধু অন্যকে কষ্ট দিতে পারে না। এ দর্শনের সুখানুভূতি অনস্বীকার্য। কিন্তু বাস্তব ঘটনাবলী এ দর্শনের যথার্থতার পরিপন্থী। দুনিয়ার প্রায় সব দেশেই বৈষয়িক উন্নতি ও সমৃদ্ধির গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আন্তর্জাতিক অপরাধ বিভাগীয় পুলিশ কমিশনের (International criminal police commission) রিপোর্টের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ৩৪টি দেশের পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে এ রিপোর্টে প্রমাণ করা হয়েছে যে, দরিদ্র দেশসমূহে অপরাধের হার সচ্ছল ও উন্নতমানের জীবন যাত্রার অধিকারী উন্নত দেশসমূহের অপরাধের তুলনায় অনেক কম। 'দরিদ্র্য মানুষকে অপরাধ প্রবণ বানায়'—এ কথাটি এই রিপোর্টে ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৪৬ সালে গ্রেট বৃটেনে আঠার বছরের এক যুবক সপ্তাহে মাত্র দুই পাউন্ড সাড়ে সাত শিলিং আয় করতে পারত। কিন্তু বর্তমানে একজন যুবক আয় করে প্রতি সপ্তাহে ছয় পাউন্ড। অপেক্ষাকৃত বেশী কর্মঠ যুবক আট-দশ পাউন্ডও আয় করে। তারা যখন বড় হবে তখন তারা সপ্তাহে গড়ে তের-চৌদ্দ পাউণ্ড জাতীয় আয়ের অংশীদার হতে পারবে, এ বিষয়ে তাদের মনে সংশয় নেই। আমাদের এতদাঞ্চলের আয়ের তুলনায় বৃটেনের এ আয় ও মান যে অনেক বেশী, তা সুস্পষ্ট। কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৫২ সনে ভারতের এক লক্ষ্য লোকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অপরাধের সংখ্যা ছিল ১৬৫। আর গ্রেট বৃটেনে সমসংখ্যক লোকদের মধ্যে ১৩৪২টি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। আমেরিকা দুনিয়ার সেরা ধনী দেশ। সেখানে অপরাধের হার প্রতি এক লক্ষে ১৩২২টি (Leader, 18 February, 1955)। আর সেখানে প্রধান ব্যবসায়-কেন্দ্র নিউইয়র্ক শহরে তো প্রতি সেকেন্ডে মারাত্মক ধরনের অপরাধ অন্ততঃ একটা করে সংঘটিত হয়ে থাকে। অপরাধ বৃদ্ধির এই প্রবণতা উন্নত দেশগুলোতে সাধারণ নাগরিকের জীবন মারাত্মকভাবে সংকটাপন্ন করে দিয়েছে। সেখানে মানুষের জীবন অতিবাহিত হচ্ছে একটা অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে। কোন ব্যাংক জানে না কোন্ মুহূর্তে ডাকাতের একটা দল গাড়ীতে করে মেশিনগান নিয়ে তার উপর আক্রমণ করে বসবে। কোন মেয়ে অফিস থেকে সন্ধ্যাকালে বাড়ী ফেরার পথে কোন্ মুহূর্তে যে অপহৃতা

www.pathagar.com

হবে, তা সে বলতে পারে না। ইংলন্ডে হত্যাকারীকে মৃত্যুদন্ড দেয়ার আইন বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু নরহত্যা সংক্রান্ত অপরাধের মাত্রাধিক্য দেখে সেখানকার প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী ও এক সময়ের পরিষদ সদস্য স্যার ইলেন হার্বার্ট মৃত্যুদন্ড পুনর্বহাল করার দাবি জানিয়েছিলেন। আর শুধু হত্যাকারীকেই নয়, চোর, পকেটমার ও নারীর সতীত্ব হরণকারীদেরও এই দন্ড দেয়ার জন্য তিনি জোর দাবি তুলেছিলেন।

প্রেরণা ও অনুপ্রেরণার অভাব

এ পর্যন্ত আলোচনায় বস্তুগত মতবাদের মতাদর্শের ব্যর্থতা প্রমাণিত হচ্ছে। সেই সঙ্গে এ কথাও প্রকট হয়ে উঠে যে, মাত্র একটা জিনিসের অভাবই এসব কিছুকে চূড়ান্ত রূপে ব্যর্থ করে দিয়েছে। আর তা হলো মূল প্রেরণা ও প্রেরণাদাতার অনুপস্থিতি। একটা সুইচ টিপ দিয়ে একটা বিরাট কারখানা নিমিষের মধ্যে সচল করে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু মানুষের ব্যাপার তো আর সেরূপ নয়। মানুষ ঠিক তখনই সক্রিয় হয়, যখন কিছু করার ইচ্ছা ও প্রেরণা তার নিজের মধ্যে আগে থেকেই জাগরুক হয়ে থাকে। অন্যথায় কোন মানুষ দ্বারা যথার্থভাবে কোন কাজ করানো সম্ভব হয় না। উন্নততর সুখী জীবন যাপনের জন্যে বর্তমান কালের মানুষের নিকট চমৎকার কাগুজে নক্শা রয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে সেসব প্লান–পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উপকরণ। কিন্তু এই সব কিছুই সম্পূর্ণ বেকার ও অকেজো হয়ে পড়ে শুধু এ কারণে যে, মানুষ নিজেই তার দায়িত্ব পালন করতে প্রস্তুত নয়।

এটা বিজ্ঞানের ও প্রকৌশল বিদ্যার চরম উন্নতির যুগ বলে অপরাধীদের পাকড়াও করার টেকনিক বা কলা কৌশল অধিক মাত্রায় উৎকর্ষ লাভ করেছে। কেউ যদি কোন দেশে অপরাধ করার পর পার্শ্ববর্তী কিংবা অন্য কোন দেশে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে, তাহলে তার সীমান্ত অতিক্রম করে যাবার পূর্বেই 'রেডিও ফটো'র সাহায্যে তার আকৃতি–প্রতিকৃতি সারা দুনিয়ায় প্রচার করা যেতে পারে। অবশ্য সেজন্যে পুলিশ বিভাগের আন্তরিক তৎপরতা প্রথম শর্ত। কিন্তু দুনিয়ায় এ বিভাগটিতে আন্তরিকতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও তৎপরতার অভাব এতই প্রকট যে, অপরাধ রোধ করার সব সুযোগই অর্থহীন হয়ে পড়ে। অর্থনীতিবিদ ও পরিসংখ্যানবিদরা ন্যূনতম ব্যয়ে অধিক উৎপাদন ও মুনাফা লাভের পরিকল্পনা তৈরী করেন। কিন্তু আমলাদের লুটপাটকারী মনোবৃত্তির কারণে অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, অধিক ব্যয়ে কম মুনাফা অর্জিত হয়, অধিক লোকের জন্যে বরাদ্দ করা বিপুল পরিমাণ অর্থ কম লোকদের পকেটস্থ হয়। সরকার গঠনের জন্যে একালে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসন–পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। কিন্তু নেতৃবৃন্দ ও রাজনৈতিক কর্মীদের ভ্রান্ত কার্যক্রমের ফলে সে পদ্ধতি মাঠে মারা যাচ্ছে। ফলে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসন নিতান্ত হাস্যকর ও প্রহসন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৬০ সনে

www.pathagar.com

দক্ষিণ কোরিয়ার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ঘোষণা করা হলো, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডঃ সিংম্যানরি শতকরা ৯০টি ভোট লাভ করেছেন। কিন্তু ঘোষণাটি শোনার পর জনতা যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করল এবং ডঃ সিংম্যানর কে–ই প্রেসিডেন্ট ভবন ত্যাগ করে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে হলো। তখন জানা গেল—শতকরা ৯০টি ভোট হিসেবের মারপ্যাঁচ ও ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। এ যুগে প্রায় সব দেশেই সমাজ সংস্কারের জন্যে স্থায়ী ও স্বতন্ত্র বিভাগ রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে যে সব আইন রচিত হয়েছে, তাতে জনগণের আশা–আকাঙ্খা উত্তমভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু কার্যত এ কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের লুটপাট করার একটা মহাসুযোগ করে দেয়া হয়েছে যেন। বর্তমানে বিশ্ব ঐক্য ও সংহতি গঠনের বহু মূল্যবান মতাদর্শ ও দার্শনিক চিন্তাধারা গ্রন্থাবলীতে লেখা হয়েছে। পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবিতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে। নিজের ঘরে বসে টেলিফোন যোগে দুনিয়ার যে কোন স্থানের যে কোন লোকের সাথে কথা বলা যেতে পারে। উড়োজাহাজ যোগে কয়েক ঘন্টার মধ্যে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছা যেতে পারে। কিন্তু মানুষের নিজের আচরণই এমন যে, কেবল এই আচরণের কারণেই সভ্যতার এইসব মহান অবদান মিথ্যা ও একটা মহাবিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিমেষের মধ্যে দুনিয়ার জীবিত মানুষ ও বিপুল জনবসতিপূর্ণ শহরগুলোকে ভস্মস্তুপে পরিণত করার জন্যে বিজ্ঞানের সাহায্যে অসংখ্য মারণাস্ত্র তৈরী করা হচ্ছে। মনে হচ্ছে বিজ্ঞানের আবিষ্কার উদ্ভাবন যেন কেবল মাত্র মানুষ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে। এ থেকে মানুষের পক্ষে কল্যাণের কোন কাজই যেন সম্পন্ন করা যায় না। আজ জাতিতে–জাতিতে সংশয় ও সন্দেহ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। আমেরিকার স্ট্রাটেজিক এয়ার কমাণ্ড–এর প্রায় এক হাজারটি জাহাজ প্রতিনিয়ত আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে শুধু এ ভয়ে যে, শত্রুপক্ষ যে কোন মুহূর্তে তাদের উপর হামলা করতে পারে। আর রাশিয়ার সীমান্তে হাজার হাজার মানুষ আধুনিকতম যন্ত্রপাতি ও দূরবীক্ষণ নিয়ে আমেরিকার গোয়েন্দা উড়োজাহাজ খোঁজবার কাজে ব্যস্ত রয়েছে।

নিরুপায়ের উপায়

কিন্তু এই যে জাতিতে জাতিতে, মানুষে মানুষে অবিশ্বাস ও সন্দেহ, এ দূর করা যাবে কি ভাবে? এ যদি দূরীভূত করা সম্ভব না হয় তাহলে দুনিয়ায় মানুষ নিশ্চিন্তে ও পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে বসবাস করবে কেমন করে? দেশের অভ্যন্তরে আইন ও শাসনের চরম ব্যর্থতা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতিতে জাতিতে এই শত্রুতা ও প্রতিহিংসা দূর করার ব্যবস্থা না হলে মানুষের জীবন সুখের হতে পারে না। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, উদ্ভাবন, সাজ–সরঞ্জাম এবং আইন কার্যকর করার জন্যে গৃহীত কলা–কৌশল—সবই ভেস্তে গেল। এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, এ সবের

www.pathagar.com

কোন একটিও মানুষকে দুনিয়ায় সত্যিকারভাবে শান্তি দিতে পারে না। তাই গতানুগতিক আইনের বিধান কিংবা বস্তুগত সাজ–সরঞ্জাম মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্যে যথেষ্ট নয়। আজ মানুষের জন্যে বড় প্রয়োজন হচ্ছে এমন একটা মতাদর্শের—জীবন, জগত ও জাতি সম্পর্কিত এমন একটা বিশ্বাসের যা মানুষকে দায়িত্বশীল করবে। তেমন মতাদর্শ মানুষকে নিজস্ব চেতনা ও প্রেরণায় সঠিক পথে চলার ও কাজ করার জন্যে বাধ্য করবে। তখন সব রকমের দায়িত্বহীনতা কর্তব্যে অবহেলা এবং ভুল পথে চলা, ভুল কাজ করা থেকে সে নিজে বিরত থাকবে। বস্তুত মানুষের মনে এই চেতনা—এই দায়িত্ব ও কর্তব্যানুভূতি জাগাতে পারে একমাত্র ধর্ম। ধর্ম বিশ্বাসই মানুষকে ঘরে বাইরে গোপনে–প্রকাশ্যে সব অন্যায় ও পাপের পথ থেকে বিরত রাখতে সক্ষম। ধর্মবিশ্বাসই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, জাতিতে জাতিতে বিশ্বাস ও আস্থার সৃষ্টি করতে পারে। তাই ধর্মই হচ্ছে মানুষের জন্যে শ্রেষ্ঠ পথ, নিরুপায়ের উপায়, একমাত্র রক্ষাকবচ।

কয়েকশ' বছর পূর্বে জোর গলায় দাবি করা হয়েছিল, জীবন যাপনের জন্যে ধর্মের প্রয়োজন নেই। ধর্ম শুধু হালাল–হারামের কথা বলে। এটা তো বিধান–সভা কিংবা জাতীয় পরিষদ থেকেই করিয়ে নেয়া যেতে পারে। ধর্ম কেবল পরকালের শাস্তির ভয় দেখায়। তার জন্যে তো আমাদের আদালত ব্যবস্থা এবং কারাগারই যথেষ্ট। খুব বেশী প্রয়োজন হলে ফায়ারিং স্কোয়াড তো আছেই। ধর্ম বলে, 'আমাদের আদেশগুলো মেনে চললে পরকালীন জীবন সুখের হবে'। কিন্তু তার জন্যে মৃত্যুর অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজন নেই আমাদের। কেননা, আমাদের বৈষয়িক ও বস্তুগত উন্নতি ও সুখ–স্বাচ্ছন্দ্য আমাদের এই জীবনকেই 'স্বর্গ' বানাতে পারে। ধর্ম পালনের পরিণতিতে সুখ–সম্ভোগ লাভ মৃত্যুর আগে সম্ভব নয়। অথচ এই জীবনটাই তো আমাদের সবকিছু। সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এখানেই যদি না পাওয়া গেল, তা হলে তা দিয়ে আমরা কি করব! অতএব ধর্মে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই, ধর্ম আমাদের জন্যে অপরিহার্য নয়।

কিন্তু ধর্মের বিকল্প ব্যবস্থা কঠিন বাস্তবতার রুঢ় আঘাতে চূর্ণ–বিচূর্ণ হয়ে গেছে। গালভরা কথা সবই আজ নিরর্থক প্রমাণিত হয়েছে। মানুষ এখন ঠিক সে স্থানেই দাঁড়িয়ে আছে, যেখান থেকে সে তার যাত্রা শুরু করেছিল। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত মানুষ আঘাতের পর আঘাত খেয়ে, ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা কুড়িয়ে একথা মনে মনে বুঝতে পেরেছে যে, কেবল মাত্র কাগজে লেখা আইন–বিধান আর বৈষয়িক বৈজ্ঞানিক উপায় উপকরণই মানুষের জীবন–সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম নয়, পারে না মানুষের জীবন সুখী, স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও শোষণমুক্ত করতে। কালোবাজারী আর চোরাচালানী বন্ধের জন্যে কেবল আইন, জেলের শাস্তির ভয়, দেখা মাত্রই গুলী করার নির্দেশ, আর ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড় করানোর হুমকি কিছু মাত্র কাজে আসে না। মানুষের জন্যে এগুলোর প্রয়োজন নেই, তা নয়। তবে এগুলোই যথেষ্ট নয়। কেবল এগুলোই মানুষের

www.pathagar.com

জীবনে নিরাপত্তা দিতে পারে না। মানুষের জন্যে অপরিহার্য এ সবের ঊর্ধ্বের আর একটি জিনিস। তাহল, মানুষের নিজস্ব আন্তরিক চেতনা, হৃদয়বোধ, মূল্যবোধ। মানুষের ভিতরে এমন এক ইচ্ছা ও সংকল্প চিরজাগ্রত ও সক্রিয় থাকা আবশ্যক, যা বাহ্যিক সংস্কার সংশোধনীর সাথে পূর্ণমাত্রায় সহযোগিতা করবে। অন্য কথায়, মানুষের ভিতরে এমন একটা প্রেরণা থাকা অপরিহার্য, যা মানুষকে প্রতিনিয়ত নির্ভুল পথে পরিচালিত করবে, মানুষের অধিকার আদায়ের প্রতি কর্তব্য পালনে প্রতিমুহূর্ত অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করবে।

বস্তুত মানুষের ভিতরকার এই প্রেরণাই সমস্ত সংস্কার সংশোধনীর মূল কথা। এটাই প্রাণ–শক্তি। এটাই যদি না থাকে কিংবা এটাই যদি অস্বীকৃত, উপেক্ষিত হয়, তাহলে সর্বদিকের সঠিক উন্নতি, স্বাধীনতা ও স্বস্তি সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন হয়ে পড়বে। লুটপাট, শোষণ, পীড়ন, কাড়াকাড়ি এত ব্যাপক ও প্রচন্ড রূপ লাভ করবে যে, তা রোধ করার কোন উপায় থাকবে না, জীবন হবে সর্বস্বান্ত, শান্তি ও স্বস্তিশূন্য। সুন্দর–সুন্দর পরিকল্পনা কিছু দুর্নীতিবাজ মানুষের জন্যে লুটপাটের একটা নতুন ক্ষেত্র তৈরী করে দেবে মাত্র। সত্যিকার উন্নয়ন কিছু হবে না। কিন্তু এ ধরনের মানবিক আবেগ, প্রেরণা–চেতনা ও সদা জাগ্রত মূল্যবোধ সৃষ্টি করা কার পক্ষে সম্ভব? মানব–মগজপ্রসূত কোন মতাদর্শ কি এইরূপ প্রেরণা জাগাতে পারে? জাগাতে পারে কোন বৈষয়িক লোভ বা ভয়? না, কারণ এদের ব্যর্থতাই বর্তমানে মানুষের জীবনকে এক কঠিন দুর্বিপাকে নিক্ষেপ করেছে ও মারাত্মক ধ্বংসের মুখে পৌছে দিয়েছে। এজন্যে ধর্ম ছাড়া কার্যকর আর কোন পন্থা থাকতে পারে না। একমাত্র ধর্মই পারে মানুষের অন্তরে এমনি এক সদাজাগ্রত চেতনা, এক অতন্দ্র প্রহরী রূপে দাঁড় করাতে।

মানব রচিত আইন দুর্নীতি বন্ধ করতে পারে না। কোন পর্যায়ে আইনের কার্যকারিতা, ন্যায়–নিরপেক্ষ বিচার ও দুর্নীতি উচ্ছেদের অনুকূল অবস্থা লক্ষ্য করা যায় না। মানব–রচিত আইন যে কোন আদর্শ সমাজ গড়তে পারে না, তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত। কেবল মাত্র ধর্মই পারে উন্নতমানের দুর্নীতিমুক্ত আদর্শ সমাজ গঠন করতে। এ ধর্মের ভিত্তি হলো এক আল্লাহ্‌র ও রাসূলের প্রতি এবং পরকালের প্রতি অবিচল ও সুদৃঢ় প্রত্যয়ের উপর। এ বিশ্বাসই মানুষকে করে আদর্শ ব্যক্তি। আর তারাই গড়ে তোলে আদর্শ সমাজ।

লেনিন ধর্মের প্রতি বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, "আমাদের মতে আকাশ মার্গে স্বর্গ রচনার পরিবর্তে পৃথিবীর বুকে স্বর্গ রচনাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ।" কিন্তু দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, ধূলীর ধরণীতে 'স্বর্গ রচনা' তাদের পক্ষেই সম্ভব, যারা নিজেদেরকে আকাশমন্ডলে স্বর্গ রচনার যোগ্য করে তোলে। আর 'আকাশমন্ডলে স্বর্গ রচনা যাদের লক্ষ্য নয় তারা 'ঊর্ধ্বে গগন আর নিম্নে ধরণীতল' কোথাও স্বর্গ রচনা

www.pathagar.com

করতে সক্ষম হয় না তারা সর্বত্র কেবল নরকই রচনা করে—এটা ইহকালীন জীবন এবং পরকালীন জীবনে জন্যে আর উর্ধ্বগগন তথা পরকালীন জীবনের স্বর্গ রচনা কেবল মাত্র ধর্মের ভিত্তিতেই সম্ভব।

ধর্ম সম্পর্কে এই কথা ভিত্তিহীন নয়। এটা কোন মনগড়া কথা কিংবা অন্ধ বিশ্বাসের ফসল। এর পেছনে কোন গোঁড়ামির অস্তিত্ব নেই। এটা নিতান্ত ঐতিহাসিক বাস্তবতা। পরকালীণ জীবনে শুভ প্রতিফল লাভের নিশ্চিত আশায় কোটি কোটি মানুষ নিজেদের হৃদয়াবেগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার তীব্র তাকীদে ন্যায়ের পথে চলেছে এবং পরকালীন অনন্ত শাস্তি ও আযাবের ভয়ে সকল প্রকার পাপ ও অন্যায় থেকে বিরত রয়েছে, এ কথা অতীত ইতিহাস অকাট্যভাবে প্রমাণ করে। শুধু তাই নয়, সত্য ও ন্যায়ের আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে কোটি কোটি মানুষ অবলীলাক্রমে প্রাণ দিয়েছে শুধু এই প্রেরণা নিয়ে যে, এর প্রতিফল স্বরূপ তারা পরকালে আল্লাহর নিকট অশেষ সওয়াব ও উঁচু মর্যাদা পবে। কিন্তু বস্তুবাদী আদর্শে বিশ্বাসী ব্যক্তি ও সমাজ এ ধরনের কোন দৃষ্টান্ত পেশ করতে আজ পর্যন্ত পারেনি—পারা সম্ভবও নয়। দুর্নীতি আর চরিত্রহীনতার সর্বপ্লাবী পংকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত এই সমাজেও ন্যায়ের পথে অবিচল হয়ে চলতে যদি কাউকে দেখতে পাওয়া যায়, তাহলে তা যে সেই প্রাচীন ধর্মমতেরই প্রভাবের ফল, তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। কেননা বস্তুবাদ মানুষকে নিতান্ত স্বার্থপর ও দায়িত্বহীন করা ছাড়া অন্য কোন গুণে গুণান্বিত করতে পারে না।

বস্তুবাদের এই বিষাক্ত ফল সারা দুনিয়ার মানুষকে আজ এক মারাত্মক বিষে জর্জরিত করে তুলেছে। এই শতকের প্রায় সব চিন্তাশীল মানুষই সেজন্যে উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ। এ কালের ইন্টেলেকচুয়ালগণ (Intellectuals) এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, বাহ্যিক সাজ-সরঞ্জাম ও উপরি চাপ মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে না। মানবিক জগতে বস্তুবিজ্ঞান সম্পূর্ন ব্যর্থ। এখানে আসল সমস্যা মানুষের মনের পরিবর্তন সাধন, মন ও জীবনের উপর বিশ্বাসের একাধিপত্য স্থাপন। নিছক বিভীষিকা সৃষ্টিকারী আইন বা সরকারী হুমকি-ধমকি, আর জীবন মানের উন্নয়ন-প্রলোভন দ্বারা মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। বস্তুবাদের লীলাক্ষেত্র যেসব দেশ, সেখানকারও বহু জ্ঞানী ব্যক্তি আজ এই মর্মান্তিক সত্য হাড়ে হাড়ে অনুভব করছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পাশ্চাত্য দেশসমূহে বহু গন্থ প্রকাশিত হয়েছে, যাতে এ কথারই পুনরাবৃত্তি হয়েছে যে, "মানবজাতি যদি নিজের কল্যাণ চায়, তাহলে সংস্কৃতির একটি আধ্যাত্মিক ভিত্তির দিকে তাদের অবশ্য প্রত্যাবর্তন করতে হবে।" "নৈতিক মূল্যবোধের পুনরুদ্ধার এবং অধ্যাত্মবাদের দিকে প্রত্যাবর্তন মানবজাতির স্থিতি ও রক্ষার জন্যে জরুরী শর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।" আজ মানব সমাজে এমন এক নতুন আত্মিক শৃঙ্খলা স্থাপন জরুরী, যার সাহায্যে নৈতিকতা ও সংস্কৃতির

www.pathagar.com

মাঝে সেই কেন্দ্রীয় সম্পর্ক পুনর্বহাল হবে যা মানবীয় অগ্রগতির প্রতি পর্যায়ে ও প্রত্যেক যুগে বর্তমান ছিল (ক্রিস্টোফার ডাসেন)। জ্ঞানবানদের এ সব উক্তি পড়ে অনুমান করা যায় যে, আজকের মানুষ তার আসল অনুভূতি ফিরে পাচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ অনুভূতি অনুযায়ী কাজ করার জন্যে যে সব বাস্তব উপায় ও প্রক্রিয়া অবলম্বিত হচ্ছে কিংবা নির্দেশ করা হচ্ছে, তা হয় ভ্রান্ত, নতুবা অকেজো।

প্রাচীরবিহীন ছাদ

ভ্রান্ত উপায় বলতে আমরা বোঝাতে চাচ্ছি সেসব প্রস্তাব, পরিকল্পনা, যা কেবলমাত্র আবেদন-নিবেদনেই কার্যকর হবে বলে মনে করা হচ্ছে। তাদের বিশ্বাস, এ উপায়েই জনগণের মধ্যে মূল্যবোধ ও দায়িত্ব চেতনা জাগ্রত করা যাবে। এ কাজ তারাই করছে, ধর্মের প্রতি যাদের কোন বিশ্বাস নেই। অথচ তারা এমন জিনিসের প্রয়োজন অনুভব করে,যা কেবলমাত্র ধর্মবিশ্বাসের ফলেই সৃষ্ট হতে পারে, অন্য কোন উপায়ে নয়। বস্তুত নৈতিকতা বা চরিত্র বলতে যে জিনিসটি বোঝায় তা একমাত্র ধর্মবিশ্বাসেরই পরিণাম। ফল পেতে চাই—খেতেও চাই; কিন্তু সেই ফল যে গাছে ফলে সে গাছ ছাড়া সে ফল অন্য কোথাও পাওয়া যায় না, এ কথা স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত নই। এইরূপ অন্ধ গোড়ামিতে পেয়ে বসেছে একালের প্রায় সব 'ইন্টেলেকচুয়ালস্'কে। তাঁরা চান, এমন কোন উপায় উদ্ভাবন করতে যাতে করে সে গাছ ছাড়াই ফলটা পাওয়া যাবে। ধর্মের প্রাচীর না তুলেই উপর থেকে নৈতিকতার ছাদটা দাঁড় করানোর এই চেষ্টা বা ইচ্ছা যেমনি হাস্যকর তেমনি অর্থহীন। পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরুর একটি উক্তি এখানে উল্লেখ্য। ১৯৫৬ সনে মেকগ্রীল বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মাইকেল প্রীচার (Michael Preacher) এক সাক্ষাতকারে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ভাল সমাজ গড়বার জন্যে আপনার দৃষ্টিতে কি কি জিনিসের প্রয়োজন, তা সংক্ষেপে বলুন।" মিঃ নেহেরু জবাবে বলেছিলেনঃ

> আমি কিছু মূল্যবোধে বিশ্বাস করি। প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক সমাজের জন্যে তা জরুরী। সে মূল্যবোধগুলো যদি অবশিষ্ট না থাকে তা হলে বিপুল বৈষয়িক বস্তুতান্ত্রিক উন্নতি লাভ সত্ত্বেও কোন মূল্যবান ফল আপনি লাভ করতে পারেন না। সে মূল্যবোধসমূহ কিভাবে টিকিয়ে রাখা যায় তা অবশ্য আমার জানা নেই। তার মধ্যে একটি উপায় হলো ধর্ম-পদ্ধতি। কিন্তু ধর্ম কতকগুলো প্রচলন ও আনুষ্ঠানিকতার কারণে আমার দৃষ্টিতে খুবই সংকীর্ণ মনে হয়। আমি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধসমূহকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন রেখেই খুব গুরুত্ব দেই। কিন্তু সেই মূল্যবোধসমূহকে আধুনিক জীবনে কি করে প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর করা সম্ভব তা আমি জানি না।

www.pathagar.com

—Neheru, A Political Biography, London, 1959—607B

এ উক্তিতে ধর্মহীন বা ধর্মনিরপেক্ষ লোকদের মনোভাব ও মতাদর্শের যথার্থ প্রকাশ ঘটেছে। যারা ধর্মকে বাদ দিয়ে নৈতিক মূল্যবোধ উজ্জীবিত করতে চান, তাদের সবারই মধ্যে একটি বিশেষত্ব দেখা যায় যে, তাঁরা সকলেই চরম সংশয় ও প্রত্যয়হীনতার রোগে ভুগছেন। অবশ্য এজন্যে তাদের খুব যে মনোবল আছে তা নয়। তারা নিজেদের দুর্বলতা স্বীকার করেন। তারা নৈতিক মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন; কিন্তু তা লোকদের দ্বারা কি করে মানিয়ে নিতে হবে, তা তাদের জানা নেই। আসলে তাদের এ মনোভাব মতাদর্শের কোন ভিত্তিই তারা খুঁজে পান না।

একথা বোঝাতে কিছুমাত্র অসুবিধে নেই যে, একটা লোক যখন দুর্নীতির কাজ করে, তখন সে তাতে নিজের মনের আশা-আকাঙ্খার সফলতাই দেখতে পায়। এটাকে সে নিজের সাফল্য ও উন্নতি লাভের সোপান মনে করে। মান-মর্যাদা ও ধন-সম্পদ লাভের মাধ্যম মনে করেই সে তা করে। তা না হলে সে কাজ সে করবে কেন বা তা থেকে নিজেকে বিরত রাখবে কোন্ কারণে? তা কি কেবল এজন্যে যে, কিছু সংখ্যক লোক এ কাজটিকে নৈতিকতা ও মানবতার পরিপন্থী মনে করে? বিশেষ কারো উপদেশে কি কেউ লাভের পরিবর্তে ক্ষতি স্বীকার করে নেবে? বস্তুত যারা নিছক মানবতার দোহাই দিয়ে লোকদের নৈতিকতার বিধি-বন্ধন মেনে চলতে বাধ্য করতে চান, তারা শূন্যলোকে প্রাসাদ গড়তে ইচ্ছুক। কিন্তু এরূপ প্রাসাদ যে কোন দিন অস্তিত্ব পেতে পারে না, তা বলে বোঝানো নিষ্প্রয়োজন।

একটা দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। প্রতিবেশী একটা দেশের রেলগাড়ীতে ভ্রমণকারী প্রতি বিশজনের মধ্যে একজন টিকিট বিহীন থাকে। এভাবে কেন্দ্রীয় রাজস্বে প্রতি বছর পাঁচ কোটি টাকা করে ক্ষতি হচ্ছে। বিনা টিকিটে ভ্রমণ রোধ করার কাজে বার হাজার সাত শত কর্মচারী নিযুক্ত রয়েছে। তাদের জন্যে রেল বিভাগকে খরচ করতে হয় বছরে দুই কোটি উনিশ লক্ষ টাকা। কিন্তু এ বিরাট আমলা ও বার্ষিক দু' কোটি টাকা ব্যয় বিনাটিকেটে রেল ভ্রমন বন্ধ করতে সমর্থ হয়নি। তখন কর্তৃপক্ষ একটা নৈতিক আবেদনমূলক উপায় অবলম্বন করলেন। 'বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণ একটা সামাজিক অপরাধ' এ বাক্যটির হাজার হাজার পোষ্টার ছাপিয়ে সব রেলস্টেশনে লাগিয়ে দেয়া হলো। কিন্তু পরিণামে রেল বিভাগের স্থায়ী ক্ষতি ছাড়াও অতিরিক্ত লোকসান চাপল এই পোষ্টারের খরচ। লাভ কিছুই হলো না। 'সামাজিক অপরাধের' প্রতি লোকদের আকর্ষণ বাড়ল বৈ কমল না একটুও। এরূপ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করতে গেলে অনেক করা যায়। এসব ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের মধ্যে অন্য কোন উপায়ে নৈতিক চরিত্র ও দায়িত্ববোধ জাগানো যায় না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই সুস্পষ্ট ব্যর্থতা সত্ত্বেও বর্তমানে সারা দুনিয়ায় কাল্পনিক ভিত্তির উপর নৈতিক চরিত্রের প্রাসাদ

www.pathagar.com

নির্মাণের হাস্যকর চেষ্টা-প্রচেষ্টা চলছে। প্রায় সব দেশেই কেবল মাত্র সরকারী কর্মচারীদের দায়িত্বশীলতার উপর নির্ভর করেই পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা রচনা করা হচ্ছে, রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো তৈরী হচ্ছে। কর্মচারীদের স্বতঃস্ফূর্ত দায়িত্বশীলতার উপর নির্ভর করা ছাড়া কোন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অকল্পনীয় হয়ে রয়েছে। কিন্তু এ যে কত বড় দুরাশা, তা বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এরূপ আশা ও নির্ভরতা মূলত অবাস্তব, ভিত্তিহীন। অধ্যায়নরত ছাত্রদের সম্পর্কে সাধারণত এটাই বলা যায় যে, আজ তারা সাধারণ নাগরিক হলেও কাল তারাই হবে দেশের নেতা, সরকারী কর্মচারী। তাদের নৈতিকতা ও সভ্যতা-শালীনতা শিক্ষা দেয়ার জন্যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হছে। অথচ তাদের অনেকেই সারাটি বছর পড়াশুনার ধারে কাছে না গিয়ে পরীক্ষার সময় নানা দুর্নীতি বা ভয়-ভীতি দেখিয়ে পরীক্ষায় পাস করে যায়। এদের অনেকেই নানা অপরাধমূলক কাজের জন্যে দাগী ছাত্র বলে চিহ্নিত হয়। কিন্তু এরাই যখন সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে বহাল হয়, তখন তাদের দ্বারা কি একটি কাজও সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হওয়ার কোন আশা করা যেতে পারে? বস্তুত আজ বিশ্বব্যাপী জাতীয় চরিত্রের যে মারাত্মক পতন ঘটেছে,তারই কারণে অনাহারক্লিষ্ট অসহায় জনতার জন্যে দেয়া রিলিফ সামগ্রী চুরি করার অপরাধে অভিযুক্ত হচ্ছে সরকারী কর্মকর্তা, অফিসের কেরানী, রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান, সদস্য আর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা। সরকারী আমলার ঘুষখোরী ও ক্রমবর্ধমান বিমুখতা পরিষ্কার ভাষায় বলে দিচ্ছে যে, জাতীয় নৌকার হাল ধারণকারী হস্ত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, ঘুণে খেয়ে জরাজীর্ণ করে দিয়েছে। এরূপ অবস্থায় জাতীয় উন্নয়ন তো দূরের কথা, জাতির অস্তিত্ব টিকে থাকাটা অসম্ভব মনে হয়।

বর্তমান যুগটা বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার উদ্ভাবনীর যুগ বলে কথিত। আর বিজ্ঞান তো বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপার। বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা তথা দীর্ঘ অভিজ্ঞতারই ফসল হলো আজকের সব উদ্ভাবনী। কিন্তু এ যুগেই যখন দেখি, বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে যে প্রক্রিয়ায় ভ্রান্তি অকাট্যভাবে প্রমাণিত, যার স্বপক্ষে কোন দার্শনিক যুক্তিও পেশ করা সম্ভব নয়, তাকেই মানুষ আঁকড়ে ধরে রাখছে। বারবারই সেই একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। ধর্মকে বাদ দিয়ে যে আদর্শ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তৈরী করা যায় না, আর আদর্শ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছাড়া যে কোন আদর্শ ও সুখী সমাজ গঠন করা সম্ভব নয়, তা তো এক-দুইবার নয়, বহু শতবার বহু শতভাবে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও আজকের বিজ্ঞানগর্বী মানুষেরাই এই অবাস্তব প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিয়ে আঘাতের পর আঘাত খাচ্ছে, ব্যর্থতার পর চরম ব্যর্থতা কুড়াচ্ছে। তবুও তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হয় না, বিবেকের ডাকে সাড়া দিতে প্রস্তুত হচ্ছে না। এখনও সেই ধর্মকেই উপেক্ষা করে- সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে তারা ভূ-স্বর্গ রচনার অবাস্তব স্বপ্নে মগ্ন হয়ে রয়েছে। দেশ রসাতলে

www.pathagar.com

গেলেও, লাখ লাখ মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হলেও এবং লাখো মানুষের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ার মত পরিস্থিতি দেখা দিলেও আসল সত্য স্বীকার করতে কেউ প্রস্তুত নয়। এদের কথা হলো, বিজ্ঞানই ধর্মকে বাতিল করে দিয়েছে। বিজ্ঞানই সত্য, ধর্ম মিথ্যা। অতএব ব্যক্তি ও সমাজ গড়ার কাজে ধর্মকে ভিত্তি করা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক তথা বিজ্ঞান বিরোধী কাজ। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বিজ্ঞান কি সত্যিই ধর্মকে বাতিল করে দিয়েছে? বিজ্ঞান কি ধর্মের পরিপন্থী এবং ধর্ম স্বীকার করলে বিজ্ঞানীকে কি অস্বীকার করতে হবে? ধর্ম ও বিজ্ঞানের মাঝে কি এমন বিরোধ ও সংঘর্ষ রয়েছে, যার দরুন এ দুটোর একটি গ্রহণ করা হলে অন্যটি অবশ্যই পরিহার করতে হবে? বিজ্ঞান কি এতই শক্তিমান সর্বাত্মক যে, তা আয়ত্ত হলে ধর্ম বা ধর্মের আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজনই আর মানুষের জন্যে থাকবে না?

বস্তুতঃ এ প্রশ্নগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ন। এ কালের আধুনিক শিক্ষিত ও পশ্চিমা ভাবধারায় প্রভাবান্বিত লোকদের মনে এই সব প্রশ্ন প্রবল হয়ে আছে এবং এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব না পাওয়া পর্যন্ত তাদের মন থেকে সন্দেহ ও সংশয়ের কালো মেঘ অপসৃত হবে না। কিন্তু ব্যাপারটি দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ।

ধর্মের প্রতি অনিহা কেন?

বিজ্ঞান ও ধর্মের চলতি সংঘর্ষ বিশেষভাবে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের ব্যাপার। আধুনিক বিজ্ঞান এ সময়ই আত্মপ্রকাশ করে। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার উদ্ভাবনী দেখে বহুলোক মনে করে বসল যে, এর পর আল্লাহ্‌কে মান্য করার আর কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্‌কে তো মানতে হতো এ জন্যে যে, তাঁকে না মানলে এই বিশ্বপ্রকৃতির কোন ব্যাখ্যাই দেয়া যায় না। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের আলোকে যখন বিশ্ব-প্রকৃতির একটা ব্যাখ্যা সহজেই দেয়া সম্ভব হচ্ছে, তখন আল্লাহ্‌কে মেনে আর কি হবে, কি তার প্রয়োজন? এই ভাবে একশ্রেণীর লোকের দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌কে, ধর্মকে মেনে নেয়া নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়। তাদের মতে যা অপ্রয়োজনীয়, তাই ভিত্তিহীন।

এরূপ মনোভাব যখন লোকদের মনে দানা বেঁধে উঠেছিল, তখন এর স্বপক্ষে কোন আকাট্য প্রমাণ বা সুদৃঢ় কোন ভিত্তিই তাদের নিকট ছিল না। আর বর্তমানে তো বিজ্ঞানীরা নিজেরাই উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছেন যে, এরূপ মনোভাবের অনুকূলে আদপেই কোন প্রমাণ বা ভিত্তির অস্তিত্ব নেই। এটা নিতান্তই খামখেয়ালী, সম্পূর্ণ অযৌক্তিক মনোভাব। এমনকি, এরূপ মনোভাবের পেছনে কোন ধীরস্থির চিন্তা-ভাবনা, কল্যাণ বোধ এবং সদিচ্ছারও অস্তিত্ব নেই।

www.pathagar.com

প্রশ্ন হলো বিজ্ঞানের এমন কোন্ আবিষ্কারটি এ শ্রেণীর লোকের দৃষ্টিগোচর হলো যার দরুন তাদের কাছে আল্লাহ্র প্রয়োজনটাই নিঃশেষ হয়ে গেল? অনুসন্ধানে জানা গেছে, বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে, বিশ্ব–প্রকৃতি বিশেষ কতগুলো নিয়মের অধীন। প্রাচীনকালের মানুষ তো সোজাসুজি ও সাদাসিধেভাবে বিশ্বাস করত যে, বিশ্বলোকে যা কিছু হচ্ছে বা ঘটেছে, তার সব কিছুরই কর্তা আল্লাহ্ তা'আলা। কিন্তু আধুনিক উপায়–উপকরণ ও নতুন গবেষণা–পদ্ধতির আলোকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রত্যেকটি ব্যাপার বা ঘটনার পেছনে এমন একটা কারণ (cause) রয়েছে, যা চেষ্টা বা পরীক্ষা–সমীক্ষার মাধ্যমে সহজেই জানতে পারা যায়। যেমন, বিজ্ঞানী নিউটনের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে, আকাশ–লোকের সব গ্রহ–নক্ষত্র কতগুলো অপরিবর্তনযোগ্য নিয়ম–বিধানে শক্তভাবে বাঁধা রয়েছে। এগুলো সেই নিয়ম অনুযায়ী আবর্তিত হয়। ডারউইনের গবেষণা দেখিয়েছে, মানুষ বিশেষ কোন সৃষ্ট নিয়মে অস্তিত্ব লাভ করেনি। বরঞ্চ প্রাথমিক কালের পোকা–মাকড় বিবর্তন বা বস্তু বিকাশের নিয়মে উন্নতি ও পরিবর্তন লাভের পরিণামে 'মানুষে'র রূপ পরিগ্রহ করেছে। এমনিভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, অধ্যয়ন, পরীক্ষা–সমীক্ষা চালিয়ে পৃথিবী থেকে উর্ধ্বলোক পর্যন্ত সংঘটিত যাবতীয় ঘটনা একটা সুস্পষ্ট ও জানা–শুনা বিধানের অধীন সংঘটিত হয়ে থাকে বলে ধারণা জন্মে। এই নিয়ম ও বিধানেরই নাম হলো 'প্রাকৃতিক আইন' (Law of nature)। প্রাকৃতিক আইনের এই কার্যকারিতা এতই প্রকট যে, তার সম্পর্কে ও তার ভিত্তিতে রীতিমত ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে। এই হচ্ছে বিজ্ঞানের আবিষ্কার।

এই ধরনের আবিষ্কারের অর্থ দাঁড়ায়, বিশ্বলোকে আল্লাহ্র অস্তিত্ব কার্যকরতা বলে যা মনে করা হতো, তা আসলে কতগুলো বস্তুগত ও প্রকৃতিগত নিয়ম–বিধানেরই কার্যকারিতার ফসল। সে বিধান ও নিয়মগুলো প্রয়োগ করে যখন কিছু ফল দেখা গেল, তখন মানুষের নাস্তিক্যবাদী মনোভাব অধিকতর দৃঢ় হয়ে দাঁড়াল।

এই দৃঢ় মনোবল নিয়েই জার্মান দার্শনিক ক্যান্ট (Kant) বললেন, 'আমাকে 'বস্তু' যোগাড় করে দাও, সে 'বস্তু' থেকে বিশ্বলোক কি করে বানানো যায় তা আমি দেখিয়ে দেব।' 'হাইকেল (Hieckel) দাবি করে বসলেন, "পানি, রাসায়নিক উপাদান আর সময় পাওয়া গেলে তিনি 'মানুষ সৃষ্টি' করতে পারেন"। নিট্শে ঘোষণা করলেন, 'আল্লাহ্ এখন মরে গেছে।' মোটকথা সকলেই ধরে নিল যে, এই বিশ্বলোকের স্রষ্টা ও স্বত্বাধিকারী জীবন্ত ও ইচ্ছা–শক্তি–সম্পন্ন কোন সত্তা নয়। বরং বিশ্বলোক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা 'বস্তু জগৎ' (material world) মাত্র। এই জগতের সব গতি–বিধি, চলাচল এবং তার প্রকাশ (phenomenon) অন্ধ 'বস্তুর কার্যক্রম' ছাড়া আর

www.pathagar.com

কিছুই নয়—তা প্রাণসম্পন্ন বস্তু হোক কিংবা নিষ্প্রাণ-নির্জীবই হোক। এভাবে বিজ্ঞান আবিষ্কৃত জগতের কোথাও আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর নয়। অথচ এই আল্লাহ্‌ই সব ধর্মের ও ধর্ম-বিশ্বাসের মূল ভিত্তি। এরূপ অবস্থায় আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করা ও মেনে নেয়ার কি প্রয়োজন থাকতে পারে।

এ তত্ত্বের আবিষ্কারকদের প্রথম সারির বিজ্ঞানীরা যদিও সকলেই আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু তাঁদের এ উদ্ভাবন যখন অন্য লোকদের হস্তগত হলো তখন তারা মনে করে বসল যে, এই উদ্ভাবনের ফলে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সমূলেই উৎপাটিত ও অর্থহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ সমস্ত ব্যাপারে ব্যাখ্যাদানের জন্যে এই বস্তুজগতেই সব কার্যকারণ ও নিয়ম-বিধানের সন্ধান পাওয়া গেছে। তখন এ বস্তুজগতের বহির্লোকে 'আল্লাহ্‌' নামে একজনকে মেনে নেয়ার কি প্রয়োজন থাকতে পারে। যতদিন দূরবীক্ষণ যন্ত্র ছিল না, গণিত শাস্ত্রও এতটা উৎকর্ষ লাভ করেনি, ততদিন সূর্যের উদয়-অস্ত কিভাবে সংঘটিত হচ্ছে, তা মানুষের জানা ছিল না। তারা এই অজ্ঞতা ও অজ্ঞানতার কারণেই আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও কার্যকরতা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। এখন জ্যোতির্বিদ্যার (Astronomy) উৎকর্ষ লাভের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, বিশ্বব্যাপী মাধ্যাকর্ষণ ব্যবস্থার অধীনেই চন্দ্র, সূর্য, গ্রহতারা আবর্তিত হচ্ছে। অতএব এখন আল্লাহ্‌কে মেনে নেয়ার কোন প্রয়োজন হয় না। বিজ্ঞান আজ জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়েছে। অজ্ঞতা ও অজ্ঞানতার সব অন্ধকার দূর হয়ে গেছে। বর্ষমান বৃষ্টিধারার উপর সূর্যকিরণের প্রতিফলনে (Reflection) যদি রামধনু প্রতিচ্ছবি হতে পারে, তাহলে উর্ধ্বলোকে আল্লাহ্‌র নিদর্শন বলে তাকে চিত্রিত করার প্রয়োজন কোথায়? উইলিয়াম হাক্সলি এ পর্যায়ের কতিপয় ঘটনার ভিত্তিতে দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে বলেছেনঃ

If events are due to natural causes, they are not due to supernatural causes.

'ঘটনাবলী যদি প্রাকৃতিক কার্যকারণেই সংঘটিত হয়, তাহলে তারা তো আর অতিপ্রাকৃতিক কার্যকারণে সংঘটিত হতে পারে না।' আর ঘটনাবলীর পেছনে যদি অতিপ্রাকৃতিক কার্যকারণ না থাকে তাহলে অতি প্রাকৃতিক সত্তার অস্তিত্ব কি করে মেনে নেয়া যেতে পারে।

বিজ্ঞানের নামে অবৈজ্ঞানিকতা

ধর্ম অমান্যকারীদের যুক্তিজাল আর যুক্তিবিন্যাসের এই হলো ধারা, এই তার ধরন, আর রূপ। কিন্তু এ যুক্তিজালের অন্তঃসারশূন্যতা উদঘাটনের পূর্বে একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে। এক ব্যক্তি একটা রেল-ইঞ্জিন দেখতে পেল। নিচের দিকে দেখল

www.pathagar.com

তার চাকাগুলো ঘুরছে এবং ইঞ্জিনটি রেললাইনের উপর দ্রুত দৌড়াচ্ছে। কিন্তু চাকাগুলো কেমন করে ঘুরতে পারছে, তা সে বুঝে উঠতে পারল না। বিশেষ বিচার-বিবেচনার পর ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ (parts) দেখে শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারল, ঐ অংশগুলো নড়ছে বলেই চাকাগুলো ঘুরছে। তখন সে সিদ্ধান্ত নিল যে ইঞ্জিনটি তার সব কলকব্জা ও অংশগুলো সহকারে আপন থেকেই রেল গাড়িটিকে গতিশীল করছে ও চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞাস্য এই, এ ধরনের সিদ্ধান্ত কি বিজ্ঞানসম্মত? তার এ সিদ্ধান্তকে নির্ভুল ও সত্য বলে মেনে নিতে কি কেউ প্রস্তুত আছেন? না, এ ধরনের সিদ্ধান্ত অমূলক। ইঞ্জিনটার চলার ব্যাপারে তার পূর্বেই একদিকে ইঞ্জিন-নির্মাতা ইঞ্জিনিয়ার এবং অপরদিকে ড্রাইভারের অস্তিত্বকে স্বীকার করা অপরিহার্য। ইঞ্জিনিয়ার ও ড্রাইভার ব্যতিরেকে ইঞ্জিনের অস্তিত্ব এবং তার গতিশীলতা সম্পূর্ণ ধারণাতীত ব্যাপার। অন্যথায় ইঞ্জিন আর তার কল-কব্জাগুলোই আসল জিনিস নয়। চূড়ান্ত সত্যও নয়। চূড়ান্ত সত্য হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার ও তার নির্মাণ-যোগ্যতা ও প্রতিভা। একজন মনীষীর উক্তি হলোঃ

Nature does not explain, she is herself in need of an explanation.

প্রকৃতি বিশ্বলোকের কোন ব্যাখ্যা দেয় না। তার নিজেরই বরং ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

তার কারণ হলো, প্রকৃতির আইন বিশ্বলোকের একটা ঘটনা। তাকে তো আর বিশ্বলোকের ব্যাখ্যা মনে করা যেতে পারে না। যেহেতুঃ

Nature is a fact, not an explanation.

প্রকৃতি একটা বাস্তব ব্যাপার। এটা তো কোন ব্যাখ্যা নয়।

মুরগীর বাচ্চা ডিমের শক্ত খোলসের ভেতর লালিত। খোলস ভেঙ্গেই তাকে বাইরে আসতে হয়। কিন্তু খোসা দীর্ণ হওয়া ও মাংসপিন্ডবৎ বাচ্চার বাইরে বের হয়ে আসা কি করে, কেমন করে ঘটে? আগের কালের মানুষ এর জবাবে বলত, আল্লাহ্ তা'আলাই এরূপ করেন। কিন্তু বর্তমানে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের পর্যবেক্ষন থেকে জানা গেছে, একুশ দিনের মেয়াদ পূর্ণ হলেই ডিমের ভেতরে বাচ্চার চঞ্চুর উপরিভাগে একটা ক্ষুদ্র শিং গজিয়ে উঠে। এই শিং-এর সাহায্যেই খোসা ভেঙ্গে বাচ্চা বাইরের দুনিয়ায় আত্মপ্রকাশ করে। শিংটি তার কাজ শেষ করার কয়েকদিন পরই আপনা-আপনি খসে পড়ে যায়।

ধর্ম অমান্যকারীদের পর্যবেক্ষণে 'মুরগীর বাচ্চাকে ডিমের বাইরে আল্লাহ্ই নিয়ে আসেন' কথাটি ভ্রান্ত মনে হয়েছে। কারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র তাদের দেখিয়ে দিয়েছে যে, একুশ দিনের একটা স্থায়ী নিয়ম বাচ্চার বাইরে আসার মতো অবস্থার উদ্ভব করে।

www.pathagar.com

কিন্তু এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন হলো, এই যে দাবিটি করা হলো, এটাই কি চূড়ান্ত কথা? প্রকৃত ব্যাপার সবটুকুই কি এ কথায় প্রকাশিত হয়েছে? না, তা হয়নি। এ দাবিটি যেমনি অসম্পূর্ণ তেমনি বিভ্রান্তিকরও। আধুনিক পর্যবেক্ষণ গোটা সৃষ্টি-ব্যাপারের নতুন কয়েকটি স্তর আমাদের সামনে তুলে ধরেছে মাত্র, সবটুকু নয়। ঘটনার মূল ও চূড়ান্ত রূপ এখনও অনুদ্ঘাটিত। এ পর্যবেক্ষণে অবস্থার খুব সামান্য পরিবর্তন ঘটেছে মাত্র। পূর্বে ডিমের খোসা দীর্ণ হওয়া সম্পর্কে যে প্রশ্নটি প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেই প্রশ্নই এখন শিং-এর উপর গিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। 'বাচ্চার নিজের শিং দ্বারা খোসা দীর্ণ করা' মূল ঘটনার একটা মধ্যবর্তী পর্যায় মাত্র। এ হিসাবে এটা আসল ঘটনার একটা অংশ; মূল ব্যাপারের কোন ব্যাখ্যা নয়। মূল ব্যাপারের ব্যাখ্যা তখনই হতে পারে যদি আমরা জানতে পারি যে, বাচ্চার চঞ্চুর উপর শিং গজিয়ে উঠার আসল ও সর্বশেষ কার্যকারণ কি। এই শেষ কার্যকারণ জানতে পারার পূর্বে শিং গজানোর গল্পটি নিজেই একটি বিরাট জিজ্ঞাসা। তাকে মূল প্রশ্নের জবাব মনে করা যেতে পারে না। কারণ আগে যদি প্রশ্ন ছিলঃ খোসার বাইরে আসে কি করে, তাহলে এখন প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে, শিংটা কি করে গজায়? এ দুটো অবস্থার মধ্যে কোন প্রজাতীয় পার্থক্য সূচিত হয়নি। একে মাত্র প্রাকৃতিক অবস্থার প্রশস্ততর পর্যবেক্ষণই বলা যেতে পারে, প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা বলা যায় না কোনমতেই।

ধর্মবিরোধীরা যে আবিষ্কারকে প্রকৃতির ব্যাখ্যা নাম দিয়ে আল্লাহ্‌র বিকল্প খাড়া করেছে, আমরা তাকে সহজেই প্রকৃতির কর্মপদ্ধতি বা টেকনিক বলতে পারি। অতি সহজেই বলতে পারি, আল্লাহ্ তা'আলাই এ সব নিয়মে বিশ্বলোকে তার সম্পূর্ণ কার্যকরতা চালান। বিজ্ঞান তার কিছু অংশ জানতে পেরেছে মাত্র। অজানা জগতের বিস্তৃত বিশালতা এখনও সীমাহীন।

মনে করুন ধর্ম বিশ্বাসীরা বলছে, নদী-সমুদ্রে জোয়ার-ভাটা আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করেন। আধুনিক যুগের এক বিজ্ঞানী বলে উঠলেন জোয়ার-ভাটা তো মূলত চাদের আকর্ষণ (Gravity—pull of the moon) এবং দুনিয়ার স্থল ও জলভাগের ভৌগোলিক সংগঠন রূপের আপেক্ষিক অবস্থানের (Geographical configuration) কারণে হয়ে থাকে। বিজ্ঞানীর এ পর্যবেক্ষণকে (Observation) রদ করার প্রয়োজন নেই। আমরা তা সানন্দে ও স্বচ্ছন্দে স্বীকার করে নিতে পারি। কিন্তু এতে আল্লাহ্-বিশ্বাস কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন বা ব্যাহত হতে পারেনি। মহাকর্ষ শক্তি ও পৃথিবীর ভৌগোলিক সংগঠনের আপেক্ষিক অবস্থার সক্রিয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু আসলে এ দুটো কি? এ দুটো কেন এবং কিভাবে কাজ করে? বিজ্ঞানী এ প্রশ্নের কোন জবাব দিচ্ছেন না। এর জবাব আল্লাহ্-বিশ্বাসের আলোকেই দেয়া সম্ভব। বলতে হবে এ সবই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। আল্লাহ্‌ই এ সবের মাধ্যমে নিজ কার্যকরতা সুসম্পন্ন করেন। বিশ্বপ্রকৃতিতে নিত্য

www.pathagar.com

সংঘটিত যাবতীয় ঘটনার মূল কারণ আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ নয়। এ উক্তির যথার্থতাকে অস্বীকার করবে কে?

জীবতত্ত্ব ও প্রাণীবিদ্যার ক্ষেত্রে ক্রমবিকাশবাদের (Theory of Evolution) দোহাই এ কালের বিজ্ঞানগর্বীদের চূড়ান্ত কথা। এখনকার মত হলো জীবতাত্ত্বিক ব্যাপারে কোন প্রকৃত-বহির্ভূত কার্যকারণের অস্তিত্বের প্রয়োজন এখন ফুরিয়ে গেছে। অন্য কথায় জীবনের রহস্য অনুধাবনের জন্যে কোন সচেতন, সদা-সক্রিয় আল্লাহ্র অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। কারণ আধুনিক পর্যবেক্ষণ প্রমাণ করেছে, কতিপয় বস্তুগত শক্তির কারণে জীবন স্বতঃস্ফূর্তভাবে লব্ধ একটা ফলমাত্র। এতে বিশেষভাবে তিনটি জিনিস রয়েছেঃ Reproduction, Variation and Differential Survival অর্থাৎ প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির সাহায্যে নতুন নতুন জীবনের প্রকাশ ঘটা, উৎপন্ন বংশের কতিপয় ব্যক্তিতে কিছুটা পার্থক্য সূচিত হওয়া এবং বংশের পর বংশ-পরম্পরায় উন্নতিলাভ করে এই পার্থক্যের সম্পূর্ণতা অর্জন। ধর্মবিরোধিদের দৃষ্টিতে জীবতাত্ত্বিক বাহ্য প্রকাশে ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural selection) নীতির প্রয়োগ জীবনের ক্রমবিকাশ ও ক্রমবৃদ্ধিতে আল্লাহ্র প্রত্যক্ষ কার্যকরতা সংক্রান্ত বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করা সম্ভব ও প্রয়োজনীয় করে দিয়েছে।

যদিও, ক্রমবিকাশবাদীরা যেমনি বলেন প্রকৃতপক্ষে তেমনিভাবেই জীব-প্রজাতিসমূহ অস্তিত্ব লাভ করেছে—একথা এখনও সম্পূর্ণ অপ্রমাণিত, তবু এ কথাকে যদি সত্যি বলে মেনে নেয়া যায় তাহলেও এতে ধর্মবিশ্বাস বিন্দুমাত্র নড়বড়ে হয়ে পড়ার কোন কারণ থাকে না। কারণ জীব প্রজাতিসমূহ যদি ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়া অনুযায়ী অস্তিত্ব লাভ করেও থাকে তবু অনুরূপ দৃঢ় প্রত্যয় ও বলিষ্ঠতা নিয়ে বলা যেতে পারে, এটাই হলো আল্লাহ্র সৃষ্টি-প্রক্রিয়া। এটা অন্ধ-বধির নিস্প্রাণ বস্তুগত কার্যক্রমের স্বয়ংলব্ধ ফল নয়। বস্তুত যান্ত্রিক ক্রমবিকাশকে (Mechanical Evolution) সহজেই সৃষ্টিমূলক ক্রমবিকাশ (Creational Evolution) প্রমাণ করা যেতে পারে। বিজ্ঞানের বলে যারা ধর্মের বিরোধিতা করে তাদের পক্ষে একে খন্ডন করা সম্ভব নয়।

বিজ্ঞান ধর্মের সমর্থক

এ পর্যন্ত যা বলা হলো তা হচ্ছে নিছক জ্ঞানের আলোকে মূল দাবির বিশ্লেষণ। কিন্তু বিজ্ঞান বিংশ শতকে এসে তার পূর্বতন প্রত্যয় হারিয়ে ফেলেছে। নিউটন এখন অতীত। এ যুগ আইনস্টাইনের। এদিকে প্লাংক ও হিজেনবার্গ লাপলেস-এর মতাদর্শ বাতিল করে দিয়েছে। এখন ধর্মবিরোধীদের পক্ষে অন্তত জ্ঞানের ভিত্তিতে এ ধরনের দাবি

www.pathagar.com

কৱার কোন অবকাশই অবশিষ্ট নেই। আপেক্ষিক তত্ত্ব (Relativity) ও কোয়ান্টাম থিওরী বিজ্ঞানীদের এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য করেছে যে, বিজ্ঞানে পর্যবেক্ষককে (observer) পর্যবেক্ষিত (Thing observed) থেকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। তার অর্থ আমরা একটা জিনিসের শুধু কতিপয় বাহ্য প্রকাশকেই (phenomenon) দেখি, মূল জিনিসকে দেখতে পাইনে। বিশ শতকের বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে বিপ্লব ঘটেছে, তা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেই ধর্মের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে।

নিউটনের মতাদর্শ দু'শ বছর পর্যন্ত বিজ্ঞান জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। কিন্তু একালের আধুনিকতম গবেষণা–অধ্যয়ন তাকে মিথ্যা প্রমাণ করেছে। বিজ্ঞানের নবতর বিপ্লব বলে এ ব্যাপারটিকে বোঝানো হয়। কিন্তু পূর্ববর্তী মতাদর্শের স্থানে নতুন কোন পূর্ণাঙ্গ মতাদর্শ এখনও দেখা যায়নি—তা সত্ত্বেও এতে সন্দেহ নেই যে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গির দার্শনিক ভাবধারা পূর্ববর্তী মতাদর্শ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন–পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিই প্রকৃত সত্য জানবার একমাত্র নির্ভুল পন্থা, এ দাবি এখন ভিত্তিহীন। বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরাই আজ উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠেছেনঃ

Science gives us but a partial knowledge of reality.

বিজ্ঞান আমাদেরকে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে মাত্র আংশিক জ্ঞান দেয়।

বিজ্ঞানের এই পরিবর্তন একটা আকস্মিক ব্যাপার। একশ' বছরও অতিবাহিত হয়নি, টিনডাল্ (Tyndall) তাঁর বেলফাস্ট বক্তৃতায় (Belfast address) ঘোষণা করেছিলেন, 'মানুষের সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিষ্পন্ন (deal) করার জন্যে একা বিজ্ঞানই যথেষ্ট।' তখন পর্যন্ত বিশ্বাস করা হতো যে, বস্তু ও গতিই (matter and motion) চূড়ান্ত সত্য। এ কারণেই বিজ্ঞান সম্পর্কে এ ধরনের কাল্পনিক প্রত্যয়ের উপর ভিত্তি করে এ ধরনের কথা–বার্তা বলা হচ্ছিল। কিন্তু বস্তু ও গতির পরিভাষায় প্রকৃতির ব্যাখ্যাদানের সব চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। অষ্টাদশ শতকে এ চেষ্টা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেছিল। তখন লাপলেস্ (Laplace) এ কথা বলবার সাহস পেয়েছিলেন যে, প্রাথমিক নীহারিকায় (Nebula) অণুবীক্ষেপণের কথা জানেন এমন এক মহা গণিতবিদ্যা পারদর্শী দুনিয়ার ভবিষ্যৎ ইতিহাস আগাম বলে দিতে পারেন। তখন এ কথাই মনে করা হতো যে, নিউটনের মতবাদই সব জ্ঞান–বিজ্ঞানের চাবিকাঠি।

কিন্তু নিউটনের এ মতবাদ এখন পরিত্যক্ত। পরিত্যক্ত হয়েছে তখন, যখন বিজ্ঞানীরা আলোর বস্তুগত ব্যাখ্যাদানের চেষ্টা করেছিলেন। এই চেষ্টাই তাঁদের 'ইথার' (Ether) বিশ্বাস পর্যন্ত পৌছে দিয়েছে। অথচ এর পূর্বে 'ইথার' ছিল সম্পূর্ণ অজানা ও বর্ণনা–অযোগ্য উপকরণ। অবশ্য কয়েকটি বংশ পরম্পরা থেকে এ আশ্চর্য ধরনের

বিশ্বাসটি অব্যাহতভাবে চলে আসছিল। আলোর বস্তুগত ব্যাখ্যার অনুকূলে গণিত শাস্ত্রের বিস্ময়কর ক্ষমতা প্রদর্শন করা হলো। কিন্তু ম্যাক্স্ওয়েলের (Maxwell) পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা প্রচারিত হওয়ার দরুন এ অসুবিধাটি দূরতিক্রম্য মনে হলো। কারণ তা থেকে দেখানো হতো যে, 'আলো' একটা বিদ্যুৎশক্তিসম্পন্ন চুম্বকের বহিঃপ্রকাশ (Electro magnetic phenomenon)। এ শূন্যতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকল। শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের নিকট প্রকট হয়ে উঠল যে, নিউটনের মতাদর্শ তেমন একটা মহৎ কিছু নয়। দীর্ঘদিনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং বিদ্যুৎকে বস্তুগত বা যান্ত্রিক (mechanical) প্রমাণ করার সর্বশেষ চেষ্টার পর শেষ পর্যন্ত বিদ্যুৎকে বিশ্লেষণ-অযোগ্য উপাদান (Irreducible Element) সমূহের তালিকাভুক্ত করে দেয়া হ লো।

ব্যাপারটি বাহ্যত খুব সহজ, হালকা ও সাদাসিধে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত। নিউটনের দৃষ্টিতে সবকিছুই আমাদের জানা। সে অনুযায়ী একটা জিনিসের বস্তু-পরিমাণই ছিল তার আয়তন বা পরিমাণ। গতি দ্বারা শক্তি বোঝা যেত। এভাবে প্রকৃতিকে জানতে পারা গেছে বলে তখন অহমিকা বোধ করা হতো। কিন্তু বিদ্যুৎ অধ্যয়ন-পর্যবেক্ষণে ক্রমাগতভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, তার প্রকৃতি (Nature) এমন, যার সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। জানা পরিভাষায় তার ব্যাখ্যা দেয়ার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেছে। বিদ্যুৎ সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানি তা শুধু প্রক্রিয়া, যা আমাদের পরিমাপ-যন্ত্রসমূহকে প্রভাবিত করে।

এ কথাটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা আমরা এখন জানতে পারি ও বুঝতে পারি। তার অর্থ হলো, এমন একটা 'সত্তা'কে (Entity) প্রকৃতিতে মেনে নেয়া হয়েছে, যার গাণিতিক কাঠামো ভিন্ন আর কিছুই জানা নেই।

তারপর এই নিয়মে এ ধরনের আরও অনেক জিনিসের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। আর ধরে নেয়া হয়েছে যে, এ অজানা সত্তাগুলোও বৈজ্ঞানিক মতবাদ রচনায় প্রাচীনকালের জানা বস্তুর ভূমিকা পালন করছে। প্রকৃতি বিজ্ঞানের দিক দিয়ে আমরা কোন জিনিসের আসল সত্তা সম্পর্কে কিছুই জানতে পারিনে, বরং তার শুধু গাণিতিক কাঠামোকেই (Mathemetical structure) জানতে চেষ্টা করা যেতে পারে, এ মতকে চূড়ান্ত বলে মেনে নেয়া হয়েছে। বস্তুগুলোকে তাদের সর্বশেষ রূপে দেখা যায়, এরূপ ধারণা যে নিছক প্রতারণা তা উচ্চমহলে সমর্থিত হয়েছে।

অধ্যাপক এডিংটন (Eddington)-এর মতে প্রকৃতি-বিজ্ঞান আমাদের গাণিতিক কাঠামো সম্পর্কিত জ্ঞানই দিতে পারে। তার বেশী কিছু দেয়া তার সাধ্যের বাইরে। তাঁর বক্তব্য হলোঃ

www.pathagar.com

'সৌন্দর্যগত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক বাদ দিয়ে বস্তুর আয়তন, অণূ ও কাল প্রকৃতিকে নিছক প্রকৃতিগত জিনিস মনে করা হয়। এগুলোর অবস্থা জানা আমাদের পক্ষে ততটা দুষ্কর, যতটা অ-বস্তু জিনিসের প্রকৃত তত্ত্ব জানা। এসব জিনিস সম্পর্কে সরাসরি জানতে পারা প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সাধ্য নেই। এ সবের মূল সত্য ইন্দ্রিয়ানুভূতি বহির্ভূত। আমরা মানসিক ধারণার সাহায্যে অনুমান করতে পারি মাত্র। কিন্তু মনের দর্পণে এমন জিনিস প্রতিবিম্বিত হতে পারে না যা আদপেই মনের মধ্যে বর্তমান নেই। এভাবে প্রকৃতি অধ্যয়ন পদ্ধতির দিক দিয়ে পদার্থবিদ্যা এসব অনুভূতি-বহির্ভূত বিশেষত্ব অধ্যয়ন করতে পারে না। এটা শুধু Pointer Reading মাত্র যা আমরা জানতে পারি। এ অধ্যয়ন বিশ্বলোক কার্যক্রমের কতিপয় বিশেষত্বকে প্রতিবিম্বিত করে। কিন্তু আমাদের আসল জ্ঞান উপায়গত অধ্যয়ন সংশ্লিষ্ট, বিশেষত্ব সম্পর্কিত নয়। উপায়গত অধ্যয়নের সাথে জিনিসগুলোর প্রকৃত বিশেষত্বের সেই সম্পর্ক বা এক ব্যক্তির সাথে তার টেলিফোন নম্বরের সম্পর্ক।

—The Domain of Physical Science—Essay in Science, Religion and Reality

বিজ্ঞান শুধুমাত্র কাঠামোগত জ্ঞান পর্যন্তই সীমিত, তার বাইরে পদচারণের কোন সামর্থ্য তার নেই। এটা একটা বাস্তব ব্যাপার। দ্বিতীয়ত, এই কথাটি খুবই গুরুত্বের অধিকারী। কারণ, এ কথার অর্থ দাঁড়ায় বিশ্বলোকের প্রকৃত নিগূঢ় তত্ত্ব ও সত্য এখনও অজানা রয়ে গেছে। আমাদের অনুভূতি কিম্বা আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপনের গভীরতর অভিজ্ঞতার কোন প্রতিরূপ বা পূরক অংশ (Objective counter part) নেই, একথা এখন বলা যেতে পারে না। বাইরে এ ধরনের কোন প্রতিরূপ—পরিপূরক বর্তমান থাকা খুবই সম্ভব। এ দৃষ্টিতে ধর্মীয় ও সৌন্দর্য বোধজনিত অনুভূতিসমূহকে 'প্রতারক বাহ্যপ্রকাশ' (Illusory phenomenon) বা মায়াময়, অলীক, মিথ্যা বলে অভিহিত করা যায় না—যেমন পূর্বে করা হতো। আধুনিক বিজ্ঞান জগতে ধর্ম বিশ্বাসী ব্যক্তিও একজন বাস্তববাদী হয়ে থাকতে পারে।

—The Limitations of Science, 138-42

বস্তুত এসব কথা বৈজ্ঞানিক-দার্শনিকদের। তাঁরাই এ ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্প্রতি পেশ করতে শুরু করে দিয়েছেন। মর্টন হোয়াইট (Morton White)-এর উক্তি হলোঃ

www.pathagar.com

'বিংশ শতকে দার্শনিক মানসিকতাসম্পন্ন বিজ্ঞানীরা এক নতুন যুদ্ধ (Crusade) শুরু করেছেন। হোয়াইট হেড, এডিংটন ও জীন্স-এর নাম এ পর্যায়ে বিশেষভাবে উল্লেখ্য।' —The Age of Analysis, P. 84

বিজ্ঞানের সর্বশেষ স্বীকারোক্তি

এ পর্যায়ের পন্ডিত, চিন্তাবিদদের চিন্তাধারা বিশ্বোলোকের বস্তুনিষ্ঠ (material) ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাঁদের আসল বিশেষত্ব হলো, তাঁরা নিজেরাই আধুনিক প্রকৃতি-বিজ্ঞান গণিতবিদ্যার ফলাফলের উদ্ধৃতি দিয়ে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। মর্টন হোয়াইট, হোয়াইট হেড্ সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন, এঁদের সম্পর্কে সেই কথাই সত্য। কথাটি হলোঃ

He is a heroic thinker who tries to beard the lions of intellectualism, Materialism and positivism in their own bristling den.' (p. 84)

তিনি একজন দুঃসাহসী চিন্তাবিদ। তিনি বস্তুবাদ পূজারী সিংহদের তাদের নিজ গুহাতেই চ্যালেঞ্জ দিয়েছে।

ইংরেজ গণিতবিদ ও দার্শনিক আল্‌ফ্রেড নর্থ হোয়াইট হেড্ (১৮৬১-১৯৪৭)-এর মতে আধুনিক তথ্য প্রমাণ করেছেঃ

Nature is Alive. (p. 84)

বিশ্বপ্রকৃতি মৃত নয়—সম্পূর্ণ জীবিত ও জীবন্ত সত্তা।

ইংরেজ জ্যোতির্বিদ স্যার আর্থার এডিংটন (১৮৮২-১৯৪৪) আধুনিক বিজ্ঞান অধ্যায়নের ফলে জানতে পেরেছেনঃ

The Stuff of the world is mind-stuff. (p. 146)

বিশ্বলোকের 'বস্তু' একটা মানসিক বস্তু।

গাণিতিক প্রকৃতিবিজ্ঞানী ইংরেজ বুদ্ধিজীবী স্যার জেম্‌স্ জীনস্ (১৮৭৭-১৯৪৬) আধুনিক গবেষণা ও অধ্যয়নের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এ ভাষায় ঃ

The universe is a universe of thought. (p. 134)

বিশ্বলোক বস্তুনিষ্ঠ নয়, চিন্তার 'বিশ্বলোক।

www.pathagar.com

এ সব উক্তি সর্বজনমান্য বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারার চূড়ান্ত ফসল। জে ডব্লিউ এন· সুলিভানের ভাষায় এ সব উক্তির সারনির্যাস হলোঃ

The ultimate nature of the universe is mental. (p. 45)

'বিশ্বলোকের চূড়ান্ত রূপ ও প্রকৃতি হলো মানসিক।'[১]

বস্তুত বিজ্ঞান জগতে এ এক বিরাট পরিবর্তন। বিগত অর্ধশতকে এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ পরিবর্তনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দিক ডব্লিউ. এন. সুলিভানের ভাষায়—'সামাজিক প্রগতির জন্যে অধিক শক্তি অর্জিত হয়েছে, তা নয়। বরং এ হলো সেই পরিবর্তন, যা তার অধিবিদ্যার ভিত্তিলোকে (Metaphysical Foundation) সংঘটিত হয়েছে। —Limitation of Science. p. 138-50

আধুনিক পদার্থ বিদ্যার আলোকে বিশ্বলোকের কোন বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা (Material Representation) বা বিশ্লেষণ (Analysis) দেয়া চলে না। কারণ (পূর্বে যেমন বলেছি) এখনকার বিশ্বলোক তো একটা নিছক 'মানসিক ধারণা' (Mental concept) পর্যায়ের জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—The Mysterious Universe,1948,p.169

জীন্‌স–এর ভাষায়ঃ

If the universe is a universe of thought, then its creation must have been an act of thought. (p. 134)

বিশ্বলোক যখন একটা ধারণাগত বস্তু, তখন তার সৃষ্টিটাও একটা ধারণাগত কার্যক্রমের ফসল হওয়া অপরিহার্য। (জড়বাদ—তথা ধর্মহীনতা যে ভিত্তিহীন, এটা তারই উদাত্ত ঘোষণা)।

---

১. বিশ্বলোকের চূড়ান্ত তত্ত্ব ' মন' কিংবা 'বস্তু'—এটা দার্শনিকদের প্রশ্ন। এ প্রশ্নের আসল রূপ হলোঃ বিশ্বলোক নিছক বস্তুর নিজস্ব কার্যকরতা হিসেবে আপনা আপনিই অস্তিত্ব লাভ করেছে, না কোন বস্তু উর্ধ্বসত্তা, স্ব–ইচ্ছায় ও স্ব–ক্ষমতায় এটা সৃষ্টি করেছে? যেমন কোন 'মেশিন' সম্পর্কে যদি বলা হয় যে, চূড়ান্ত অভিজ্ঞতায় ওটা শুধু লোহা ও পেট্রোলের এক হঠাৎ ঘটে যাওয়া accidental সংমিশ্রণ মাত্র, তাহলে বলা হলো মেশিনের পূর্বে শুধু লোহা ও পেট্রোল ছিল এবং এ দুটো নিজেরাই কোন অন্ধ কার্যক্রমের ফলে সহসাই মেশিন–এর রূপ পরিগ্রহ করেছে। পক্ষান্তরে যদি বলা হয়, মেশিন তার সর্বশেষ পরীক্ষায় ইঞ্জিনিয়ারের 'মন' তাহলে তার অর্থ হবে, মেশিনের পূর্বে 'মন' ছিল, সেই 'মন' 'বস্তু' থেকে বিচ্ছিন্নভাবে প্রথমে তার 'ডিজাইন' চিন্তা করেছে এবং নিজের ইচ্ছায় ওটি নির্মাণ করেছে।

'মন' কি জিনিস, তার স্বরূপ নির্ধারণে মতভেদ রয়েছে। যারা 'মন'কেই চূড়ান্ত সত্য মনে করে তাদের বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠী থাকতে পারে, যেমন আল্লাহ্–বিশ্বাসী লোকেরা এক আল্লাহ্ বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত, কিন্তু বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন–গবেষণার চূড়ান্ত ফল বিশ্বলোকের সর্বশেষ সত্য 'মন'—কথাটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ধর্মের সত্যতার স্বীকৃতি এবং নাস্তিকতার চূড়ান্ত অস্বীকৃতি। বিজ্ঞানের এটাই শেষ কথা।

www.pathagar.com

তিনি বলেন, 'বস্তু বা পদার্থকে বিদ্যুৎ প্রবাহ বলে ব্যাখ্যা দেয়ার আধুনিক মতাদর্শ মানবীয় ধীশক্তির নিকট সম্পূর্ণ অবোধ্য। এ জন্যে বলা হয়, 'হতে পারে এ প্রবাহ নিছক 'সম্ভাব্যতার প্রবাহ (Waves of Probabilities) যার কোনই অস্তিত্ব নেই। এ সব এবং এ ধরনের অন্যান্য কারণে স্যার জেমস জীনস্ এই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে, নিখিল বিশ্বলোকের আসল সত্য বস্তু বা পদার্থ নয়, বরং তা হলো ধারণা (Concept)। এ ধারণাটা কোথায় অবস্থিত? এ প্রশ্নের একমাত্র জবাব হলো, সে ধারণা এক মহান বিশ্ব-সর্বাত্মক গণিতবিদের মানসলোকে' অবস্থিত। কারণ বিশ্বলোকেরকাঠামোটি—যা আমরা জানি, দেখি, অনুভব করি—সম্পূর্ণরূপেগাণিতিক কাঠামো। তাঁর বক্তব্যের একটা অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছেঃ

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বিগত কয়েক বছরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রবাহ একটা নতুন দিকে মোড় নিয়েছে। ত্রিশ বছর পূর্বে (বইটি ১৯৩০ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়) আমরা মনে করেছিলাম—

আমরা এমন এক মহাসত্যের নিকটবর্তী যা স্ব-প্রকৃতিতে মেশিনের মত (Mechanical) মনে হতো, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি কতগুলি অণুকণার এক শৃঙ্খলাবিহীন স্তুপ, যা ঘটনাক্রমেই একত্রিত হয়েছে। আর যার কাজ হলো উদ্দেশ্যহীন, চেতনাহীন, অন্ধ শক্তিসমূহের কার্যকরতার অধীন কিছু কালের জন্যে এক অর্থহীন নৃত্যে রত হয়ে থাকা, যা শেষ হয়ে গেলে শুধু একটা 'মৃত প্রকৃতিলোক' অবশিষ্ট থাকবে। এই অতিমিশ্র যান্ত্রিক জগতে উল্লিখিত অন্ধ শক্তিসমূহের কার্যকরতার সময় নিতান্ত ঘটনাবশতই 'জীবন' দানা বেধে উঠেছে। বিশ্বলোকের এক ক্ষুদ্রতম অংশ কিংবা সম্ভাব্য আরও কয়েকটি অংশ কিছুকালের জন্যে ঘটনাবশতই চেতনাসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। আর তাও একটা নিস্প্রাণ জগৎ ত্যাগ করে শেষ পর্যন্ত একদিন শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আজকাল এমন সব অকাট্য প্রমাণাদি বর্তমান যা পদার্থ বিজ্ঞানকে একথা মেনে নিতে বাধ্য করে যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্রোত একটা অ-যান্ত্রিক বাস্তবতার (Non-mechanical Reality) দিকে চলে যাচ্ছে। এখন বিশ্বলোক একটা 'বড় যন্ত্রের' পরিবর্তে একটা বিরাট চিন্তার (Great thought) সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। মন (Mind) ঘটনাবশতই নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় এই বস্তুজগতে উপস্থিত হয়নি। এখন আমরা এমন স্থানে পৌছে যাচ্ছি যেখানে বস্তু জগতের স্রষ্টা ও প্রশাসক প্রভুরূপে মনকে সম্বর্ধনা জানাতে আমরা বাধ্য। এই 'মন' নিঃসন্দেহে আমাদের 'ব্যক্তিমন'-এর ন্যায় নয়। বরং তা এমন মন, যা বস্তু-অণু দিয়ে মানুষের মগজ সৃষ্টি করেছে। আর এই সবকিছু একটা পরিকল্পনা রূপে প্রথম থেকেই তার মনে জাগরূক ছিল। আধুনিক বিজ্ঞান আমাদেরকে খুব তাড়াহুড়া করে গড়ে তোলে প্রাচীন মতাদর্শ পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করছে।

www.pathagar.com

আমরা জানতে পেরেছি যে, গোটা বিশ্বলোক এক মহা পরিকল্পনা রচনাকারী কিংবা প্রশাসক, নিয়ন্ত্রক শক্তির (Designing or controlling power) অস্তিত্ব ও অবস্থিতির সাক্ষ্য দিচ্ছে, যা আমাদের ব্যক্তি—মানসের অনেকটা সদৃশ—ভাবাবেগ ও অনুভূতির দিক দিয়ে নয়, বরং এ পদ্ধতিতে চিন্তা করার হিসেবে, যা আমরা 'গাণিতিক মানস' বলে প্রকাশ করতে পারি। —The Mysterious Universe, p. 136-38

বিদ্বেষে আচ্ছন্ন মহাসত্য

জ্ঞানের ও তত্ত্বের দিক দিয়ে বিজ্ঞান ক্ষেত্রে এ আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, এ কথা সত্য। কিন্তু কার্যত আল্লাহ্ অস্বীকারকারী মন-মানসিকতায় তেমন উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয়নি। শুধু যে পরিবর্তন হয়নি তাই নয়, বরং আল্লাহ্-অস্বীকৃতির বড় বড় প্রবক্তরা নতুন ভঙ্গীতে নিজেদের দলীল দস্তাবেজ সুসংহত করার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তারও পেছনে কোন তত্ত্বগত আবিষ্কার নেই বা তাদের হাতে এই ব্যাপারে নতুন কোন প্রমাণও আসেনি বরং একমাত্র বিদ্বেষই তাদেরকে এইরূপ অনমনীয় করে দিয়েছে।

বস্তুত প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হওয়ার পরও কেবলমাত্র বিদ্বেষের কারণে বহু মানুষ সে সত্যকে স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়নি, ইতিহাসে তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। চারশ' বছর পূর্বে এরিস্টটলের বিপরীত গ্যালিলিও'র মতাদর্শ মেনে নিতে ইটালীয় পন্ডিত সমাজ শুধুমাত্র এই বিদ্বেষের কারণেই অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। অথচ লিনিংটাওয়ার থেকে নিচে পড়া গোলা গ্যালিলিও'র মতাদর্শের সত্যতা তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল। উনবিংশ শতকের শেষে বার্লিনের অধ্যাপক ম্যাক্সপ্লাঙ্ক (Maxplanck) 'আলো'র এমন সব ব্যাখ্যা পেশ করেছিলেন, যা বিশ্বলোক সম্পর্কিত নিউটনী ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করেছিল। কিন্তু সে সময়ের বিশেষজ্ঞরা তা মেনে নিতে অস্বীকার করলেন শুধু এই বিদ্বেষের কারণে। এ কারণেই তাঁরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতেও ছাড়েন নি। অথচ আজ তা 'কোয়ান্টাম থিওরী'রূপে পদার্থবিদ্যার মৌলনীতির মধ্যে গণ্য।

কেউ যদি মনে করে থাকেন, বিদ্বেষ অন্য লোকের মধ্যেও তো মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে; কিন্তু বিজ্ঞানীরা বিদ্বেষমুক্ত নন। এই প্রসঙ্গে সর্ব জনমান্য বিজ্ঞানী ডঃ হিল্‌স (A. V. Hills) বলেনঃ

> I should be the last to claim that we, scientific men. are less liable to prejudice than other educated men. (Quoted by A. N. Gilkes, Faith for Modern Men. p. 109).

৬—

www.pathagar.com

আমরা বিজ্ঞানীরা অন্যান্য শিক্ষিত লোকদের অপেক্ষা কম বিদ্বেষ ভাবাপন্ন, এই দাবি করতে আমি নারায।

বলতে গেলে জগৎটা সম্পূর্ণরূপে বিদ্বেষ-বিষে জর্জরিত। এখানে একটা বৈজ্ঞানিক সত্যও সংশ্লিষ্ট সমাজে স্বীকৃতি পায় না শুধু এই বিদ্বেষের কারণে। একটা তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক বিচারে পুরোপুরিভাবে উত্তীর্ণ হলেও তা যে সর্বশ্রেণীর লোক দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেবে, বিদ্বেষ বিষাক্ত এই মানব-সমাজে তেমন আশা করা যায় না—কোন কিছুর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ একবার মনে-মগজে বদ্ধমূল হয়ে গেলে—সে জিনিস যতই সত্য, বিজ্ঞানসম্মত ও অকাট্য যুক্তিসঙ্গতই হোক না কেন—তা কোনদিনই স্বীকৃতি পেতে পারবে না। বিদ্বেষ এমনি এক মারাত্মক জিনিস। ধর্মের ব্যাপারটিও আজ নিছক বিদ্বেষের কারণে এক শ্রেণীর লোকের নিকট স্বীকৃতি পাচ্ছে না শুধু এই জন্যে যে, ধর্মের প্রতি একটা অন্ধ বিদ্বেষ যুগ যুগ ধরে তাদের মনে জমাট বেঁধে রয়েছে। অন্যথায় ধর্মকে না মানার, মানব জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ধর্মকে পুরো মর্যাদায় স্বীকৃতি না দেয়ার কোন কারণই থাকতে পারে না। ধর্মকে অস্বীকার করার ফলে ব্যক্তি-জীবন যে নৈতিকতাশূন্য হয়ে পড়ছে, তার ফলে সমাজ জীবন যে মারাত্মক দুর্নীতিতে ভেঙ্গে পড়েছে এবং রাষ্ট্রের সব কল্যাণ প্রচেষ্টাই যে সম্পূর্ণরূপে বাঞ্চাল হয়ে যাচ্ছে, সকল জাতীয় স্বপ্নসাধ যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে, তা সকলেই প্রত্যক্ষ করছে। দুর্নীতি ও চরিত্রহীনতার কারণে এই সমাজ যে আজ নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে তা সকলেই দেখতে পাচ্ছে। এ মর্মান্তিক অবস্থা থেকে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি—তথা রাষ্ট্রকে উদ্ধার করতে হলে ধর্মকে পুরো মর্যাদায় স্বীকৃতি দেয়া ও প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া আর যে কোন উপায় নেই, তা সকলে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারলেও মুখে স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। অথচ তারা কোন বিকল্প পন্থাও পেশ করতে পারছে না। নিছক অন্ধ-বিদ্বেষই যে এর একমাত্র কারণ তা বলা বাহুল্য। 'ধ্বংস হতে রাযী, কিন্তু সত্যকে সত্য বলে মেনে নিতে রাযী নই'—এমনি একগুঁয়েমিরই এটা অনিবার্য পরিণতি। এ কথা কি কেউ অস্বীকার করতে পারে?

মানুষের স্বভাবগত দুর্বলতা

মানুষ সাধারণত আবেগ (Sentiment) দ্বারা চালিত হয়ে থাকে। আবেগই মানুষের চালক ও নিয়ন্ত্রক—বুদ্ধি ও বিবেক নয়। যদিও যুক্তি এবং তত্ত্বের দিক দিয়ে বিবেক বুদ্ধিরই হওয়া উচিত মানুষের পরিচালক, পথের দিশারী; কিন্তু কার্যত বিবেক-বুদ্ধি এই আবেগের হাতে ক্রীড়নক হয়ে রয়েছে। আবেগ মানুষের একটা শক্তি। বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও সুষ্ঠুরূপে চালিত হলেই মানব-সমাজে কল্যাণ আসতে পারে। এর বিপরীত হলে—বিবেক-বুদ্ধি আবেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হলে—

www.pathagar.com

'ঘোড়াতে চড়িতে বিধি ঘোড়াকে চাড়াইল'র দশা হবে এবং তার ফলে চরম ধ্বংস ও বিপর্যয় নেমে আসবে, তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। খুব কম-সংখ্যক লোক এবং সমাজ আবেগকে নিয়ন্ত্রিত করতে ও বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হতে সক্ষম। বিবেক-বুদ্ধি হৃদয়াবেগের কাছে বারবার নতি স্বীকার করেছে, হৃদয়াবেগের সর্বোচ্চ মর্যাদা, গুরুত্ব ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে যুক্তি যুগিয়েছে। ফলে আবেগনিষ্ঠ-আচরণকে বুদ্ধি-বিবেকসম্মত আচরণ বলে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করা হয়েছে। প্রকৃত ব্যাপার যাই হোক না কেন, আবেগকে প্রাধান্য দিয়ে এবং বিবেক-বুদ্ধির বস্তুনিষ্ঠ সতর্কবাণী উপেক্ষা করে চলাকেই জরুরী মনে করা হয়েছে।

শেষ কথা

আমাদের মনে রাখতে হবে, মানুষ কোন যন্ত্র নয়। এখানে সুইচ অন্ করে দিলেই বাঞ্ছিত ফল লাভ করা সম্ভব হবে, এমন ধারণা করা বাতুলতা। বস্তুত আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো 'মানুষ' আমাদের আলোচনা ও গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু। মানুষকে 'যন্ত্র' মনে করে তার দ্বারা প্রকৃতি পরিপন্থী কোন কাজ করাতে চাইলে তা কোনদিনই সফল হতে পারে না। আর মানুষ কখনও 'মেশিনের' মতো কাজ করে না, করানো যায় না। মানুষ কার্যত তাকেই মানে, যাকে পূর্বেই সে স্ব-প্রেরণায় মেনে নিয়েছে। যা সে পূর্বেই স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে মেনে নেয়নি, কোন অকাট্য যুক্তি-প্রমাণও তাকে তা মানতে বাধ্য করতে পারে না। দুর্নীতি আর চোরাচালানকে যে লোক নিজ থেকেই অন্যায় ও ক্ষতিকর বলে মেনে নেয়নি, দেখামাত্র গুলী করা হবে—এ হুমকি শুনেও সে কাজ থেকে সে বিরত থাকতে প্রস্তুত হবে না। আর এর পক্ষে বা বিপক্ষে যত যুক্তি প্রমাণই দেয়া হোক, তা সে বুঝতে প্রস্তুত হবে না। এমনকি চোরাচালান ও কালোবাজারী বন্ধ করার দায়িত্বে নিযুক্ত কোন দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী সেনাবাহিনীর লোকও এই কাজে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে, বিচিত্র নয়। আর তাই যদি হয়, তাহলে তার চাইতে মারাত্মক ব্যাপার সে দেশের পক্ষে আর কি হতে পারে।

সেনাবাহিনীই একটা জাতির সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ শক্তি। কোন বিশেষ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সেনাবাহিনীর ব্যর্থতা জাতীয় ব্যর্থতারই নামান্তর। আর কোন ব্যর্থ জাতির দুনিয়ার বুকে টিকে থাকার অধিকারও থাকতে পারে না। যুক্তি-প্রামাণ আর কঠিন দন্ডের হুমকি কখনো 'সুইচ' হতে পারে না। অথচ সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে বারবার ব্যর্থতা সত্ত্বেও তাই মনে করা হয়েছে। এটাকে মানব জীবনের একটা মারাত্মক ট্রাজেডী ছাড়া আর কি-ই বা বলা যেতে পারে! দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং বিজ্ঞানের সর্বশেষ আবিষ্কার অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছে যে, মানব-চরিত্রে বাস্তবিক

www.pathagar.com

পক্ষে কোন পরিবর্তন আনতে হলে সর্বপ্রথম তার মনে বিশ্বাস জন্মাতে হবে। এ বিশ্বাস কেবলমাত্র ধর্মের সাহায্যেই সৃষ্টি করা সম্ভব। কেননা চরিত্র বা নৈতিকতা ধর্মবিশ্বাসেরই অনিবার্য প্রতিফলন, ধর্মভিত্তিক জীবন ও সমাজ ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ ফসল। বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে ধর্মকে অস্বীকার কিংবা উৎখাত করা অবৈজ্ঞানিক আচরণ। এ আরচণ চরিত্রহীনতা ও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়, আর এটা দুর্নীতিবাজ ও চরিত্রহীনদেরই কারসাজি মাত্র।

www.pathagar.com

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাচ্য প্রতীচ্যের শিষ্য। এ শিষ্যত্ব খুব বেশী দিনের নয়। কিন্তু অল্পদিনের শিষ্যত্বেও প্রাচ্য আধুনিকতাবাদের চরমে পৌছে গেছে। প্রাচ্য এখন পুরোপুরিযুক্তিবাদী—অন্তত নিজেদের সম্পর্কে তাদের তাই ধারণা। যুক্তিবাদী প্রাচ্যের সর্বশেষ মনোবৃত্তি হলোঃ

- ধর্ম ও নৈতিকতা প্রগতির পথের প্রধান অন্তরায়,
- বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-উদ্ভাবনই মানবীয় বিকাশের আসল অবদান,
- বস্তুবাদী মতাদর্শের ভিত্তিতেই জীবন ও জগতকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও মনোরম করে গড়ে তোলা যায়।

কিন্তু প্রাচ্যের গুরু প্রতীচ্য বা পাশ্চাত্য বর্তমানে এ মনোবৃত্তি ত্যাগ করেছে। তার মতে এসব উক্তি যুক্তিভিত্তিক নয়, যুক্তিবাদপ্রসূতও নয়। প্রতীচ্য এককালে সারা দুনিয়ায় এ ধরনের শ্লোগান প্রচার করেছিল, মুখরিত করে তুলেছিল পৃথিবীর আকাশ-বাতাস। তারাই বরং এসব মতাদর্শের হোতা, ধারক ও বাহক। সারা পৃথিবীর মানুষকে এ মন্ত্রে তারাই দীক্ষিত করেছিল। যুক্তিবাদের সর্বপ্লাবী বন্যার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়েছিল মানুষের স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনা, ধর্মবিশ্বাস, নৈতিকতা ও ন্যায়-অন্যায় বোধ। আধুনিকতাবাদ, যুক্তিবাদ ও বস্তুবাদ—এই ছিল তাদের চূড়ান্ত কথা। কিন্তু উত্তরকালে এই পথের সর্বোচ্চ শিখরে উঠে তারা যখন চতুর্দিকের সীমাহীন বিশালতার এবং নিজেদের পায়ের তলার দিকে তাকাল তখন তারা বুঝতে পারল, উদার, বিস্তীর্ণ মহাকাশ ও সীমাহীন দিগন্ত তাদের এ মনোবৃত্তির অনুকূল নয়। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল, পায়ের তলা থেকে পৃথিবী অনেক দূরে সরে গেছে। অন্ধ, দুরন্ত আবেগে মরীচিকার পেছনে ছুটতে ছুটতে তারা নিজেদেরকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলেছে, অথচ লক্ষ্যস্থলে পৌছা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তখন তাদেরই মুখ থেকে বের হতে লাগল নতুন সুর, নতুন কথাঃ

- চরিত্র সংশোধন না হলে বস্তুজগতের এই উন্নতিই আমাদেরকে ধ্বংস করবে;
- ধর্ম ও অধ্যাত্মবাদই মানুষকে প্রকৃত শান্তি, সুখ ও সমৃদ্ধি দিতে পারে, অন্য কিছু নয়;
- আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা নিতান্ত যুক্তিহীন, চরম নির্বুদ্ধিতার ব্যাপার,

www.pathagar.com

০ ধর্ম ও নৈতিকতার পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এইসব আবিষ্কার-উদ্ভাবনী জীবনকে কঠিন জাহান্নামে পরিণত করে দিয়েছে।

কিন্তু পাশ্চাত্য গুরুদের এ করুণ আর্তনাদ প্রাচ্যের শিষ্যদের কানে পৌঁছুচ্ছে না, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবার অবকাশও এদের নেই। তারা গুরুদের কাছ থেকে একবার যে মন্ত্র শিখেছিল, তাকে চূড়ান্ত মনে করে এমনভাবে ধরে আছে যে, তা ছাড়তে তারা প্রস্তুত নয়। পাশ্চাত্যের গুরুরাই—যারা একদিন এদের এই মন্ত্র দিয়েছিলেন—চীৎকার করে বলেছেন, 'ও মন্ত্র ত্যাগ কর' 'ও মন্ত্র মরে পচে গেছে', ওটা এখন আর জীবনদায়িনী—জীবন রক্ষাকারিণী নয়। ওটা বিস্ফোরণ-উন্মুখ মারাত্মক আনবিক বোমায় পরিণত হয়ে গেছে।

কিন্তু শিষ্যরা গুরুদের এ চীৎকার শুনে যথাসময় সতর্ক হতে রাযী নয়। মনে হয় তারা হিরোশিমা ও নাগাসাকি হতে প্রস্তুত, তবু মন্ত্রকে কিছুতেই ত্যাগ করতে রাযী নয়। তারা কিক্ দেয়া বলের মত তীব্র গতিতে ছুটে চলছে। একবার চিন্তা করেও দেখছে না,এই ছুটার পরিণতি কি? এখনও তারা সেই পুরনো পচা-গলা শ্লোগান দিয়ে যাচ্ছে, 'ধর্ম আর নৈতিকতাকে বাদ দাও, আর সেখানে দর্শন আর বিজ্ঞানকে শক্ত করে বসাও।'

কিন্তু চোখের সামনে বিষাক্ত জিনিস খেয়ে মানুষকে মরতে দেখেও যারা সে জিনিস খাওয়া ত্যাগ করে না—অন্যদের অভিজ্ঞতা ও নির্মম পরিণতি দেখেও যারা শিক্ষা গ্রহণ না করে দুরন্ত গতিতে সেই পরিণতির দিকেই ছুটে চলে, তাদের মতো নির্বোধ আর কে আছে। বস্তুত যুক্তিবাদের চরম যুক্তিহীনতা এটাই। এটাই বুদ্ধিবাদের চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা

কিন্তু কথা শুধু এতটুকুই নয়। যাঁরা এতদিনে চেতনা লাভ করেছেন, পাশ্চাত্যের এ চরম মূল্যের লব্ধ অভিজ্ঞতায় তাদের শিখবার অনেক কিছুই রয়েছে। এ থেকে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে পথ-নির্দেশ লাভ করতে হবে।

পাশ্চাত্যে যখন বস্তুগত উন্নতির মোহ ধর্ম ও নৈতিকতাকে সয়লাবের মত ভাসিয়ে নিয়েছিল, তখন বুদ্ধিজীবীরা তার প্রতিরোধের চেষ্টায় সম্পূর্ণ ভ্রান্ত পন্থা ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন এবং এভাবে তাঁরা আঘাতের পর আঘাত খাচ্ছিলেন। তখনই দেখা গেল আসল রোগ দূর হওয়ার পরিবর্তে অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়ে মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। বর্তমানে প্রাচ্যদেশসমূহেও যখন এই প্রলয়-মাতন শুরু হয়েছে। তখন পাশ্চাত্যের সে অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং পাশ্চাত্য যে ভুলের মাশুল দিয়েছে—যে জন্য কঠিন শাস্তি ভোগ করেছে, তা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে হবে। সে ভুলের পুনরাবৃত্তি যাতে না হতে পারে, সেজন্যে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

www.pathagar.com

কিন্তু সে ভুলগুলো কি? বস্তুবাদের প্রচন্ড ঝড়ের মুকাবিলা করা কিভাবে সম্ভব, তা আমাদের সবাইকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। অন্যথায় আমরা শুধু যে নিজেদের দায়িত্ব পালনেই অসমর্থ হব তা-ই নয়, আমরা নিজেদেরকেও তেমনি কঠিন প্রলয়ের মুখে ঠেলে দেব, যেমনি দিয়েছিল পাশ্চাত্য সমাজ।

বর্তমান পাশ্চাত্য তাদের মারাত্মক অবস্থাকে পুরোপুরি অনুধাবন করতে পেরেছে। আজ পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদরাই বলছেনঃ

'গোটা বিশ্বসমাজে আজ যে ধ্বংস নেমে এসেছে তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে মানুষের মধ্যে নিহিত আত্মিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের উৎকর্ষ সাধন এবং পুরোপুরি প্রয়োগ করতে হবে। নচেৎ এ ধ্বংসের হাত থেকে কিছুতেই রক্ষা পাওয়া যাবে না।

আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকুশলতা ও বুদ্ধিমত্তা ক্রমবিকাশের ধারাকে একটা লক্ষ্য—একটা দিগন্ত দান করেছে। মানুষই হচ্ছে জীবন-বিকাশের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। জীব-জগতে একমাত্র মানুষকেই জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক দেয়া হয়েছে। তার রয়েছে আত্মিক শক্তি, আর আধ্যাত্মিক বিশেষত্ব। কিন্তু এ মানুষই যদি তার আত্মার দাবিকে অগ্রাহ্য করে বিবেকের ডাকে সাড়া না দেয় এবং তার ধর্মের মহান শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে, তাহলে সে যে নিশ্চিত ধ্বংসে পতিত হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়েই পাশ্চাত্য দেশে এই চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। গোটা পাশ্চাত্যের আকাশে তখন উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা বোধের ঘনঘটা। এটা কোন বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল মানব চেতনার জাগৃতিরই পরিণতি। বিগত পঞ্চাশ বছরের যান্ত্রিক আবিষ্কার-উদ্ভাবনীই মানুষের চেতনাকে নিস্পন্দ ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দিয়েছিল।

বস্তুত সভ্যতার বস্তুবাদী দিকের দ্রুত উন্নতি মানুষের মনে একটা তীব্র আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। মানুষ প্রতিদিন একটা করে নতুন বৈজ্ঞানিক বিস্ময় দেখার আশায় উন্মুখ হয়ে থাকত। তাই মানুষের নিজেদের কঠিন সমস্যাবলীর সমাধান বের করার অবকাশ ছিল অত্যন্ত সীমিত।

১৮৮০ সন থেকে যে নিত্য-নতুন আবিষ্কার-উদ্ভাবনী নিরবচ্ছিন্নভাবে একের পর এক জনসমক্ষে উপস্থিত হচ্ছিল, তার চোখ ঝলসানো চাকচিক্যে ও যাদুস্পর্শে জনগণ যেন নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। শিশুরা যেমন প্রথমবার জাঁকজমকপূর্ণ সার্কাস দেখে এমনি মুগ্ধ ও হতবাক হয়ে যায় যে, তারা খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত ভুলে যায়। বিজ্ঞানের আবিষ্কার-উদ্ভাবনী দেখে সাধারণ মানুষের অবস্থাও ঠিক তা-ই হয়েছিল।

www.pathagar.com

এর ফল এই দাঁড়ালো যে, এই চমক লাগানো দৃশ্যই প্রকৃত সত্যের প্রতীক ও মানদন্ড হয়ে দাঁড়াল। আর এক নতুন চাঁদের আলোয় দিশেহারা হয়ে গিয়ে মানুষ জীবনের প্রকৃত মূল্যবোধ (Values) সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলল।

সমাজের সচেতন লোকেরা অবস্থার মারাত্মক অবনতি লক্ষ্য করে বিপদের সংকেতবাণী উচ্চারণ করতে শুরু করেন। তাঁরা সমাজের অন্যান্য চেতনাসম্পন্ন লোকদেরও এ অবস্থার মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করে দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও সমাজ সমষ্টিকে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হতে রক্ষা করা সম্ভব হলো না। কেননা সমাজে এক নতুন ধরনের প্রতিনিধিত্ব গড়ে উঠেছিল। আধুনিকতাবাদ—যা প্রকৃতপক্ষে ছিল বাহ্যিক চাকচিক্য পূজার ধর্ম—সমস্ত জনমানসকে মারাত্মকভাবে মোহাচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। অন্যদিকে সচেতন মন-মানস-সম্পন্ন লোকেরা প্রাচীনপন্থী রূপে অভিহিত ছিল। তারা সব মান্দাতার আমলের যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা ছাড়া কার্যত কিছুই করতে পারল না। আধুনিকতাবাদে দীক্ষিত সমাজ-মানস সমক্ষে সেসব অসময়ের রাগিণী রূপে চিহ্নিত হয়ে গেল। সেদিকে বিন্দুমাত্র আকর্ষণও জাগানো সম্ভবপর হলো না। অবস্থা অবর্ণনীয়ভাবে নাযুক হয়ে দাড়িয়েছিল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের তেজস্বী আলোকোচ্ছটায় ঝলসে যাওয়া মানুষ পরম বিশ্বাস ও ঐকান্তিক ভক্তি-শ্রদ্ধায় নির্নিমেষ নেত্রে তাকিয়ে দেখছিল। এ বিশ্বাসই অবচেতনভাবে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের নিত্যনব আবিষ্কার-উদ্ভাবনীর প্রতি প্রকৃত ঈমানে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। এরূপ অবস্থায় সচেতন বুদ্বিজীবী সমাজ নিছক পবিত্র চিরাচরিত যুক্তি আর দুর্বল আবেদন-আহবান নিয়ে জনতার সম্মুখে উপস্থিত হচ্ছিল। কিন্তু কোন লোকই তা পছন্দ করত না। অনেকেই তাকে নিতান্ত সেকেলে ও অর্থহীন বলে উড়িয়ে দিল। এভাবেই বস্তুবাদ গোটা মানব সমাজকে প্রভাবান্বিত ও সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেলেছিল। পাশ্চাত্য লোকদের দুর্বল ধর্ম-বিশ্বাস এই সর্বাধিক ভাঙ্গন ও বিপর্যয়কে রোধ করতে পারল না। ফলে চতুর্দিকে এক সর্বগ্রাসী নৈতিক বিপর্যয় দেখা দিল। সব মানুষই চরম প্রত্যয়হীনতার শিকার হয়ে পড়ল। তাদের মানসিক অশান্তি ও অস্থিরতা প্রকট হয়ে উঠল। হতাশা নৈরাশ্যের কুয়াশা গোটা সমাজ-মানসকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। পাশ্চাত্য ধর্ম এ পরিণতি প্রতিরোধের সর্বশেষ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হতে বাধ্য হয়েছে। অবশ্য তার মূলে আরও বহু কারণ নিহিত ছিল।

বাধ্যতামূলক শিক্ষ-ব্যবস্থা মানুষের বিবেক-বুদ্ধির সামনে নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। খুলে দিল তাদের জন্য নতুন নতুন প্রশস্ত রাজপথ। গলি-ঘুজিরও অভাব ছিল না সেখানে। কিন্তু সত্যিকার বিবেক-বুদ্ধির উন্মেষ সাধন না করেই মানুষ বুদ্ধিবাদ ও যুক্তিবাদের (Rationalism) শিল্পগত কর্মকুশলতা ও নব নব টেকনিক আয়ত্ত করে নিল। তারা ধোকায় পড়ে মনে করতে শুরু করল যে, এ সব

www.pathagar.com

কর্মকুশলতা ও টেকনিকের যথার্থ প্রয়োগ-পদ্ধতিও বুঝি তারা পুরোপুরি আয়ত্ত করে ফেলেছে! পরিণামে এক অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর অবস্থা দেখা দেয়। এ অবস্থা ক্রমে মানুষের বৈষয়িক ও বস্তুনিষ্ঠ জীবনের রূপটাকেও সম্পূর্ণ বদলে দিল, তাদের মনে সীমাহীন আশা-আকাঙ্খা জাগিয়ে দিল। বস্তুত যে ভক্তি-শ্রদ্ধা আবহমানকাল থেকে পাদ্রী, পুরোহিতদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, তাই ক্রমে উৎকর্ষ লাভ করে সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে আকৃষ্ট ও নিবেদিত হলো। যারা প্রাকৃতিক শক্তি কারায়ত্ত ও প্রাকৃতিক রহস্যের দ্বারোদ্‌ঘাটনে কিছুটা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল, তারাই জনগণের শ্রদ্ধা-ভক্তি, ভলোবাসা ও আনুগত্য পাওয়ার একমাত্র অধিকারী রূপে বিবেচিত হলো।

এভাবে বস্তুবাদ কেবল শিল্পোৎপাদনে দক্ষ লোকদের মধ্যেই নয় আপামর জনগনের মন-মগজেও প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করে বসল। বুদ্ধিবাদ আর যুক্তিবাদের এ সর্বাত্মক মহামারীর সার্থক প্রতিরোধের জন্যে প্রয়োজন ছিল যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগের শানিত হাতিয়ারকে কাজে লাগানো। প্রত্যয় ও দৃঢ়তা বিনষ্টকারী সন্দেহ, সংশয়, নড়বড়ে বিশ্বাস ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বস্তুবাদের সাথে যুদ্ধ করার এটাই হচ্ছে যথার্থ পন্থা। যে সংশয়বাদ নিতান্ত যুক্তিহীন, যা প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অনিবার্য পরিণাম নয়, তাকে প্রতিরোধ করার জন্যে এ পন্থা ছিল অপরিহার্য। শত্রুর উপর হাতিয়ার দিয়ে তারই ময়দানে যে হামলা করা যায়, তার সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

বস্তুবাদী ও ধর্মহীন লোকদের এই বিপর্যস্ত ও চরম অসুস্থতায় কাতর ও বিহবল অবস্থার কারণ কি? এর কারণ খুবই সূক্ষ্ম ও সুদূরপ্রসারী। যে সময়ের কথা উপরে আলোচিত হয়েছে, সে সময়ে বিজ্ঞান-বিকাশের ছিল সম্পূর্ণ শৈশবকাল। বিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণার সবেমাত্র সূচনা হয়েছিল। তখনো তা পরিপূর্ণতা লাভ করেনি, আসেনি গভীরতা ও ব্যাপকতা। এরূপ অবস্থায়ই মানুষের বিবেক-বুদ্ধি বিজ্ঞানের নামে—বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে—মানুষের আকীদা, ধর্মবিশ্বাস ও উন্নতমানের নৈতিক শিক্ষা-দীক্ষা সবকিছু নষ্ট করে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য ও মহান লক্ষ্যকে বরবাদ করে দিয়েছিল। অথচ এ সময় পর্যন্ত এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকে সমৃদ্ধ ও সুষ্ঠু সঠিক পথে পরিচালিত করে রেখেছিল। মানুষের জীবনকে দিয়ে আসছিল একটা সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য, মহান লক্ষ্য ও বিপুল কর্মপ্রেরণা। তখন মানুষের জীবন ছিল অর্থপূর্ণ, মহান উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত। চেষ্টা, সাধনা ও সংগ্রামের একটা সুস্পষ্ট কারণ নিহিত ছিল তাদের জীবন কেন্দ্রে। জীবন ও দুনিয়ার এ পারে তখন একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্য মানুষের সম্মুখে প্রতিভাত ছিল। সে লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার একটা প্রবল তাকীদ তারা অনুভব করত মর্মে মর্মে। সোজা কথায় তখন মানুষের একটা ধর্ম ছিল। কিন্তু বিজ্ঞানচর্চার সূচনাতেই এক শ্রেণীর লোকের বিবেক-বুদ্ধি এই

www.pathagar.com

বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে নিঃশেষে কেড়ে নিয়েছিল। মানুষকে বানিয়ে দিয়েছিল নিরেট ধর্মহীন,আদর্শহীন—এক কথায়, নিতান্ত পশু।

বস্তুত মানুষের সামনে সুস্পষ্ট কোন জীবনপথ যদি না থাকে, কোন উন্নতমানের জীবন আদর্শ—ধর্ম, নৈতিক দায়িত্ব ও জবাবদিহির বাধ্যবাধকতা থেকে তাকে যদি মুক্ত মনে করা হয়, ব্যক্তি মানুষকে যদি নিছক বস্তুগত পদার্থসমূহের রাসায়নিক সংমিশ্রণের একটা 'একক' মাত্র ধরে নেয়া হয়, আর সে যদি হয় একটা বস্তুর পর্যায়ভুক্ত, তাহলে 'নৈতিক মানুষের' (Man as a moral being) অস্তিত্ব কি করে সম্ভব হতে পারে? হতে পারে না, হয়ও নি, আর নৈতিক মানুষের সেখানে ঘটেছে অপমৃত্যু। 'মানুষ্যত্ব—মানুষের অধ্যাত্মকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। 'মানুষের' সব আশা–আকাঙ্খার দীপ চিরতরে নির্বাপিত হয়ে গেছে। এরূপ অবস্থায় উদ্দেশ্যহীনতা ও নিরর্থকতার ভয়াবহ অনুভূতির জ্বালায় প্রতিনিয়ত দগ্ধ হতে থাকাই তো মানুষের স্বাভাবিক ও অনিবার্য পরিণতি হতে পারে।

এরূপ অবস্থায়ই মানুষ ক্রমাগত নিশ্চিত ধ্বংসের দিক দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেল। বর্তমানে আণবিক শক্তির যথেষ্ট ব্যবহার ও প্রয়োগের কারণে মানুষ চিরতরে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। আজকের সচেতন মানুষ চূড়ান্ত প্রত্যয় লাভ করেছে। এক উন্নত নৈতিক চেতনা ও প্রবণতাই তাকে রক্ষা করতে পারে। মানুষের রক্ষা পাওয়ার একমাত্র কার্যকর উপায় এটাই। এছাড়া মানুষকে আর কোনকিছুই চূড়ান্ত ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারে না। সত্যিকথা হলো, মানুষ আজ নিজের শ্রমার্জিত ফসল—নিজের সৃষ্টি দ্বারা নিজেই ভীত ও সন্ত্রস্ত। মানুষের জীবনে এটা একটি নতুন ঘটনা—সম্পূর্ণ অভিনব ব্যাপার। তাই আজ মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে, আমরা কি ঠিক পথ বেছে নিয়েছি, –না আমাদের পথ বাছাই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত হয়েছে, ভুল ও মারাত্মক পথে আমরা অনেক—অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছি?

এরূপ অবস্থায় প্রশ্ন উঠে যে, যান্ত্রিক বিপ্লবের সাহায্যে মানুষ নিজের চতুষ্পার্শ্বে যে মৌলিক পরিবর্তন সাধন করেছে এবং এই পরিবর্তনের আলোকে নিজেদেরও পরিবর্তন করার যে চেষ্টা চালাচ্ছে তার সাথে তাদের নৈতিক জীবনেও পরিপূর্ণতা এসেছে কি? বস্তুত এসব পরিবর্তন তাদের জন্যে উন্নতি ও প্রগতির পথ উন্মুক্ত করেছে, না ধ্বংসের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে, এ প্রশ্নের জবাবের উপর তা নির্ভর করে। কেননা 'প্রকৃত উন্নতি' মানুষের নিজের পরিপূর্ণতার মধ্যেই নিহিত। মানুষ নিজের যে সব যন্ত্র ও কল–কারখানা নির্মাণ করে এবং চালায়, তাকে যতই নিপূণ ও উন্নতমানের তৈরী করুক না কেন, তার সাথে মানুষের ব্যক্তিগত উন্নতির কোন সম্পর্ক নেই। মানুষের দৈহিক, বৈষয়িক ও বস্তুগত উৎকর্ষ যত বেশীই হোক, তাতে তার আপন সত্তার উন্নতি বা সত্যিকার কল্যাণ হলো বলে মনে করার কোন কারণ নেই। যারা দৈহিক ও বস্তুগত

www.pathagar.com

উন্নতিকে মানুষের সত্যিকারের উন্নতি ও কল্যাণ বলে মনে করে, তারা বস্তুবাদী, বস্তুর অন্ধ–পূজারী। এরূপ ধারণা মনুষ্যত্বের অপমান। কারণ এতে মানবিক গুণাবলী ও উন্নতমানের বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করা হয়। অথচ এই বৈশিষ্ট্যই মানুষকে প্রকৃত শান্তি ও সুখী জীবনের নিরাপত্তা দানে সক্ষম। শুধু তাই নয়, মানবিক গুণাবলীর দৌলতে অর্জিত সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি জন্তু জানোয়ারের সুখ–সুবিধা থেকে অনেকগুণ বেশী এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এ দুটোকে এক ও অভিন্ন মনে করার মধ্যে কোন বিবেক–বুদ্ধির পরিচয় নেই।

বিবেক–বুদ্ধি ও যুক্তিবাদ মানুষের একটা মৌলিক বৈশিষ্ট—তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু নব্যযুগের বিজ্ঞান–গর্বী অর্বাচীনরা যে বুদ্ধিবাদে দীক্ষিত, তার চরম পরাকাষ্ঠা তো ইবলীস শয়তানই দেখিয়েছিল। এ ধরনের বুদ্ধিবাদ মানুষের নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের পরিপন্থী। এর দরুন প্রকৃত সুখ, শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চিন্ততা থাকে না। আজকের মানুষ বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও মেধার পূজায় এতদূর অগ্রগতি লাভ করেছে যে, তারা নিজেদেরকে জ্ঞান–বুদ্ধির নিরংকুশ অধিকারী বলেই মনে করতে শুরু করেছে। এককালে যে সব বস্তুগত মতবাদ ও মতাদর্শকে শাশ্বত মনে করা হতো, আজ তারা সে সবকে সম্পূর্ণ উল্টে দিতেও সংকোচ বোধ করছে না। তারা বিশ্বাস করে যে, মহাশূন্যে অপরিমেয় বিদ্যুৎকণা নিত্য আবর্তনশীল, তার বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা সম্পর্কে কল্পনা বা আন্দাজ করাও কঠিন, এই বিদ্যুৎকণা নিছক একটা অনুমান–প্রবাহ পর্যন্তই অ–বস্তু। নিউট্রন ও এন্টি–নিউট্রন–এর ন্যায় সূক্ষ্ম জিনিসও একটা সত্তার অধিকারী। আর বাহ্যদৃষ্টিতে বুদ্ধির অগম্য, চিন্তার উর্ধ্বে এ ধরনের জিনিসও বর্তমান রয়েছে। তা সত্ত্বেও তারা এক মহান অতি প্রাকৃতিক শক্তির অধিকারী (Supernatural power) আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের সম্ভাব্যতা মেনে নিতে প্রস্তুত হতে চাইছে না। অথচ সবকিছুর স্রষ্টা–নিয়ন্ত্রক আল্লাহ্‌কে স্বীকার না করলে বিজ্ঞানের বিরাট ব্যাপার আদৌ বোধগম্য হতে পারে না। তাদের এই অস্বীকৃতির ও একমাত্র এ কারণেই যে, তাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা পরীক্ষা–নিরীক্ষা তাদেরকে যে চিন্তার ছাঁচ দিয়েছে তা ঐ মহান সত্তার অস্তিত্বকে তাদের সামনে এনে দেখাতে অক্ষম। অথচ এ ছাঁচ যে একেবারে সীমাবদ্ধ এবং তাদেরই কল্পনাশক্তি অনুপাতে তৈরী তা তাদের অজানা নয়। তবু কেবল নিজেদের অক্ষমতা, সসীমতা ও সীমাবদ্ধতার কারণে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ধারণা করতে অক্ষম হয়েও তারা আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা দেখায়। বিবেক–বুদ্ধি ও যুক্তির ভিত্তিতেই সাধারণ বিবেক–বুদ্ধি (commonsense) যখন বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাকে নির্বুদ্ধিতা ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না। একেই বলে বুদ্ধিমান মানুষের নির্বুদ্ধিতা। যুক্তিবাদের নীতিতে চরম অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

www.pathagar.com

নিছক বিবেক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধ

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নিছক বিবেক-বুদ্ধি—যার কোন নৈতিক পটভূমি নেই—মানুষকে বিদ্বেষী ও সমালোচকে পরিণত করে অথবা অত্যন্ত হীন ও জঘন্য ধরনের ধ্যান-ধারণায় মানুষের মন ও মগজ ভর্তি করে দেয়। কিংবা মানুষকে তা এক জটিল পথে টেনে নিয়ে যায়। মধ্যযুগীয় গ্রীকদর্শন উদ্ভূত কালাম-শাস্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ববাদের অর্থহীন খেলায় মানুষকে এমনিভাবেই মাতিয়ে তোলা হয়েছিল। এ বিবেক-বুদ্ধি যখনই মনে করে বসে যে, আমি মাধ্যম নই—চরম লক্ষ্য (Not means but end) তখনি তা সব মূল্য ও অর্থ সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলে। রূপ ও সৌন্দর্যপ্রিয়তাও মানুষের দ্বারা জঘন্য রকমের নগ্নতা ও বিকৃতি ঘটাতে এবং মানুষকে পাশবিকতায় পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারে। পরিণামে এটা তাকে মানবতা ও মনুষ্যত্বের সব মহান মূল্যবোধেরও চরম বিদ্রোহী করে তুলতে পারে। মানুষের তৎপরতা যাই হোক এক উন্নত ভবিতব্য ও উচ্চতর নিয়তির (Destiny) কথা কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয়। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাহায্যে আজ মানুষ যে গৌরবময় মর্যাদা অর্জন করেছে, তা তাকে সব সময় মানুষ থেকেই বাঁচিয়ে রাখার কাজে নিয়োজিত থাকা উচিত। মানুষের প্রকৃতি নিহিত পাশবিকতার সাথে সংগ্রামের নামই জীবন-সংগ্রাম নয়। এসব স্বোপার্জিত বদঅভ্যাস ও মন্দ স্বভাবের সাথে নিরবচ্ছিন্ন লড়াই করাও জীবন সংগ্রামের অন্তর্ভুক্ত। এই সব কুসংস্কার ও বদ-স্বভাব তাদের ঐতিহ্য থেকেই এসে থাক বা তাদের রুগ্ন মন-মগজের অপসৃষ্টি হোক, তার বিরুদ্ধে সব শক্তি নিয়োগ করে লড়াই করে যাওয়াও মানুষের কর্তব্যের শামিল। অন্য কথায়, মানুষের নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক এবং তার কার্যকলাপ তার এ সংগ্রাম-জীবনকে কিছুমাত্র সুসংহত করেনি বরং আরো বেশী জটিল ও বন্ধুর করে দিয়েছে। মানুষের আবিষ্কার-উদ্ভাবনী জীবনের অবস্থা ও গতিতে গুণগত ও রূপগত বিপ্লব সৃষ্টি করেছে সত্য; কিন্তু যারা এ সব আবিষ্কার-উদ্ভাবনীর কল্যাণ ভোগ করার সুযোগ এখনো পায়নি, এ বিপ্লবের পরিণতি তাদের জীবনকেও তোলপাড় না করে ছাড়েনি। সে সব আবিষ্কার-উদ্ভাবন সভ্যতার আলোকবঞ্চিত এইসব মানুষকে, জাতিকে ভ্রান্ত পথে সুসভ্য হওয়ার অহমিকাগ্রস্ত করে দিয়েছে। তাদের মনেও দুরাশা বাসা বেঁধেছে। এরাও নিজেদেরকে সুসভ্য মনে করে এ কালের প্রকৃত সভ্যতা-প্রাপ্ত লোকদের অন্ধ অনুসরণে আল্লাহকে মহান নৈতিক মূল্যবোধ অস্বীকার করেছে। এটা যে কতখানি হাস্যকর, কতখানি লজ্জাজনক, তা বোঝবার মত কান্ডজ্ঞানও এরা হারিয়ে ফেলেছে। এসব আমাদের কল্পিত, মনগড়া বা নিতান্ত অমূলক কথা নয়। পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানের দিকপাল, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ, লীকোমটে ডুমায়ী তাঁর 'Human-Destiny'— 'মানুষের ভাগ্য' নামক গ্রন্থে এইসব বলেছেন বিস্তারিতভাবে।

www.pathagar.com

ধর্মবিরোধী যুক্তিবাদ

ধর্ম যুক্তির ভিত্তিতে টেকে না, এই হচ্ছে এ কালের এক শ্রেণীর বিদ্যাভিমানী লোকের অভিযোগ। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তাদের এ অভিযোগটি নিতান্ত যুক্তি-পদ্ধতি পর্যায়ের। এদের দাবি হলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি সত্য-জ্ঞান লাভের যে উন্নত পন্থা ও পদ্ধতি নির্দেশ করেছে, ধর্মের দাবি ও ধর্মীয় আকীদা বিশ্বাস তার কষ্টিপাথরে উত্তীর্ণ নয়। কিন্তু আধুনিক উৎকর্ষলব্ধ জ্ঞান-অর্জন পদ্ধতিটা কি? — তা হচ্ছে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও হাতে কলমে পরীক্ষণের (observation and experiment) মাধ্যমে সত্য জানতে চেষ্টা করা। কিন্তু ধর্মের আকীদা বিশ্বাসসমূহ অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্পর্কিত। সব পর্যবেক্ষণে তা ধরা পড়ে না। তা বাস্তব পরীক্ষণের আওতাভুক্তও নয়। এই কারণে ধর্মের যুক্তিবিন্যাস একান্তই ধারণা-অনুমানমূলক ও আরোহী পদ্ধতি (inductive method) ভিত্তিক। অতএব তা অপ্রকৃত,তার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

বিজ্ঞানী হওয়ার দাবিদারদের এ অভিযোগের বিশ্লেষণ স্বরূপ বলা হয়, আল্লাহ্-বিশ্বাসই হচ্ছে ধর্মবিশ্বাসের মূল ও প্রধান ভিত্তি। কিন্তু আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে কেউই স্বয়ং আল্লাহ্কে চোখের সামনে উপস্থিত করে না। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও আল্লাহ্কে দেখা যায় না—কেউ তা দেখিয়ে দিতে পারে না। তার পরিবর্তে কেবলমাত্র যুক্তির ভিত্তিতেই আল্লাহ্কে প্রমাণ করতে চেষ্টা করা হয়। বলা হয়, বিশ্বলোকের অস্তিত্ব ও নিয়ম-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা এবং তাই অন্তর্নিহিত তাৎপর্য প্রমাণ করে যে, এ সবের অন্তরালে আল্লাহ্ বা 'আল্লাহ্র মন' অবশ্যই বর্তমান। এরূপ যুক্তিবিন্যাসে সরাসরি আল্লাহ্ প্রমাণিত হন না। তাতে বড় জোর এমন একটা নিদর্শন মাত্র পাওয়া যায়, যার বিশ্লেষণের পরিণতি বা সিদ্ধান্তস্বরূপ আল্লাহ্কে মেনে নিতে হয়।

ধর্মের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ মূলত ভিত্তিহীন। আধুনিক বিশ্ব পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ও যুক্তি-বিশ্লেষণের ধারা এ কথা বলে না যে, যে বস্তু সরাসরি আমাদের পরীক্ষণ আওতাভুক্ত কেবলমাত্র তা-ই সত্য ও বাস্তব। বরং বাস্তব পরীক্ষণ আওতাভুক্ত 'বস্তু'র ভিত্তিতে যে বৈজ্ঞানিক ধারণা অনুমান গড়ে উঠে তাও বাস্তব পরীক্ষালব্ধ সত্যের মতই সত্য বলে প্রতীয়মান। পরীক্ষণ নিছক পরীক্ষণই, এটা নির্ভুল নয়। আবার ধারণা ও অনুমান কেবল কল্পনা বলেই ভুল ও গ্রহণের অযোগ্য—এ কথাও সত্য নয়। ভুল ও নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা উভয় ক্ষেত্রেই সমান।

www.pathagar.com

আগের কালে জাহাজ নির্মিত হতো কাঠ দিয়ে। কেননা পানির অপেক্ষা কম ওজনের 'বস্তু'ই পানির উপর ভাসতে পারে বলে তখন সাধারণ ধারণা ছিল। উত্তরকালে লৌহনির্মিত জাহাজও কাষ্ঠনির্মিত জাহাজের মতোই পানিতে ভাসতে পারে বলে দাবি করা হলে তা প্রথমে অগ্রাহ্য হলো। একমাত্র যুক্তি হিসাবে বলা হলো যে, পানি অপেক্ষা লোহার ওজন বেশী বলে তার পক্ষে পানির উপর ভাসা সম্ভব নয়। জনৈক লৌহকার তখনই একখন্ড লোহা পানির টবের উপর ছেড়ে দিয়ে দেখিয়ে দিল যে, তা ভাসেনি, নিমিষের মধ্যে তলিয়ে গেছে টবের তলায়। এ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হলো যে, লোহা পানিতে ভাসে না। আর সে জ্ঞান 'বাস্তব পরীক্ষণের' সাহায্যেই লাভ করা গেল। এটা যে বস্তুতই একটা বাস্তব পরীক্ষণলব্ধ জ্ঞান, তা কেউ অস্বীকার করতে পারে কি? কিন্তু এই পরীক্ষা চূড়ান্ত ও প্রকৃত ব্যাপারের দৃষ্টিতে মোটেই নির্ভুল ছিল না। কেননা তখন লোহার নৌকা বানিয়ে পানির উপর ছেড়ে দিলে দেখা যেত, লোহাও ভাসে। আর লৌহ নির্মিত জাহাজও সমুদ্রে ভাসতে ও চলাচল করতে পারে বলে যে দাবি করা হয়েছে তা বাস্তব সত্য।

বহির্বিশ্বলোক অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণেও এই ধরনের ব্যাপারই ঘটেছে। শুরুতে কম শক্তিসম্পন্ন দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা আকাশমন্ডল পর্যবেক্ষণ করা হলে বিস্তীর্ণ আলোকমালার মতো দেখতে বহুসংখ্যাক অবয়ব গোচরীভূত হলো। এই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে একটা মতবাদ গড়ে তোলা হলো এবং বলা হলো যে, এগুলো হচ্ছে গ্যাসের মেঘ। তারকা হওয়ার পূর্বে এ অবস্থাই অতিক্রম করতে হয়েছে আকাশলোকের সব তারকাকে। কিন্তু পরবর্তীকালে অধিক দূরপাল্লার দূরবীক্ষণ তৈরী এবং তার সাহায্যে নতুন করে সে সব অবয়ব পর্যবেক্ষণ করা হলে দেখা গেল যে, প্রথমে যা জ্যোতির্ময় মেঘমালা রূপে গোচরীভূত হচ্ছিল, আসলে সেগুলো অসংখ্য তারকাপুঞ্জ। অস্বাভাবিক ও ধারণা–কল্পনা করা যায় না এমন দূরত্বের কারণে এগুলো ইতিপূর্বে মেঘমালার মতো দেখাচ্ছিল।

এ থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো যে, নিছক পর্যবেক্ষণ ও বাস্তব পরীক্ষণই নির্ভুল জ্ঞানলাভের নির্ভরযোগ্য ও নিশ্চিত পন্থা নয়। সেইসঙ্গে এ কথাও অনস্বীকার্য যে, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে যা অর্জিত হয়, একমাত্র তাই যথার্থ জ্ঞান নয়?

আধুনিক যুগে এমন অনেক যন্ত্রপাতি ও উপায়–পন্থা উদ্ভাবন করা হয়েছে যাদের সাহায্যে ব্যাপক পরীক্ষণ কার্য চালানো ও পর্যবেক্ষণ সম্ভব, এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু এ সব যন্ত্রপাতি ও উপায়–পন্থা যে সব জিনিস ও জ্ঞানতথ্য আমাদের পরীক্ষণ কার্য চালাবার সুযোগ দিচ্ছে, তা নিতান্ত বাহ্যিক এবং অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। এ সব পরীক্ষা নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে যে সব মতবাদ গড়ে তোলা হয়, তা সবই অদৃষ্টিগোচর। তার কোন একটাও চর্মচক্ষে দেখা যায় না। আর মতবাদের

www.pathagar.com

দিক বিচার করলে বলতে হয় যে, আসলে কতিপয় পর্যবেক্ষণের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণেরই নাম হলো বিজ্ঞান (science), বিজ্ঞানের গোটা প্রাসাদ একই ভিত্তিতে রচিত। অন্য কথায় রচিত মতাদর্শসমূহ এমন নয় যে, তা আমাদের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মানদন্ডে উত্তীর্ণ হয়েছে। বরং আসল ব্যাপার হলো, কতিপয় পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ ভিন্নতর কোন মহাসত্য মেনে নিতে বিজ্ঞানীদের বাধ্য করেছে, যদিও সেই মূল সত্যটি পর্যবেক্ষণের আড়ালেই রয়ে গেছে এবং তা পর্যবেক্ষিত হয়নি। ফোর্স (force), এ্যানার্জি (energy), ন্যাচার (nature), প্রাকৃতিক নিয়ম (low of nature) প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার না করে কোন বিজ্ঞানী—এমনকি কোন জড়বাদীও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা কথাও বলতে পারে না। কন্তি এই ফোর্স, এ্যানার্জি, ন্যাচার কি, তা কোন বিজ্ঞানীও জানে না, বলতে পারে না। বিজ্ঞানীরা যা কিছু করতে পারে, তা হচ্ছে কতগুলো জানা ঘটনা ও প্রকাশমান ব্যাপারের অজানা ও পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য 'কারণ' বুঝাবার জন্যে কতিপয় ব্যাখ্যামূলক শব্দ ও পরিভাষা রচনা করা মাত্র। অথচ সেগুলোর তাৎপর্যগত সত্যতার ব্যাখ্যাদানে প্রত্যেক বিজ্ঞানী তেমনি অক্ষম, যেমনি ধর্মবিশ্বাসীরা অক্ষম আল্লাহ্র প্রকৃত সত্তার বিশ্লেষণ করতে এবং তাঁর অন্তর্নিহিত রূপ ও গুণ ব্যাখ্যা করে বলতে। উভয়ই নিজ নিজ স্থানে এক অজানা বিশ্বলোক-কার্যকারণের উপর না দেখা বিশ্বাস স্থাপন করে বসে আছে। ডঃ আলেকসিস ক্যারল বলেন, 'গাণিতিক জগৎ ধারণা অনুমান ও মনে করে নেয়া বা ধরে নেয়া কতগুলো কথার (প্রকল্পের) চমৎকার জাল মাত্র। এতে নিদর্শনের সমতা বা সাদৃশ্য (equations of symbols) সম্বলিত বর্ণনা-অযোগ্য (abstractions) বা নির্বস্তুক গুণবাচক শব্দ ছাড়া আর কিছুই নেই।'

—Man the Unknown, p. 15

বিজ্ঞানের সাহায্যে যতটুকু আমাদের অভিজ্ঞতায় আসে প্রকৃত সত্য মাত্র ততটুকুই স্বয়ং বিজ্ঞানও এমন দাবি কখনও করেনি। এরূপ দাবি করা তার পক্ষে সম্ভবও নয়। পানি একটা তরল ও প্রবহক্ষম বস্তু। আমরা সরাসরি আমাদের চর্মচক্ষেই তা দেখতে পারি। কিন্তু এই পানির প্রতিটি বিন্দু (molecule) হাইড্রোজেন-এর দুটি অণু ও অক্সিজেন-এর একটি অণূ সমন্বিত। অথচ তা আমাদের চর্মচক্ষে দেখতে পারিনে। অণুবীক্ষণ দ্বারাও তা দেখা যায় না। তা জানা যায় কেবলমাত্র যুক্তিবিন্যাস পদ্ধতিতে। বিজ্ঞান এ দুটো ব্যাপারকে সমানভাবে বাস্তব বলে স্বীকার করে নিয়েছে। সাধারণ দৃশ্যমান পানিও যেমন বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সত্য, পানির বিশ্লেষণমূলক সত্তাও তার নিকট এক স্বীকৃত সত্য, অথচ তা পর্যবেক্ষণযোগ্য নয়। কেবলমাত্র ধারণা-অনুমানের ভিত্তিতেই এই তত্ত্ব জানা গিয়েছে। তা সত্ত্বেও এই সত্য চূড়ান্তরূপে স্বীকৃত সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীদের নিকট। জ্ঞান জগতের অন্যান্য সত্যের ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার। এ· ই· ম্যান্ডার (A. E. Mander) বলেছেন, 'যে সব সত্য আমরা সরাসরি ইন্দ্রিয়ের

www.pathagar.com

সাহায্যে জানতে পারি, তা ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া সত্য (perceived facts)। কিন্তু যেসব সত্য আমরা কেবল জানতে পারি, তা এই 'ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানা সত্য' পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। এ ছাড়া আরও এমন বহু সত্য রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করতে না পারলেও আমরা জানতে পারি। এ জানার উপায় হলো অনুমিতিলব্ধ সত্য। এ উপায়ে যে সব সত্য জানা যাবে, তাকে অনুমিতিজাত জ্ঞান বা inferred facts বলা যায়। এখানে বিশেষভাবে এ কথা বুঝে নেয়া আবশ্যক যে, এই দু'ধরনের সূত্র বা উপায় লব্ধ জ্ঞান বা জানার মধ্যে আমরা 'মূল সত্য'কে জানি— জানতে পারি, আর দ্বিতীয় উপায়ে আমরা 'তার সম্পর্কে' জানতে পারি। আসল ব্যাপার কিন্তু সম্পূর্ণ অভিন্ন—মূল সত্য সর্বাবস্থায় অগোচরীভূত, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তা সত্ত্বেও তা সত্য। আমরা তাকে সরাসরি ও প্রত্যক্ষ উপায়ে জানি কিংবা অনুমানমূলক পদ্ধতিতে জানি (এটা সম্পূর্ণ আমাদের ব্যাপার)।' —Clearer Thinking, London, 1949, p. 49

তিনি আরও বলেন, 'বিশ্বলোকে যে সব সত্য বর্তমান, তার মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক জিনিস আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানতে পারি। এ ছাড়া আর যে সব জিনিস রয়েছে, সে সব আমরা কি উপায়ে জানতে পারি? তার উপায় হচ্ছে অনুমিতি (inference) বা বিচার-বুদ্ধি-বিবেচনা শক্তি ও যুক্তি-প্রমাণ (reasoning) উপস্থাপন। অনুমিতি ও যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনও একটা চিন্তা পদ্ধতি বা জ্ঞান লাভের উৎস ও সূত্র। এ পদ্ধতিতে আমরা কতিপয় জানা ঘটনা থেকে শুরু করে শেষ পর্যায়ে পৌঁছে এই 'বিশ্বাস' প্রচার করি যে, এখানে অমুক সত্য নিহিত রয়েছে, যদিও সেই আসল জিনিসটি ইতিপূর্বে আদৌ দেখা যায়নি।'

ভূ-গর্ভে অবস্থিত যে তেল, কয়লা ইত্যাদি খনিজ দ্রব্য বের করার চেষ্টা চলছে তা কি তেল বা খনিজ পদার্থ প্রত্যক্ষভাবে দেখে? কখ্খনও নয়। তেলকে মাটির গভীরে গিয়ে নিজ চক্ষে কেউ দেখে আসেনি। এর পশ্চাতেও রয়েছে এই জ্ঞান-পদ্ধতি। প্রথমে অনুমিতি (inference), ভৌগোলিক অবস্থান এবং মৃত্তিকা পরীক্ষার ফলে ধারণা করা হয় যে,এর তলদেশে তেল থাকতে পারে। এটা তো আমাদের দেশেও এবং দুনিয়ার সর্বত্র নিত্য সংঘটিত ঘটনা বিশেষ।

এখানে একটা প্রশ্ন করা যেতে পারে, তার জবাবটাও এখানেই রাখা দরকার। প্রশ্নটি হলো, প্রকৃত সত্যকে জানবার জন্যে বিবেক-বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনা ও যুক্তিবিন্যাসকে কি করে নির্ভুল পন্থা বা পদ্ধতি মনে করা যেতে পারে? যে জিনিস আমরা আমাদের চর্মচক্ষে দেখিনি, যার অস্তিত্ব সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমাদের কোন অভিজ্ঞতা লাভ হয়নি এবং যার বাস্তবতা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মানদন্ডে আমরা কখনও যাচাই করেও দেখিনি, কেবল মাত্র যুক্তি ও বিবেক-বুদ্ধির তাকীদে সেই জিনিসকে

www.pathagar.com

আমরা কি করে বাস্তব ও সত্য বলে মেনে নিতে পারি? ম্যাভার-এর ভাষায় এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছেঃ The reasoning process is valid because the universe of facts is rational.

অর্থাৎ যুক্তিবাদভিত্তিক অনুমিতি ও বিচার-বিবেচনাজাত সিদ্ধান্তের সাহায্যে প্রকৃত সত্যকে জানার যে পদ্ধতি, তা নিঃসন্দেহে নির্ভুল ও যথার্থ। কেননা গোটা বিশ্বলোকই যুক্তি ও বিচার-বুদ্ধিমূলক। বাস্তব জগৎ একটা সামঞ্জস্যসম্পন্ন সমগ্র (whole)। বিশ্বলোকের সব সত্যই পরস্পরের সাথে সামঞ্জস্যশীল। এই সবের মাঝে একটা ব্যাপক ও সর্বাত্মক নিয়ম-শৃঙ্খলা, সুসংবদ্ধতা ও নিয়মানুবর্তিতা বিদ্যমান। কাজেই ঘটনাবলীর সামঞ্জস্য ও তার অনুপাত যে অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয় না, তা কখ্খনই নির্ভুল হতে পারে না। এ কথা বলে ম্যাভার বলেছেন, 'দৃশমান জগৎ প্রকৃত সত্যের কতিপয় বিচ্ছিন্ন অংশ (patches of facts) মাত্র। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা যা কিছু জানি, তা সবই আংশিক, অসংবদ্ধ ও জোড়াতালী দেয়া ঘটনাবলী মাত্র। বিচ্ছিন্নভাবে শুধু সেগুলো দেখলে তা নিতান্ত অর্থহীন মনে হবে। সরাসরি ও প্রত্যক্ষভাবে গোচরীভূত ঘটনাবলীর সাথে আরও অনেকগুলো অইন্দ্রিয়গোচর ঘটনাকে একত্রিত করে দেখলেই আমরা সেগুলোর তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারি।

এর পর ম্যাভার একটা সহজ-সরল দৃষ্টান্ত দিয়ে এই তত্ত্ব কথাটা বোঝাতে চেয়েছেন। দৃষ্টান্তটি এই, 'আমরা দেখতে পাই, একটা পাখি মরে গেলে ধপাস করে মাটিতে পড়ে যায়। একটা প্রস্তর ভূ-পৃষ্ঠের উপর থেকে উর্ধ্বে তুলতে শক্তি ব্যয় হয়। চন্দ্র আকাশে আবর্তিত হচ্ছে। পর্বতচূড়া থেকে নীচের দিকে নেমে আসার তুলনায় শীর্ষে আরোহণ অধিক কষ্টসাধ্য। এই ধরনের অসংখ্য দৃষ্টিগোচর ঘটনা আমাদের সামনে নিত্য সংঘটিত হচ্ছে। অথচ এ সবের মাঝে বাহ্যত কোন পারস্পরিক সম্পর্ক নেই। অতঃপর একটা অনুমান ও সিদ্ধান্তমূলক সত্য (Inferred fact) উদ্‌ঘাটিত হয়। তাহল মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম-শৃঙ্খলা (gravitational law)। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সব বিচ্ছিন্নভাবে দেখা ব্যাপার এই অনুমানমূলক সত্যের সাথে মিলে পরস্পর সুসংবদ্ধ হয়ে যায়। এভাবে সর্বপ্রথম আমরা জানতে পারি যে, বিচ্ছিন্নভাবে দেখা এ ঘটনাবলীর মাঝে শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, সামঞ্জস্য ও পরিপূরকতা বিদ্যমান। ইন্দ্রিয়গোচর ঘটনাবলীকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে সেগুলো শৃঙ্খলাহীন, অবিন্যস্ত, অসংবদ্ধ ও পরস্পর সম্পর্কহীন মনে হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়গোচর ঘটনাবলী এবং অনুমান-সিদ্ধান্তমূলক সত্য,—এই দুটোকে একত্রিত করে দেখলে তা সুসংবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করে।' —ঐ, পৃষ্ঠা ৫১

৭—

www.pathagar.com

এই দৃষ্টান্তমূলক বিশ্লেষণে মাধ্যাকর্ষণ বিধান একটা সর্বজনস্বীকৃত বৈজ্ঞানিক সত্য ও অমোঘ বাস্তবতা। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা অগোচরীভূত, কখনই চোখে দেখা যায় না। শুধু অনুভব করা যায় এবং এই অনুভূতিলব্ধ সত্য হিসেবেই তার বাস্তবতা স্বীকার করে নিতে হয়। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা যা কিছু দেখাচ্ছে বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে তা সেই আসল মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বা নিয়মটির মূল সত্তা নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। আর এই ভিন্ন জিনিসগুলোর যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণের ফল হিসেবে তারা স্বীকার করতে ও মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে যে, এখানে এমন একটা 'জিনিস' আছে, যাকে আমরা 'মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম' বলে অভিহিত করতে পারি।

মাধ্যাকর্ষণের নিয়মটি এ যুগে বৈজ্ঞানিক সত্য ও অকাট্য বাস্তবরূপে সারা দুনিয়ায় স্বীকৃত। নিউটন সর্বপ্রথম এটির কথা বলেছেন।—বলা যেতে পারে আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু একান্ত বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার দৃষ্টিতে এর বাস্তবতা কতখানি? খোদ নিউটনের মুখেই তার জবাবটা শুনে নিন। তিনি বেন্টলিকে লেখা চিঠিতে লিখেছিলেন—'নিষ্প্রাণ ও চেতনাহীন 'বস্তু' কোন মধ্যবর্তী মাধ্যম ছাড়াই অন্য এক 'বস্তু'র উপর প্রভাব বিস্তার করছে। অথচ এ দুটোর মধ্যে কোন পারস্পরিক সম্পর্ক নেই।'

এমন একটা দুর্বোধ্য ও পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য 'জিনিস' আজ অবিসংবাদিত বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে বিশ্ব-জনের নিকট সাধারণভাবে স্বীকৃতি পাচ্ছে এবং এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা বলে মেনে নেয়া হচ্ছে। কিন্তু কেন,—কি করে তা সম্ভব হলো? তা হচ্ছে শুধু এজন্যে যে, এ সত্যকে মেনে নিলেই তার ভিত্তিতে আমাদের কতিপয় পর্যবেক্ষণের ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হয়। আর মেনে না নিলে আমাদের পর্যবেক্ষণসমূহ একেবারেই অর্থহীন ও তাৎপর্য শূন্য হয়ে দাঁড়ায়। এ ছাড়া এর মূলে অন্য কোন কারণই নিহিত নেই। তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কোন একটা জিনিসের সত্য ও বাস্তব রূপে স্বীকৃতি লাভের জন্যে সেই জিনিসটির সরাসরি আমাদের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার আওতার মধ্যে আসার কোনই প্রয়োজন নেই। বরং সেই অদৃশ্য বিশ্বাসও অনুরূপ মাত্রার একটা বাস্তব সত্য, যার সাহায্যে আমরা বিভিন্ন পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান তথ্যকে আমাদের মনে সুসংবদ্ধ করে নিতে পারি এবং যা জানা ঘটনাবলীর নিগুঢ় তাৎপর্য ও সার্থকতা আমাদের নিকট সুস্পষ্ট করে তুলতে পারে।

ম্যান্ডার বলেছেন, 'আমরা একটা সত্য জানতে পেরেছি'—এরূপ বলার অর্থ এই যে, আমরা তার তাৎপর্য (meaning) জেনে গিয়েছি। কথাটি এভাবেও বলা যায়ঃ আমরা কোন জিনিসের অস্তিত্ব ও বাস্তবতার কারণ এবং অবস্থাসমূহ জেনে নিয়ে তার ব্যাখ্যা করি-। আমাদের বেশীর ভাগ প্রত্যয়ের (beliefs) স্বরূপ এমনিই। আসলে

www.pathagar.com

সেগুলো পর্যবেক্ষণসমূহের ব্যাখ্যা বা বর্ণনা (statetement of observation) মাত্র'।

এ আলোচনা শেষ করে ম্যাভার 'পর্যবেক্ষিত সত্য' (observed facts) পর্যায়ে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'আমরা যখন কোন পর্যবেক্ষণের (observation) কথা উল্লেখ করি, তখন আমরা নিছক ইন্দ্রিয়গত পর্যবেক্ষণ থেকে বেশী কিছু বুঝাতে চাই। এরূপ বলার অর্থ ইন্দ্রিয়গত পর্যবেক্ষণ ও সেইসঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচিতি (recognition) চেনা বা সনাক্তকরণও হয়ে থাকে। তাতে ব্যাখ্যার অংশটিও শামিলরয়েছে। —Works of W. Bantly, iii, p. 221

বস্তুতঃ এ একটা পদ্ধতির ভিত্তিতেই 'আঙ্গিক ও দৈহিক ক্রমবিকাশ তত্ত্ব' (Organic Evolution) একটা প্রকৃত সত্যরূপে—বিজ্ঞানীদের নিকট সর্ববাদীসম্মত সত্যরূপে পরিগৃহীত। ম্যাভার-এর কথায় এ তত্ত্ব বর্তমানে এত যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত যে, একে 'প্রায় নিশ্চিত সত্য' (approximate certainity) বলা যেতে পারে (Clearer Thinking. p.113)। জি জি সিম্প্সন্ (G. G. Simpson)-এর ভাষায়, ক্রমবিকাশ তত্ত্ব একটি সর্বশেষ ও সর্বাত্মকভাবে প্রমাণিত সত্য,নিছক ধারণা বা অনুমান কিংবা বিকল্পরূপে মেনে নেয়া নয়, যা বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ চালাবার জন্যে গড়ে তোলা হয়। (Meaning of Evolution, p. 127) এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার (১৯৫৮ ইং) প্রবন্ধ রচয়িতা প্রাণীকুলের ক্রমবিকাশকে একটা সত্য (truth) রূপে মেনে নিয়েছিলেন এবং বলেছেন, ডারউইনের এ মতাদর্শ বিজ্ঞানবিদ ও সুধীমন্ডলীর নিকট স্বীকৃতিও (general acceptance) লাভ করেছে। লুল (R. S. Lull) লিখেছেন, ডারউইনের পর থেকে ক্রমবিকাশ তত্ত্ব ক্রমশ স্বীকৃতি অর্জন করে এসেছে। এমনকি একালে চিন্তাশীল ও জ্ঞানী লোকদের মনে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ অবশিষ্ট নেই। কেননা এটাই একটি যুক্তিমূলক পদ্ধতি, যার ভিত্তিতে সৃষ্টি কার্যক্রমের ব্যাখ্যা দান ও তার অনুধাবন সম্ভবপর। —Organic Evolution. p. 15

বিজ্ঞানীদের নিকট সর্ববাদী সম্মত এই মতটি কিভাবে গড়ে উঠল? কেউ কি নিজ চক্ষে প্রাণীকুলকে ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন লাভ করতে দেখতে পেয়েছেন, না কেউ তার বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এই কথাটি নিশ্চিতরূপে জানতে পেরেছে? তা নয়, এবং নয় যে সে কথা সব বিজ্ঞানীই স্বীকার করেন এবং দুনিয়ার 'ইন্টেলেকচুয়ালরা তা নিঃসন্দেহে জানেন। তাঁরা এও জানেন যে, এইরূপ আঙ্গিক বিবর্তন সংঘটিত হতে চর্মচক্ষে দেখতে পাওয়া কিংবা লেবরেটরীতে বা অন্য কোথাও তার বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা কোন ক্রমেই চালানো যেতে পারে না। ক্রমবিবর্তনের কল্পিত কার্যক্রম এতই দূর অতীতকালের সাথে সংশ্লিষ্ট যে, তা দেখতে পাওয়া বা কোথাও তার পরীক্ষা-

www.pathagar.com

নিরীক্ষা চালানোর কথা কল্পনাও করা যায় না, আর তার প্রশ্নও উঠতে পারে না। লুল'–এর মতে এটা একটা যুক্তি বিন্যাস পদ্ধতি মাত্র, যার দ্বারা সৃষ্টি কার্যক্রমের বহিঃপ্রকাশের একটা ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে মাত্র। এটা কোন বাস্তব পর্যবেক্ষণ পর্যায়ের ব্যাপারই নয়। স্যার আর্থার কেইথ্ বিবর্তনবাদ সমর্থক হয়েও বিবর্তনবাদকে একটা পর্যবেক্ষণীয় বা পরীক্ষা–নিরীক্ষাযোগ্য সত্য বলে মনে করেন নি। তিনি বলেছেন, এটা একটা 'বিশ্বাস' মাত্র। তাঁর কথা হলো, 'Evolution is a basic dogma of rationalism.- —Revolt Against Reason, p. 112

অর্থাৎ বিবর্তনবাদ বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ধর্মের একটা মৌলিক বিশ্বাস মাত্র। একটা বৈজ্ঞানিক এনসাইক্লোপিডিয়ায় ডারউইনবাদকে এমন মত বলে অভিহিত করা হয়েছে, যার ভিত্তি পর্যবেক্ষণহীন বিশ্লেষণের (Explanation without demonstration) উপর স্থাপিত। —Revolt Against Reason, p. 111

স্যার আর্থার কেইথ্ (Keith) ১৯৫৩ সনে বলেছিলেনঃ

> Evolution is unproved and unproveable, We believe it only because the only alternative is special creation and that is unthinkable.

বিবর্তনবাদ একটা অপ্রমাণিত মত। এটা প্রমাণযোগ্য মতও নয়। আমরা তা বিশ্বাস করি শুধু এই কারণে যে, এ মত মেনে না নিলে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকার্য স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু তা তো চিন্তাও করা যায় না।

এ কথার অর্থ বিবর্তনবাদকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও সপ্রমাণিত বাস্তব সত্যরূপে মেনে নেয়া হচ্ছে না, মেনে নেয়া হচ্ছে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি ক্ষমতাকে স্বীকার করে নেয়ার বাধ্যবাধকতা থেকে নিজেদের দূরে রাখার উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌কে মানতে প্রস্তুত নয় বলেই বিবর্তনবাদকে একটা সত্যরূপে মেনে নিয়েছে। এটা যে অন্ধ বিদ্বেষ ছড়া আর কিছু নয় এবং অত্যন্ত হীন মানসিকতার পরিচায়ক তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তাহলে এরূপ একটি অপর্যবেক্ষণীয় ও পরীক্ষা–নিরীক্ষা–অযোগ্য 'মত'কে বৈজ্ঞানিক সত্য বলে মনে করা হচ্ছে কেন? —— এ· ঈ ম্যাভারের ভাষায় তার কারণ হলো, এক—এই 'মত'টি সব জানা সত্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ (consistant)। দুই—এই 'মত'টিতে এমন বহুবিধ ঘটনার বিশ্লেষণ পাওয়া যায়, যা এ মত ছাড় বোঝতে পারা যায় না। এবং তিন—অন্য কোন মত এখন পর্যন্ত এভাবে সামনে আসেনি, যা বাস্তবতার পথে এতটা সঙ্গতিসম্পন্ন। —পৃষ্ঠা ১১২

www.pathagar.com

এইরূপ যুক্তি—বিশ্লেষণ যদি বিবর্তনবাদকে সত্যরূপে গ্রহণ করার জন্যে যথেষ্ট মনে করা হয়, তাহলে বলতে হবে, ধর্মের সত্যতা ও যথার্থতা প্রমাণের জন্যে এর চাইতেও অনেকবেশী অকাট্য যুক্তি—প্রমাণ (reasoning) পেশ করা শুধু সম্ভবই নয়, অতীব সহজ। তারপরও বিবর্তনবাদকে 'বৈজ্ঞানিক সত্য' (?) বলে মনে করা বা গ্রহণ করা, আর ধর্মকে 'বিজ্ঞান সমৃদ্ধ মনমানসিকতার পক্ষে গ্রহণ অযোগ্য' মনে করা ও তার প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন অত্যন্ত হীন মানসিকতার পরিচায়ক নয় কি? – এ থেকে বোঝা যায়, ধর্মবিরোধী মানসিকতা ও আচরণ মূলত 'যুক্তি—প্রমাণ বিশ্লেষণ পদ্ধতির' ব্যাপার নয়। আসলে তা নিতান্তই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপার। একই ধরনের 'যুক্তি—প্রমাণ বিশ্লেষণ পদ্ধতি'তে কোন নিরেট প্রাকৃতিক (physical) ধরনের কোন ঘটনা যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে তা সঙ্গে সঙ্গেই গ্রহণ করবেন ও মাথা পেতে মেনে নেবেন; কিন্তু কোন অতিপ্রাকৃতিক বা ধর্মতাত্ত্বিক অধিবিদ্যা সংক্রান্ত (metaphysical) সত্য প্রমাণিত হলে ঘৃণা ভরে তা প্রত্যাখ্যান করবেন—কেননা এর পরিণতি বা প্রমাণলব্ধ সিদ্ধান্তটি আপনার পছন্দ নয়, এটা কোন সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের আচরণ হতে পারে না। এটা নিতান্ত অন্ধ, মুর্খ, গোঁড়া ব্যক্তির একগুঁয়েমির পরিচায়ক আচরণ। 'অন্ধকার যুগে' এই ধরনের প্রবণতা ছিল বলে মনে করা গেলেও বিজ্ঞানের এই আলোকোজ্জ্বলযুগে—বিশেষ করে এ কালে সুধী মনীষীদের সম্পর্কে তো এরূপ ধারণা করাও শোভা পায় না।

এ পর্যন্ত আলোচনায় স্পষ্ট হচ্ছে যে, ধর্ম কেবল অদৃশ্যের প্রতি 'অন্ধ ঈমানের ব্যাপার' আর বিজ্ঞান 'বাস্তব ও পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান বিশ্বাসে'র জিনিস, এইরূপ মত পোষণ করা নিতান্তই ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক। বস্তুত ধর্ম ও বিজ্ঞান উভয়ই 'অদৃশ্যে বিশ্বাস' স্থাপনের ভিত্তিতেই কাজ করে থাকে। 'বস্তুর' মৌলিক ও সর্বশেষ সত্য নির্ধারণ ধর্মের আওতাভূক্ত। আর বিজ্ঞান যদি প্রাথমিক ও বাহ্যিক প্রকাশমানতা সম্পর্কে কথা বলে, তা হলো ততক্ষণ পর্যন্ত তা পর্যবেক্ষণ পর্যায়ের জ্ঞান। কিন্তু বিজ্ঞান যখনই বস্তুসমূহের সর্বশেষ চূড়ান্ত ও প্রকৃত অবস্থা বা মর্যাদা নির্ধারণ করতে চাইবে,—যা মূলত ধর্মের জন্য নির্দিষ্ট ক্ষেত্র,—তখনই তাকে 'ঈমান বিল গায়ব' বা 'অদৃশ্য বিশ্বাস'–এর পন্থা অবলম্বন করতে হবে, অথচ ধর্মকে বিদ্রুপচ্ছলে এই অভিযোগেই অভিযুক্ত করা হচ্ছে। তার কারণ এ এমন একটা ক্ষেত্র, যেখানে 'ঈমান বিল গায়ব' ছাড়া চলতেই পারা যায় না। কেননা কোন্ ধরনের 'অদৃশ্য বিশ্বাস' এ ক্ষেত্রে প্রথম ও একান্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এ কালের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার আর্থার এডিংটন (Sir Arthur Eddington) যে টেবিলে কাজ করেন, সেটি এক সঙ্গে ও একই সময়ে দুটো টেবিল। একটি টেবিল তো তাই যা চিরকাল সাধারণ মানুষের টেবিল হয়ে থাকে এবং যা স্পর্শ করা ও দেখা সম্ভব। দ্বিতীয় টেবিলটি হচ্ছে 'বৈজ্ঞানিক টেবিল (scientific table)। এ টেবিলটির বড় অংশটি শূন্যতায় ভরা। তাতে অসংখ্য অগণিত ও পর্যবেক্ষণ–অযোগ্য

www.pathagar.com

'ইলেকট্রন' দৌড়াচ্ছে। অনুরূপভাবে প্রতিটি জিনিসের দ্বৈতরূপ বা বিকল্প (duplicate) রয়েছে। তার একটি পর্যবেক্ষণযোগ্য আর অপরটি নিছক ধারণামূলক—কাল্পনিক। কোনরূপ দূরবীক্ষণ বা অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারাও তা দেখা যেতে পারে না —Nature of the Physical World, p. 7-8

'বস্তু'সমূহের প্রথম রূপটি বিজ্ঞান দেখতে পায়, দেখতে পায় অনেকদূর পর্যন্ত তা অনস্বীকার্য। কিন্তু তার দ্বিতীয় ও শেষোক্ত রূপটিও দেখতে পায়—বিজ্ঞান নিজে এমন দাবি কোন দিনই করেনি। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের কার্যপদ্ধতি হলো, কোন প্রকৃত সত্যের বাহ্য প্রকাশকে (phenomenon) দেখে সে সম্পর্কে একটা 'মত' রচনা করে নেয়া। অন্য কথায় এই দ্বিতীয় ক্ষেত্র–বস্তুর চূড়ান্ত ও সর্বশেষ অবস্থা ও মর্যাদা (place or position) বা পরম মূল্য (ultimate values) জানবার ক্ষেত্রে 'জানা সত্যের' ভিত্তিতে ও সাহায্যে 'অজানা সত্য'কে আবিষ্কার করার নামই হলো বিজ্ঞান।

বিজ্ঞানীরা যখন কতকগুলো 'পর্যবেক্ষণীয় সত্য' আয়ত্তে আনে—সহজাত ধারণা (instinct) যার রূপ দান করে তখন একটা 'ধরে-নেয়া বা মনে করে নেয়া মত' (কিংবা মতাদর্শ) অথবা যাকে বলে 'একটা সহজাত ধারণা বা বিশ্বাসগত কল্পনার' প্রয়োজন হয়, যা এ পর্যবেক্ষণ লব্ধ তত্ত্ব ও তথ্যের ব্যাখ্যা দিতে পারে, সে সবকে সুবিন্যস্তভাবে সাজাতে ও একটি এককে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে বা গেঁথে দিতে পারে। এই কারণে তখন তারা এরূপ একটা সহজাত ধারণামূলক কথা রচনা করে নেয়। এই 'ধরে নেয়া মত'টি যদি এইসব ঘটনা বা সত্যের যুক্তিসঙ্গত কোন ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়—সেগুলোকে সুবিন্যস্ত করে একটা 'একক' বানাতে পারে, তাহলে সেই 'ধরে নেয়া মত'টিও একটা 'প্রত্যয়যোগ্য সত্য' রূপে পরিগণিত হয়। যেমন অন্য কোন বৈজ্ঞানিক সত্য, বিজ্ঞানী যাকে 'পর্যবেক্ষণ' বলে অভিহিত করে, এটাও ঠিক তেমনি হয়ে যায়। যদিও এই সত্যটি বিজ্ঞানীদের নিজেদের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ীই পর্যবেক্ষণে আসেনি। কিন্তু এই 'অ-দেখা' জিনিসকে সত্য মনে করা হয় শুধু এ জন্যে যে, এসব পর্যবেক্ষিত সত্যের প্রকৃত ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম এমন দ্বিতীয় কোন 'সহজাত ধারণা' বর্তমান নেই।

একথার অর্থ হলো, বিজ্ঞানী একটা অদৃশ্য জিনিসের অস্তিত্ব ও বর্তমান থাকা মেনে নিচ্ছে সেই জিনিসের লক্ষণ ও বাহ্যিক অভিব্যক্তির কারণে এবং সেই বিষয়ে দৃঢ়প্রত্যয় গ্রহণ করছে। আর আসল অবস্থাও এই। আমরা যে সত্য সম্পর্কেই প্রত্যয় গ্রহণ করি শুরুতে তা নিছক একটা 'ধরিয়া লওয়া'—একটা প্রিজাম্পশনই (presumption) থাকে মাত্র। তারপর নতুন নতুন সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে সে 'ধরিয়া লওয়া' সত্যের যতই সমর্থন করতে থাকে, ততই সেই সত্যের সত্যতা ও যথার্থতা স্পষ্ট ও প্রকট হতে থাকে। এ ভাবেই শেষ পর্যন্ত তার প্রতি আমাদের প্রত্যয় দৃঢ় ও

www.pathagar.com

নিঃসন্দেহ 'ইয়াকীন' হয়ে দাঁড়ায়। পরে প্রকাশ পাওয়া সত্য যদি সে 'ধরে লওয়া কথা'টির 'সমর্থন' না করে তাহলে তখন সে ধরে লওয়া কথাটিকে ভুল মনে করে আমরা সেটিকে ত্যাগ করি। 'এ্যাটম' (Atom) এ ধরনের অনস্বীকার্য সত্যের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিজ্ঞান এর প্রতি 'না দেখেও ঈমান' ও বিশ্বাস স্থাপন করেছে। প্রচলিত অর্থে যে জিনিসের নাম 'এ্যাটম' তা আজ পর্যন্ত কেউ দেখেনি, কারোরই দৃষ্টিগোচর হয়নি। তা সত্ত্বেও তা আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা সমর্থিত সত্য। এই কারণে একজন চিন্তাবিদ বৈজ্ঞানিক মতবাদের সংজ্ঞা দিয়েছেন এই ভাষায়ঃ

Theories are mental pictures of that known laws.

'বৈজ্ঞানিক মতবাদ মতাদর্শ মূলত কতগুলো মানসিক (বা মানসপটে প্রতিফলিত) ছবি মাত্র, যা জানা নিয়ম–বিধিগুলোর ব্যাখ্যা দেয়।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সব 'সত্য'কে পর্যবেক্ষিত বা পর্যবেক্ষণলব্ধ সত্য (observed facts) বলা হয়, সেগুলো আসলে 'পর্যবেক্ষিত সত্য' নয়, সেগুলো পর্যবেক্ষণের ব্যাখ্যা মাত্র। আর মানবীয় পর্যবেক্ষণ যেহেতু কখ্খনই পূর্ণাঙ্গ হয় না—পূর্ণাঙ্গ বলাও যায় না, এই কারণে সে সবের সমস্ত ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ নিতান্ত আপেক্ষিক মাত্র। অবশ্য পর্যবেক্ষণের উন্নয়নে তাতে পরিবর্তন আসতে পারে। জে·ডব্লিউ·এন·সুলিভান (Sullivan) বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ সম্পর্কে পর্যালোচনা করে এক পর্যায়ে লিখেছেন, 'বৈজ্ঞানিক মতাদর্শের এ পর্যালোচনা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, একটা নির্ভুল বৈজ্ঞানিক মতাদর্শের অর্থ শুধু এতটুকুই যে, তা একটি সফল ও কর্মোপযোগী প্রকল্প (successful working hypothesis) — কিছু প্রমাণার্থে সত্য বলে ধরে নেয়া কথা মাত্র। সব বৈজ্ঞানিক মতাদর্শের মূলতই ভুল হয়ে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। আমরা আজ যেসব মতাদর্শ সমর্থন করি সেগুলো আমাদের বর্তমান পর্যবেক্ষণ অপরিসীমার দৃষ্টিতেই শুধু সত্য। বিজ্ঞানের জগতে 'সত্য' (truth) এখনও একটা পুঁথিগত প্রায়োগিক ব্যাপার (pragamatic affair) মাত্র।

তা সত্ত্বেও যে প্রকল্পটি (hypothesis) বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণমূলক জ্ঞানের যুক্তিসঙ্গত ও বিবেকসম্মত ব্যাখ্যা দেয়, বিজ্ঞানীরা তাকে পর্যবেক্ষণীয় সত্যের কম মর্যাদার প্রকম্পিত সত্য মনে করে না। তারা বলতে পারে না যে, এ পর্যবেক্ষণীয় সত্যগুলোই বিজ্ঞান, আর যে মতাদর্শ সেগুলোর ব্যাখ্যা দেয় তা বিজ্ঞান নয়। এটাই হলো অদৃশ্যে বিশ্বাস—ধর্মীয় পরিভাষায় ঈমান বিল গায়ব। গায়েবের প্রতি ঈমান পর্যবেক্ষিত সত্য থেকে ভিন্নতর কোন জিনিস নয়। অন্ধ অযৌক্তিক বিশ্বাসের নাম 'ঈমান বিল গায়ব' নয়। তাহল পর্যবেক্ষিত সত্যসমূহের নির্ভুলতম ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। নিউটনের 'আলো' সংক্রান্ত মতাদর্শ (Conpuscular theory of light) বিশ শতকের বিজ্ঞানীরা প্রত্যাখ্যান করেছে। কেননা তা 'আলো' যে প্রকাশমান তার

www.pathagar.com

ব্যাখ্যাদানে ব্যর্থ হয়েছে বলে তারা মনে করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে মতাদর্শ গ্রহণ ও বর্জনের ব্যাপার আমাদের নিকট এটা একটা বিশেষ দৃষ্টান্ত। আল্লাহ্‌তে অবিশ্বাসী চিন্তাবিদদের বিশ্ব-দর্শনকে আমরা এই কারণেই প্রত্যাখ্যান করেছি যে, তা জীবন ও বিশ্বলোকের প্রকাশমানতার (phenomenon) ব্যাখ্যা দানে ব্যর্থ ও অক্ষম। বিজ্ঞানীদের নিকট কোন বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ গ্রহণে প্রত্যয়ের মূল উৎস যা, ঠিক সেই জিনিসই হচ্ছে ধর্মের ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যয় গ্রহণের মৌল উৎস। পর্যবেক্ষণমূলক সত্যসমূহ অধ্যয়নের ফলেই আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে—ধর্ম জীবন ও জগৎ ইত্যাদি বিষয়ের যে ব্যাখ্যা দেয়, একমাত্র তাই সত্য। বিশ্বলোকের মর্মমূলে যে সত্য লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়েছে ধর্ম অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে সেই মহাসত্যকে উদঘাটিত করেছে। সহস্র লক্ষ বছর গত হওয়ার পরেও সে সত্যে—সত্যের ধর্মীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে একবিন্দু পার্থক্য বা তারতম্য হয়নি। মানুষ নিজস্ব চিন্তা-পর্যবেক্ষণের ফলে মাত্র কয়েক বছর পূর্বেও যে মতাদর্শ রচনা করেছিল, কিছুদিন পর নবতর পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার আত্মপ্রকাশ করার ফলে তা সংশয়াপন্ন এবং প্রত্যাহৃত হয়েছে। কিন্তু ধর্ম এ ধরনের জিনিস নয়। ধর্ম এমন এক মহাসত্য, যা প্রতিটি নতুন চিন্তা-গবেষণা ও আবিষ্কার উদ্ভাবনে অধিকতর প্রকট স্বচ্ছ ও ভাস্বর হয়ে উঠে। প্রত্যেকটি প্রকৃত নবোদ্ভাবনেরই ধর্মের সত্যতার নবতর বাহন বা প্রকাশক হয়ে দেখা দেয়। তার সত্যতাকে একবিন্দু ম্লান বা ক্ষুণ্ন করা সম্ভব হয়নি আজ পর্যন্ত কোন নতুন উদ্ভাবনের পক্ষেই। ধর্মের শাশ্বত সত্যতার বিরুদ্ধে টু শব্দ করার সাধ্য কারো নেই—হতেও পারে না।

www.pathagar.com

'Nature an science speak about God'—'প্রকৃতি এবং বিজ্ঞান আল্লাহ্র অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে— কথাটি খুবই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। বস্তুত আল্লাহ্ যে আছেন, তাঁর সৃষ্ট গোটা বিশ্ব-প্রকৃতিই তার অকাট্য প্রমাণ। সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতি এবং তৎসম্পর্কিত আমাদের সর্বোত্তম জ্ঞান উদাত্ত কণ্ঠে সাক্ষ্য দিচ্ছে, এই জগতের একজন স্রষ্টা আছেন। সেই স্রষ্টাকে স্বীকার করে না নেয়া পর্যন্ত এই বিশ্বলোকও যেমন আমরা বুঝতে পারি না, তেমনি আমাদের নিজেদের সম্পর্কেও কোন স্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

বিশ্বলোকের অবস্থিতি তার মধ্যকার বিস্ময়কর সংগঠন এবং তার মধ্যে নিহিত অর্থে অন্তহীন তাৎপর্যের ব্যাখ্যা এছাড়া আর কিছু হতে পারে না যে, তা কেউ অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বের আলোকে নিয়ে এসেছেন এবং সেই সত্তা এক সীমাহীন শক্তিসম্পন্ন মন—কোন অন্ধ শক্তি নয়।

১. সংশয়বাদে নিমজ্জিত কতিপয় দার্শনিক অতিপ্রাকৃতিক সত্তার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন। তাঁদের মতে এখানে কিছু নেই, না কোন মানব সত্তা,না বিশ্বলোক বলতে কিছু। এখানে নিছক শূন্যতা—চরম অনস্তিত্ব বিরাজিত। তাছাড়া আর কিছুই কেথাও নেই।

সংশয়বাদিদের এই কথা মেনে নিলে আল্লাহ্র অস্তিত্বও সংশয়াপন্ন হয়ে পড়ে, তা ঠিক; কিন্তু বিশ্বলোক আছে,একথা যদি আমরা মেনে নেই, তাহলে আল্লাহ্কে মেনে নেয়াও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কেননা অস্তিত্বদানকারী সত্তা ছাড়া অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব জেগে ওঠা একটা অকল্পনীয় ও দুর্বোধ্য ব্যাপার।

আমরা স্বীকার করি, সংশয়বাদও আধুনিক দর্শনেরই একটি শাখা—একটি অন্যতম দার্শনিক তত্ত্ব বটে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারের সাথে যে তার কোন সম্পর্ক নেই, তা-ও অনস্বীকার্য। আমরা যখন চিন্তা করি, তখন আমাদের এই চিন্তা করাটাই প্রমাণ করে যে, আমরা আছি, আমাদের অস্তিত্ব আছে । পথ চলতে কোন প্রস্তরখন্ডের সাথে সংঘর্ষ হলে আমরা ব্যথা অনুভব করি। এই ঘটনাই প্রমাণ করে যে, আমাদের বাইরেও একটা জগত আছে এবং তারও একটা অস্তিত্ব রয়েছে। নতুবা আমরা আঘাত পেলাম কিসের দ্বারা? অনুরূপভাবে আমাদের মন, আমাদের গোটা অনুভূতি প্রতি মূহুর্তে অসংখ্য জিনিস অনুভব করে থাকে। এই জ্ঞান ও অনুভূতি প্রত্যেকটি ব্যাক্তির জন্য

ব্যক্তিগত ভাবে পাওয়া একটা প্রমাণ এই কথার যে, এমন একটা জগত অবশ্যই রয়েছে, যার বাস্তবিকই একটা সত্তা বা অস্তিত্ব বিরাজমান। এই প্রেক্ষিতে সংশয়বাদী দর্শন একটা অবাস্তব—অপ্রমাণিত দৃষ্টি ভংগী ও চিন্তাকোণ মাত্র, যার সাথে কোটি কোটি মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতার কোনরূপ সাদৃশ্য বা মাধুর্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ দর্শনে বিশ্বাসীদের সম্পর্কে শুধু এতটুকুই বলা চলে যে, তাঁরা নিজেদের রচিত এক বিশেষ ধরনের মানসিক পরিমন্ডলে লীন হয়ে গেছেন। এমন কি সেখানে তারা নিজেকেওহারিয়েফেলেছেন—বিস্মৃতির গভীরে তলিয়ে গেছেন।

যদিও বিশ্বলোকের অস্তিত্বহীনতা স্বতঃই মহান আল্লাহ্‌র অনস্তিত্ব অনিবার্য ভাবে প্রমাণ করে না—বিশ্বলোক নেই, অতএব আল্লাহ্‌ও নেই, এমন কথা যুক্তি ভিত্তিক বিবেচিত হয় না। একটির না থাকাটা অপরটির না থাকার দলীল হতে পারে না। তা সত্ত্বেও উক্ত কথার চূড়ান্ত মাত্রার অর্থহীনতা সত্ত্বেও বলা যায়, এ–ও একটা দৃষ্টিকোণ, যার দরুন আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সংশয়াপন্ন হয়ে পড়তে পারে বলে ধরে নেয়া যায়। কিন্তু এই দৃষ্টিকোণটাই অর্থহীন, ভিত্তিশূন্য। আজ পর্যন্তকার মানুষের পক্ষেও যেমন তা অবোধগম্য, তেমনি বৈজ্ঞানিক জগতেও তা একবিন্দু সমর্থন লাভে সক্ষম হতে পারেনি। সর্বসাধারন মানুষ এবং সর্বসাধারন বিজ্ঞানী উভয়ের নিকটে–ই আল্লাহ্‌র সত্ত্বা একটা বাস্তব ঘটনা হিসাবেই স্বীকৃত এবং এই বিশ্বলোকও স্ব–অস্তিত্বে দীর্ঘকাল ধরে বিরাজমান। এই বিশ্বলোক একটা দৃঢ় জ্ঞান ও প্রত্যয়ের উপরই দাঁড়িয়ে আছে—চলছে মানুষের সমস্ত জ্ঞান পর্যায়ের কার্যক্রম এবং জীবনের সমস্ত তৎপরতা।

অতএব একটা বিশ্বলোক যখন স্ব–অস্তিত্বে বিরাজমান, তখন তার একজন স্রষ্টা হওয়াও অকাট্যভাবে প্রয়োজন। সৃষ্টির অস্তিত্ব স্বীকার করার পর স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যেমন অযৌক্তিক, তেমনি অর্থহীন। সৃষ্টি করা হয়নি এমন কোন জিনিসের অস্তিত্ব কোথাও পরিলক্ষিত হতে পারে না। ছোট বড় প্রত্যেকটি জিনিসেরই একটা কারণ অবশ্যম্ভাবী। তাহলে এই বিশাল বিস্তীর্ণ বিশ্বলোক স্বতঃই অস্তিত্বমান হয়েসুশৃংখলভাবেচলছে—তা কি করে বিশ্বাস করা যেতে পারে?

জন ষ্টুয়ার্ট মিল (Jon Stuart Mill) তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেনঃ আমার পিতা শিক্ষা দিয়েছেন আমাকে কে সৃষ্টি করেছে—Who created me, এই প্রশ্ন স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়। কেননা তারপরই সহসাই প্রশ্ন ওঠে, স্রষ্টাকে কে স্রষ্টি করেছে? (Who created the Creator?) বার্ট্রান্ড রাসেলও এই আপত্তি তুলে 'প্রথম কারণ' এর যুক্তিটিকে খন্ডন করেছেন। (The Age of Analysts by Norton, white pp-21-22) আসলে সৃষ্টা অস্বীকারকারীদের এ একটা অতি প্রাচীন যুক্তি–পদ্ধতি। তার অর্থ দাঁড়ায়, বিশ্বলোকের সৃষ্টিকর্তাকে মেনে নিলে তাঁকে

www.pathagar.com

অবশ্যই অনাদি ও শাশ্বত (Eternal) মানতে হবে। আর সৃষ্টিকর্তাকেই যদি অনাদি শাশ্বত মানতে হয়, তাহলে এই বিশ্বলোককেই অনাদি শাশ্বত মেনে নিতে দোষ কি?

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দৃষ্টিভংগী ও যুক্তি–পদ্ধতিটিই ভুল, অর্থহীন। কেননা বিশ্বলোককে সৃষ্টিকর্তা মেনে নেয়ার মত কোন বিশেষত্ব তার মধ্যে আছে বলে আজ পর্যন্ত জানা যায়নি। তবুও উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এরূপ যুক্তি উপস্থাপনে একটা বাহ্যিক প্রতারণামূলক সৌন্দর্য ছিল বলে মনে করা যায়। কিন্তু গতি ও তাপের দ্বিতীয় নিয়ম (Second Law of thermo-dynamics) আবিষ্কৃত হওয়ার পর এই যুক্তি–পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়ে গেছে।

law of Entropy নামের এ নিয়মটি অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছে যে, এই বিশ্বলোক কখনোই চিরন্তন ও শাশ্বত হতে পারে না; অনাদিকাল থেকে তা অস্তিত্বমান রয়েছে, এমন কথা কিছুতেই মনে করা যেতে পারে না। Entropy নিয়ম বলছে, ক্রমাগত ও নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ–অস্তিত্ব থেকে উত্তাপহীন অস্তিত্বে সংক্রমিত হতে থাকে। কিন্তু এই কার্যক্রমটাকে বিপরীতমুখী চালানো সম্ভব নয়—এই উত্তাপ কম–উত্তাপ–অস্তিত্ব থেকে অধিক–উত্তাপ–অস্তিত্বে স্বতঃই সংক্রামিত হতে থাকবে, এটা অসম্ভব। Available Energy ও Unavailable Energy–র মধ্যবর্তী অনুপাতকে অবক্ষয় (decreation) বলা হয়। এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, এই বিশ্বলোকের কর্মক্ষমতা ক্রমাগতভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত ও অক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। এ হিসাবে এমন একটা সময় আসা অবধারিত, যখন গোটা সৃষ্টিলোকের তাপ সমান হয়ে যাবে এবং কর্মোপযোগী কোন কর্মক্ষমতাই অবশিষ্ট থাকবে না। আর তার অনিবার্য পরিণতিতে রাসায়নিক ও স্বভাবগত কার্যক্রম সম্পূর্ণ রূপে নিঃশেষ হয়ে যাবে। সেই সঙ্গে জীবনও পরিসমাপ্তি লাভ করবে। কিন্তু এক্ষণে যখন রাসায়নিক ও স্বভাবগত কার্যক্রম চলমান এবং জীবনের তৎপরতা অব্যাহত, তখন একথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, এই বিশ্বলোক চিরন্তন নয়, অনাদিকাল থেকেও তা চলমান হয়ে নেই। অন্যথায় তাপ নিষ্কাষণের অনিবার্য নিয়মের কারণে তার শক্তি সামর্থ্য কোন্ দিন যে নিঃশেষ হয়ে যেত এবং এখানে জীবনের মৃদু স্পন্দনও আজ অবশিষ্ট থাকতো না, তা বলাই বাহুল্য।

এই নবতর আবিষ্কারের উদ্ধৃতি দিয়ে আমেরিকার প্রাণী–বিজ্ঞানী Edward Luther Kessel লিখেছেনঃ

> এরূপ অনাস্থামূলক বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন প্রমাণ করে দিয়েছে যে, বিশ্বলোকের একটা নিজস্ব 'সূচনা' রয়ছে। আর এরূপ করার ফলে, স্রষ্টার অস্তিত্বের সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গেছে। কেননা যে জিনিসের নিজস্ব একটা সূচনা রয়েছে, তা কখনোই স্বতঃই

www.pathagar.com

সূচিত হতে পারে না। নিঃসন্দেহে তা এক 'প্রথম চালিকাশক্তি' এক সৃষ্টিকর্তার মুখাপেক্ষী। —(The Evidence of God, P-51)

স্যার জেমস্ জীন্স্ও ঠিক এই কথাই লিখেছেন নিজস্ব ভাষায় ঃ

আধুনিক বিজ্ঞান মনে করে, বিশ্বলোকে হ্রাস প্রাপ্তি বা ক্ষয়িষ্ণুতা (Entropy) চিরকাল কার্যকর থাকবে। শেষ পর্যন্ত তার সমস্ত শক্তি—ক্ষমতা নিঃশেষিত হয়ে যাবে। এক্ষণে এই শক্তির হ্রাসপ্রাপ্তি তার শেষ মাত্রা পর্যন্ত পৌছেনি। যদি তা পৌছে যেত, তাহলে আমরা সে সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য এই মুহূর্ত পর্যন্ত বেঁচে থাকতাম না। এই হ্রাস প্রাপ্তি এই মুহূর্তেও তীব্র গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। আর এই কারণে তার একটা সূচনা হওয়া অপরিহার্য। বিশ্বলোকে নিঃসন্দেহে এমন ধরনের কোন কার্যক্রম সংঘটিত হয়েছে, যাকে আমরা 'একটা বিশেষ সময়ে সৃষ্টি' বলতে পারি। তা অনন্তকাল ধরে বর্তমান আছে, একথা নয়। (The Mysterious Universe, P-133)

বিশ্বলোক যে অনাদিকাল থেকে অস্তিত্বশীল ছিল না, তার একটা সীমাবদ্ধ বয়স রয়েছে, তার আরও বহু পদার্থ তাত্ত্বিক-সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে। আকাশ মার্গ সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ প্রমাণ করছে যে, বিশ্বলোক ক্রমাগতভাবে বিস্তৃতি লাভ করছে। সবগুলি ছায়াপথ ও আকাশ মার্গীয় অবয়বসমূহ পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে বলে পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ছে। আমরা যদি এমন একটা প্রাথমিক সময় মেনে নেই, যখন সবকিছুই একত্রিত ও এক স্থানে কেন্দ্রীভূত ছিল, তার পরই তাতে গতি ও শক্তি (Motion and Energy) সূচিত হয়েছে, তাহলে বর্তমান অবস্থার একটা উত্তম ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভবপর হয়ে যায়। এই ধরনের বিভিন্ন লক্ষণ ও প্রমাণের ভিত্তিতে সাধারণভাবে অনুমান করা হয়েছে যে, প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ কোটি বছর পূর্বে একটা অনন্যসাধারণ বিস্ফোরণের ফলে এই গোটা বিশ্বলোক অস্তিত্ব লাভ করেছে। বিশ্বলোকের সীমিত বয়স সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মেনে নেয়ার পর তার অস্তিত্ব দানকারী একজন আছেন, একথা মেনে না নেয়ার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। তা মেনে না নিলে ব্যাপারটা ঠিক এরূপ দাঁড়ায়, একজন একথা মানছে যে, লাল বাঁশের দুর্গ চিরদিন বর্তমান ছিল না, বরং দু'তিন শতাব্দী পূর্বে তা নির্মিত হয়েছিল, কিন্তু তার জন্য কোন নির্মাতা ইঞ্জিনিয়ার, মিস্ত্রীকে স্বীকার না করে বলে যে, তা একটা বিশেষ সময়ে আপনা-আপনি গড়ে ওঠেছে।

২. উর্ধ্বগগন সংক্রান্ত অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণে জানা যায় যে, দুনিয়ার সমস্ত সমুদ্রতীরে যত বালুকণা রয়েছে, সম্ভবত সেই পরিমাণ তারকা রয়েছে আকাশমার্গে। তন্মধ্যে কিছু সংখ্যক তারকা পৃথিবীর তুলনায় অনেক গুণ বড়; কিন্তু বেশীর ভাগ তারকা এত বিরাট যে, তার মধ্যে বহু লক্ষ পৃথিবীর সঙ্কুলান হতে পারে। কতকগুলোর

www.pathagar.com

মধ্যে কয়েক কোটি পৃথিবী স্থান লাভ করতে পারে। এই বিশ্বলোক এতোই বিশাল যে, আলোর মত চরম মাত্রার তীব্র গতিশীল কোন উড়োজাহাজ প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে বিশ্বলোকের চতুর্দিকে ঘুরলে সমগ্র দূরত্ব অতিক্রম করতে সম্ভবত এক হাজার কোটি বছর সময় অতিবাহিত হবে। বিশ্বলোকের এই সীমাহীন বিশালতা সহকারে তা স্তব্ধ হয়ে নেই, প্রতি মুহূর্তে স্বীয় অক্ষের চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হচ্ছে। এই বিস্তৃতি লাভের গতিও এত তীব্র যে, প্রতি ১৩০ কোটি বছর পর বিশ্বলোকের সমস্ত দূরত্ব দিগুণ হয়ে যায়। আমাদের এই কাল্পনিক ধরনের অসাধারণ গতিসম্পন্ন উড়োজাহাজও বিশ্বলোকের চতুর্দিকে ঘুরে দুরত্ব অতিক্রম করতে পারবে না তা নিরন্তর এই ক্রম বিকাশমান বিশ্বলোকের পথে আবর্তনশীল অবস্থায় পড়ে থাকবে।'[১]

মেঘমুক্ত আকাশে খালি চোখে পাঁচ হাজার তারকা দেখা যায়। কিন্তু সাধারণ দূরবীন-এর সাহায্যে তাকালে বিশ লক্ষেরও বেশী তারকা চোখে পড়ে। আর মাউন্ট পিলোমার-এর উপর সংস্থাপিত একালের সর্বাপেক্ষা দূর পাল্লার দূরবীন দিয়ে দেখলে কয়েক শ' কোটি তারকা দৃষ্টিগোচর হয়। এটাও আসল সংখ্যার তুলনায় খুবই অকিঞ্চিৎকর। মহাবিশ্ব এক সীমাহীন বিশাল বিস্তীর্ণ মহাশূন্য। সংখ্যাতীত তারকারাজি এই মহাশূন্যে অসাধারণ দ্রুতগতিতে ক্রমাগত ও অব্যাহতভাবে আবর্তনশীল হয়ে রয়েছে। কোন কোন তারকা একক ও নিঃসংগভাবে পরিক্রমরত। কোন কোনটি দুই বা ততোধিক তারকা সমষ্টি রূপে রয়েছে। আর অসংখ্য তারকা নক্ষত্রপুঞ্জ রূপে গতিবান। ছিদ্রপথে কক্ষমধ্যে আগত সূর্য রশ্মিতে অগণিত বিন্দুসমূহ দিগ্বিদিক ছুটে চলতে দেখা যায়। সেই বিন্দুসমূহকে খুব বড় ও বৃহদায়তন কল্পনা করা গেলে মহাশূন্যে নক্ষত্র পুঞ্জের আবর্তন সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া সম্ভব। তবে এ দুটির মধ্যে খানিকটা পার্থক্য ধরে নিতে হবে। বিন্দুগুলি পরস্পর মিলিত হয়ে চলতে থাকে, আর নক্ষত্রসমূহের সংখা অগণিত হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ একক ও নিঃসঙ্গভাবে পরস্পর থেকে আনুমানিক দূরত্ব রক্ষা করে আবর্তনলিপ্ত থাকে। মহাসমূদ্রে জাহাজগুলো যেমন পরস্পর থেকে এতটা দূরত্ব রক্ষা করে চলে যে, একটি অপরটির টেরও পায় না, এ-ও ঠিক তেমনি।

গোটা বিশ্বলোক অগণিত তারকা-নক্ষত্রের চাকে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। এক একটি 'চাক'-কে ছায়াপথ বলা হয়। এই ছায়াপথগুলোই নিরন্তর আবর্তন মুখর। সবচেয়ে নিকটবর্তী যে নক্ষত্রটিকে আমরা সবাই জানি চিনি, তা হলো চন্দ্র। চাঁদ পৃথিবী থেকে প্রায় দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরে থেকে তার চতুষ্পার্শে এমনভাবে ক্রমাগত

১· বিশ্বলোকের বিশালতা সম্পর্কে এটা আইনষ্টাইনের মত। আসলে তা একজন অংকশাস্ত্র বিশারদের ধারণা মাত্র প্রকৃত কথা হচ্ছে, বিশ্বলোকের বিশালতা সম্পর্কে মানুষ আজ পর্যন্ত নিঃসন্দেহে কোন জ্ঞান-ই লাভকরতে পারেনি। —ব্যাপারটি বুঝতেই সক্ষম হয়নি।

www.pathagar.com

আবর্তিত হচ্ছে যে, প্রতি ২৯$\frac{১}{২}$ দিনে পৃথিবীর চারপাশে তার একটি পরিক্রমা পূর্ণ হয়। এভাবে আমাদের এই পৃথিবী সূর্যকে সাড়ে নয় কোটি মাইল দূরে থেকে নিজ অক্ষের উপর প্রতি ঘন্টায় এক হাজার মাইল বেগে আবর্তিত হচ্ছে, আর পৃথিবী সূর্যের চতুস্পার্শে উনিশ কোটি মাইলের বৃত্ত রচনা করে এবং তার পরিক্রমা এক বছরে সম্পন্ন হয়। এভাবে পৃথিবী সহ নয়টি গ্রহও নিরচ্ছিন্ন ভাবে সূর্যকে কেন্দ্র করে দৌড়াচ্ছে। এসব গ্রহের মধ্যে দূরতম গ্রহের নাম 'প্লুটো'। তা সাড়ে সাত লক্ষ মাইল বৃত্তের মধ্যে আবর্তিত হয়। এ সব গ্রহ-উপগ্রহই আবর্তন কাজে প্রতিনিয়ত এমন ভাবে লিপ্ত যে, একই সাথে এসবের চারপাশে একত্রিশটি চাঁদও নিজ নিজ উপগ্রহের চারপাশে ঘুরছে। এসব ছাড়াও ত্রিশ হাজার ছোট ছোট (Asteroid) গ্রহানুপূঞ্জের শত সহস্র ধূমকেতু ও অগণিত উল্কা (Metcor) মালাও অনুরূপ আবর্তনে নিয়োজিত। এ সবের মধ্যে রয়েছে সূর্য। তার ব্যাস হচ্ছে আট লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার মাইল এবং তা পৃথিবীর তুলনায় বারো লক্ষ গুণ বড়।

এই সূর্য স্তব্ধ বা গতিহীন নয়। স্বীয় সমগ্র গ্রহ ও গ্রহানুপূঞ্জ সহ একটি বিরাট ছায়াপথ ব্যবস্থার (Galaxy) মধ্যে প্রতি ঘন্টায় ছয় লক্ষ মাইল গতিতে আবর্তিত হচ্ছে। এই ধরনের শত সহস্র গতিবান ব্যবস্থা রয়েছে, যা মিলিত হয়ে ছায়াপথ গড়ে তোলে। ছায়াপথ যেন একখানি বিরাট থালা, যার উপর সংখ্যাতীত গ্রহ-নক্ষত্র একক ও সমষ্টিগতভাবে লাট্টুর মত নিরবচ্ছিন্নভাবে আবর্তিত হচ্ছে। এ ছায়াপথগুলোও নিজস্ব পরিধিতে গতিশীল। আমাদের সৌরলোক যে ছায়াপথের মধ্যে অবস্থিত, তার আবর্তন এমনভাবে চলছে যে, বিশ কোটি বছরে তার এক বারের পরিক্রমা সম্পূর্ণ হয়।

খগোলবিদ্‌দের অনুমান হচ্ছে, সমগ্র বিশ্বলোকের পাঁচ শত মিলিয়ন ছায়াপথ রয়েছে। আর প্রতিটি ছায়াপথের মধ্যে এক লক্ষ মিলিয়ন কিংবা তার কিছু কম বা বেশী নক্ষত্র রয়েছে। রাত্রিবেলা সাদা রেখার মত যে নিকটবর্তী ছায়াপথের একাংশ দেখা যায়, তার পরিধি এক আলোকবর্ষ। আমরা পৃথিবীবাসিরা ছায়াপথ কেন্দ্র থেকে ত্রিশ হাজার আলোকবর্ষ পরিমাণ দূরত্বে অবস্থান করছি। আমাদের এই ছায়াপথও অপর একটি বিরাট ছায়াপথের অংশ, যার মধ্যে অনুরূপ সতেরটি ছায়াপথ গতিবান হয়ে আছে। এই গোটা সমষ্টির ব্যাস বিশ লক্ষ আলোকবর্ষ।

উপরে বর্ণিত অসংখ্য ধরনের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি আবর্তন সদা কার্যকর রয়েছে। তা হচ্ছে, সমগ্র বিশ্বলোক বেলুনের মত চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ছে। আমাদের সূর্য ভয়াবহ দ্রুততা ও তীব্রতা সহকারে আবর্তিত হতে হতে প্রতি সেকেন্ডে বারো মাইল বেগে স্বীয় ছায়াপথের বহিঃপার্শের দিকে ক্রমাগতভাবে দৌড়ে যাচ্ছে এবং সেই সাথে নিয়ে যাচ্ছে গোটা সৌরলোকের গ্রহ-উপগ্রহগুলোকে। এমনিভাবে সমস্ত নক্ষত্রই নিজ আবর্তনকে অব্যাহত রেখে কোন না কোন দিকে ছুটে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

কোনটির দৌড়ের গতি প্রতি সেকেন্ডে আট মাইল। কোনটির প্রতি সেকেন্ডে তেত্রিশ মাইল, কোনটির চুরাশি মাইল এমনিভাবে সমস্ত নক্ষত্র তীব্র গতিতে দূর পানে ছুটে যাচ্ছে।

এই সমস্ত গতি ও আবর্তন বিস্ময়করভাবে অতীব সাংগঠনিকতা, নিয়মানুবর্তিতা ও সুশৃঙ্খলতা সহকারে সম্পন্ন হচ্ছে। সেগুলোর মধ্যে পারস্পরিক কোন সংঘর্ষ হতে পারে না; গতিও ব্যাহত হয় না—তাতে সূচিত হয় না কোন বিঘ্ন। সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর আবর্তন পূর্ণ মাত্রায় সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ। অনুরূপভাবে স্বীয় অক্ষের উপরকার আবর্তনও এতই কাঁটায় কাঁটায় হচ্ছে যে, শতাব্দীর মধ্যেও এক সেকেন্ডের ব্যতিক্রম হতে পারে না পৃথিবীর উপগ্রহ হচ্ছে চাঁদ, চাঁদের আবর্তনও অব্যাহতভাবে চলছে। তাতে সামান্য যে তারতম্য ঘটে, তাও প্রতি সাড়ে আঠারো বছর পর অতি সুষ্ঠুভাবে পুনরাবৃত্তি ঘটে। আকাশ মার্গীয় সব গ্রহ উপগ্রহেরেই এই অবস্থা। এমন কি অধিকাংশ মহাশূন্য আবর্তন কালে একটা গোটা ছায়াপথ ব্যবস্থা—যা লক্ষ কোটি গতিশীল নক্ষত্র পরিবেষ্টিত, অন্যান্য ছায়াপথ ব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করে যায়। পরে তা থেকে বেরও হয়ে আসে। কিন্তু এ সময় পারস্পরিক কোন সংঘর্ষ সংঘটিত হয় না। এই মহা ও বিস্ময়কর সাংগঠনিকতা ও সুসংবদ্ধতা দেখে এ কথা মেনে না নিয়ে কোন উপায় থাকে না যে, এই সব কিছু স্বয়ংক্রিয় বা স্বচালিত নয়, কোন অনন্যসাধারণ শক্তিই এই অথৈ অন্তহীন ব্যবস্থাকে নিরন্তরভাবে কার্যকর করে রেখেছে।

বড় বড় জগতে এই যে নিয়ম শৃঙ্খলাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জগতেও তা পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান দেখা যায়। এখন পর্যন্ত জানা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র 'জগত' হচ্ছে পরমাণু (Atom)। পরমাণু এতই ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম যে তা অণুবীক্ষণেও ধরা পড়ে না, যদিও আধুনিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র যে কোন জিনিসকে কয়েক লক্ষ গুণ বড় করে দেখাতে সক্ষম। বস্তুত পরমাণু প্রকৃতপক্ষে মানবীয় দৃষ্টিশক্তির প্রেক্ষিতে কিছুই নয়–এর অধিক কিছু নয়। কিন্তু এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অণুতে বিস্ময়করভাবে সৌরলোকের মতই একটা মহাপরাক্রমশালী আবর্তন ব্যবস্থা কার্যকর। পরমাণু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিদ্যুৎকণা সমষ্টি হলেও বিদ্যুৎকণাসমূহ পরস্পর সংযুক্ত হয়ে থাকে না। এগুলোর মধ্যে এক দীর্ঘ শূন্যতার আয়তন থাকে। শীশার একটি খন্ডে যেমন পরমাণুসমূহ খুবই দৃঢ়তা সহকারে পরস্পর জড়িত হয়ে থাকে, এই বিদ্যুৎ কণাসমূহ আয়তনের এক শ' কোটি ভাগের একটি ভাগও হয়ত আয়ত্ত করে না, অবশিষ্ট ভাগসমূহ শূন্যই পড়ে থাকে। যদি ইলেকট্রোন ও প্রোটনের দুটি খন্ডের রূপে ছবি বানানো যায়, তাহলে উভয়ের মধ্যকার দূরত্ব প্রায় ৩৫০ গজ হতে পারে। অথবা 'এটম'কে যদি ধূলির একটি অদৃশ্য কণার মত কল্পনা করা যায়, তাহলে ইলেকট্রোনের আবর্তনে যে আয়তন হয়, তা আট ফুট ব্যাস সম্পন্ন একটা ফুটবলের মত হবে।

www.pathagar.com

পরমাণুর ঋণাত্মক বিদ্যুৎ কণাকে ইলেকট্রোন বলা হয়। তা ধনাত্মক বিদ্যুৎকণা প্রোটনের চতুর্দিকে আবর্তিত হয়। এই বিদ্যুৎকণা আলোর কিরণের একটি কাল্পনিক বিন্দুর অধিক কোন বাস্তবতার অধিকারী নয়। তা স্বীয় কেন্দ্রের চারপাশে ঠিক সেরূপই আবর্তিত হয়, যেমন পৃথিবী নিজ অক্ষের উপর দাঁড়িয়ে থেকে সূর্যের চারপাশে ঘুরছে। এই ঘূর্ণনটা খুব বেশী দ্রুততা ও তীব্রতা সহকারে হয় বলে ইলেকট্রোনকে কোন একটি স্থানে কল্পনা করা যায় না। মনে হয়, তা একই সময় গোটা পরিধির প্রতিটি স্থানে উপস্থিত রয়েছে। তা নিজ পরিধিতে এক সেকেন্ডে বহু সহস্র কোটি বার আবর্তিত হয়।

এই সংগঠন মূলত অকল্পনীয় যেমন, তেমনি অপর্যবেক্ষণীয়। কিন্তু বিজ্ঞানের কল্পনায় তা এজন্য এসে গেছে যে, এটা ছাড়া পরমাণুর কার্যক্রমের কোন বিশ্লেষণ দেয়া বা তার কোন কারণ দর্শানো আদৌ সম্ভব নয়। ঠিক এ যুক্তিতেই এমন একজন একক সংগঠক সম্পর্কিত ধারণাও কেন মনে আসবে না, যাকে বাদ দিয়ে পরমাণুর উক্ত সংগঠন গড়ে ওঠা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার—এটাই বড় জিজ্ঞাসা।

টেলিফোনের লাইনের তারসমূহের জটিল ব্যবস্থা দেখে আমরা সবাই বিস্মিত হয়ে পড়ি। ঢাকা থেকে সাত সমুদ্র তেরো নদী ওপারে অবস্থিত লন্ডনে কয়েক মিনিটের মধ্যে কথা বলার সুযোগ হওয়াটা আমাদের নিকট সামান্য বিস্ময়ের ব্যাপার হয় না। কিন্তু এই বিশাল বিশ্বলোকের আর একটি জটিল সূক্ষ্ম যোগাযোগ ব্যবস্থা সদা কার্যকর হয়ে রয়েছে, তা উক্ত টেলিফোনগত যোগাযোগের চাইতেও অনেক ব্যাপক এবং তার তুলনায় অনেক বেশি জটিল ও সূক্ষ্ম—তা হচ্ছে আমাদের নিজস্ব স্নায়বিক ব্যবস্থা (Nerve system)। এই ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছেন এবং চালু রেখেছেন—সক্রিয় বানিয়েছেন মহান সৃষ্টিকর্তা। এই যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে দিন রাত কোটি কোটি সংবাদ এক দিকে তড়িৎ বেগে দৌড়াতে থাকে। হৃৎকম্প ও অংগ-প্রত্যংগের গতিশীলতা এরই উপর নির্ভরশীল। মানবদেহে এই যোগাযোগের ব্যবস্থা না থাকলে দেহ সত্তাটি বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমষ্টিতে পরিণত হয়ে থাকত। কোন একটি কাজও সুসম্পন্ন করা তার পক্ষে সম্ভবপর হতো না।

মানুষের মাথার খুপরীর মধ্যে অবস্থিত মগজই হচ্ছে এই যোগাযোগ ব্যবস্থার কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে প্রায় এক হাজার মিলিয়ন স্নায়বিক কোষ (Nerve Cell) রয়েছে। প্রতিটি কোষ থেকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তন্তু বের হয়ে সমগ্র দেহ সংস্থায় ছড়িয়ে রয়েছে। তাই এগুলোকে Nerve Fibre বলা হয়। এই সব সূক্ষ্ম সরু তন্তুর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও নির্দেশ প্রেরণ ব্যবস্থা প্রতি ঘন্টায় প্রায় সত্তর মাইল গতিতে চলে। স্বাদ গ্রহণ, শ্রবণ, দর্শন, অনুভবকরণ প্রভৃতি আমাদের সমস্ত কাজই তো এসব স্নায়বিক তন্তুর মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়ে থাকে। জিহ্বায় তিন হাজার আস্বাদন কেন্দ্র (Taste

www.pathagar.com

Buds) রয়েছে। তার প্রতিটি নিজস্ব স্বতন্ত্র স্নায়বিক তন্তুর মাধ্যমে মগজের সাথে যুক্ত। এগুলোর মাধ্যমেই তা সর্ব প্রকারের স্বাদ গ্রহণে সক্ষম হয়। শ্রবণেন্দ্রিয়ের এক লক্ষ শ্রবণ কেন্দ্র রয়েছে। এই সব কেন্দ্রের মাধ্যমে আমাদের মগজ শ্রবণ কার্য সম্পাদন করে। প্রতিটি বক্ষে এক শত ত্রিশ মিলিয়ন আলো গ্রহণকারী (Light Receptors) স্নায়ু সূত্র রয়েছে। তা ছবি সমষ্টিকে মগজে প্রেরণ করতে থাকে; তবেই আমাদের দেখার কাজটি সম্পন্ন হয়। আমাদের চর্মে জৈব সূত্রের একটা জাল বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। কোন উত্তপ্ত বস্তু চর্মের কাছাকাছি নিয়ে আসা হলে প্রায় তিন হাজার 'উষ্ণ কূপ' তা অনুভব করে তড়িৎগতিতে তার সংবাদ মগজে পৌঁছে দেয়। অনুরূপভাবে চর্মে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কূপ ঠান্ডা অনুভবের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। কোন ঠান্ডা জিনিস চর্মের সাথে মিলিত হলেই মগজে তার খবর পৌঁছে দেয়। দেহ কাঁপতে থাকে, দেহের শিরা ছড়িয়ে পড়ে, অতিরিক্ত শোণিত ধারা এসব শিরায় দৌড়ে আসে উষ্ণতা পৌঁছানোর জন্য। তীব্র উষ্ণতার মধ্যে পড়ে গেলে তার খবর মগজে পৌঁছায় আর অমনি তিন মিলিয়ন ঘামের মাংস গ্রন্থি (Glands) একটা ঠাণ্ডা রস নিষ্কাষণ শুরু করে দেয়।

স্নায়বিক ব্যবস্থার কয়েকটি বিভক্তি রয়েছে। একটি হচ্ছে Autonomic Branch। তা দেহের অভ্যন্তরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাধিতব্য কার্যাবলী সম্পন্ন করে। হজম, শ্বাস-প্রশ্বাস, হৃৎপিন্ডের সঞ্চালন প্রভৃতি এই পর্যায়ের কাজ। এই স্নায়বিক বিভাগটিরও দুটি অংশ রয়েছে। একটির নাম সংবেদনশীল পদ্ধতি (Sympathetic system)। তা গতির উদ্ভব করে আর অপরটি হচ্ছে Para-sympathetic। প্রতিরোধ শক্তি সক্রিয় রাখাই তার কাজ। গোটা দেহ প্রথমটির আয়ত্তে চলে গেলে— হৃৎপিন্ডের কম্পন বৃদ্ধি পেলে মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। আর সম্পূর্ণ ভাবে দ্বিতীয়টির আয়ত্তে চলে গেলে হৃৎকম্প বন্ধ হয়ে যায়। এ কারণে দুটি শাখা-ই পূর্ণ সুস্থতা সহকারে ও মিলিতভাবে নিজ নিজ কাজ সম্পন্ন করে থাকে। কোন চাপের সময়ে দ্রুত ও তাতক্ষণিক শক্তির প্রয়োজন হলে সংবেদনশীলতা প্রাধান্য পায়। তখন হৃতপিন্ড ও ফুসফুসে খুব দ্রুততা সহকারে কাজ করতে শুরু করে। অনুরূপভাবে নিদ্রাকালে 'প্যারাসিমপ্যাথেটিক'-এর প্রাধান্য ঘটে। তখন তা সমগ্র দৈহিক চাঞ্চল্য ও নড়াচড়ার উপর পূর্ণ নিস্তব্ধতা চাপিয়ে দেয়।' (Readers Digest, October, 1956)

গোটা বিশ্বলোকের প্রতিটি জিনিসেই উক্ত রূপ প্রবল ও ব্যাপক ব্যবস্থা সদা কার্যকর হয়ে আছে। মানবনির্মিত যন্ত্রপাতির সর্বোত্তম ও অত্যাধুনিক জীবনী ব্যবস্থাও এর তুলনায় অত্যন্ত সাধারণ ও ছেলেখেলা মনে হবে। বিজ্ঞান এই বিশ্ব ব্যবস্থারই অনুকরণে নিয়োজিত। শুরুতে বিশ্বপ্রকৃতি নিহিত শক্তিসমূহ উদ্ভাবন ও প্রয়োগ-ব্যবহারই ছিল বিজ্ঞানের একমাত্র কাজ। কিন্তু অধুনা বিজ্ঞানের সমগ্র তৎপরতা নিয়োজিত হয়েছে প্রাকৃতিক ব্যবস্থাসমূহ অনুধাবন ও আয়ত্ত করে তার যান্ত্রিক

www.pathagar.com

অনুকরণের কাজে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এক্ষণে এটাই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এভাবে একটা নতুন বিদ্যা অর্জিত হয়েছে, তার নাম দেয়া হয়েছে Bionics। 'জীববিদ্যা ব্যবস্থা' (Biolobical System) ও পন্থাসমূহের অধ্যয়ন এ উদ্দেশ্যে যে, যে সব তথ্য ও তত্ত্ব তার মাধ্যমে জানা যাবে, তা প্রকৌশলগত সমস্যাসমূহের সমাধান প্রয়োগ করা, একেই বাইওনিক্স বলা হয়।

প্রাকৃতিক ব্যবস্থার অনুকরণের দৃষ্টান্ত প্রকৌশল ক্ষেত্রে যত্র–তত্র লক্ষণীয়। ক্যামেরা মূলত চক্ষু ব্যবস্থার যান্ত্রির অনুকরণের ফল ছাড়া আর কিছুই নয়। ক্যামেরার Lense টা চক্ষুর ঢেলার বাইরের আবরণ, Diaphragm হচ্ছে Iris, আর আলো গ্রহণকারী ফিল্ম হচ্ছে চক্ষুর পর্দা। প্রতিবিম্ব দেখার জন্য তাতে সূতা ও শংকু (Cone) থাকে। ক্যামেরা হঠাৎ করে উদ্ভাবিত হয়েছে, একথা কেউ মনে করে না; কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষ মনেস করে, চক্ষু ঘটনা বশতঃই কপালের উপর বসে গেছে। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে Infrasonic vibrations জানাবার ও তার পরিমাণ করার উদ্দেশ্যে একটি নমুনা যন্ত্র তৈয়ার করা হয়েছে। তা ঝড় তুফান আসার ১২–১৫ ঘন্টা পূর্বে তার আগাম খবর দিতে সক্ষম। এটা প্রচরিত যন্ত্রের তুলনায় পাঁচ গুন বেশী শক্তিশালী। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এরূপ একটি যন্ত্র তৈরীর চিন্তা মানব মনে কে জাগিয়ে দিল?

Jelly Fish শব্দ নিহিত কম্পন অনুভব করণে খুবই দক্ষ। প্রকৌশলীরা এই মাছটির অবয়ব অনুকরণ করেই উক্ত যনত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। (Sovietland, Dec 1963)

প্রাকৃতিক ব্যবস্থার অনুকরণের দৃষ্টান্ত মোটেই বিরণ নয়। পর্দায় বিজ্ঞান ও প্রকৌশলবিদ্যা মূলত নবতর ধারণায় প্রকৃতির জীবন্ত নমুনা সমূহের অনুকরণ থেকেই নবতর ধারণা লাভ করে থাকে। বিজ্ঞানবিদরা যেসব সমস্যার সমাধানে অক্ষম হয়ে পড়েন, প্রকৃতি ব্যবস্থায় বহু পূর্বেই তার সঠিক সমাধান দেয়া হয়েছে বস্তুত ক্যামেরা ও টেলিপ্রিন্টারের ন্যায় একটি ব্যবস্থা যখন মানবীয় মন ছাড়া উদ্ভাবিত হতে পারে নি, অনুরূপ ভাবে গোটা বিশ্বলোক ব্যবস্থা এক মহাশক্তি সম্পন্ন মন ছাড়া স্বতঃই গড়ে উঠেছে বলে মনে করা শুধু হাস্যকরই নয়, চরম নির্বুদ্ধিতারও পরিচায়ক। বিশ্বলোক–ব্যবস্থা ও সংগঠননের জন্য স্বভাবতই এবং অনিবার্য ভাবেই এক মহা প্রকৌশলী ও নির্মাতা ব্যবস্থাপকের প্রয়োজন। আমরা তাঁকেই আল্লাহ্ বলছি। আমাদের মন সংগঠকহীন সংগঠনের ধারণা করতে অক্ষম। তাই বিশ্বলোক ব্যবস্থার জন্য একজন ব্যবস্থাপক ও সংগঠকের প্রতি ঈমান গ্রহণ কোন অযৌক্তিক কাজ নয়, সেই ব্যবস্থাপক সংগঠককে অস্বীকার করাই বরং সম্পূর্ণ যুক্তি ও সুস্থ বিবেক বুদ্ধি পরিপন্থী ব্যাপার। বস্তুত আল্লাহ্কে অস্বীকার করার কোন যুক্তি বা প্রমাণই মানুষের নিকট নেই।

www.pathagar.com

৩. বিশ্বলোক ব্যবস্থা আবর্জনা স্তুপের মত নয়, তাতে নিহিত রয়েছে বিস্ময়কর মহা তাৎপর্য। এই জিনিসই প্রমাণ করে যে, এই বিশ্বলোক সৃষ্টির ও ব্যবস্থাপনা পরিচালনার পশ্চাতে কোন 'মন' সদা সক্রিয় হয়ে আছে। কোন 'মন' এর সুপরিকল্পিত কার্যক্রম ব্যতিরেকে কোন কোন জিনিসেই তাৎপর্যগত গভীরতা সৃষ্টি হতে পারে না। নিছক অন্ধ বস্তুগত কার্যক্রমের ফলে আকস্মিক ভাবে অস্তিত্ব সম্পন্ন হয়ে উঠা বিশ্বলোকে ধারাবাহিকতা, ক্রমিকতা, সুবিন্যাস, সুসংগঠন ও তাৎপর্যগত যথার্থতা পাওয়ার কোনই কারণ থাকতে পারে না বিশ্বলোকে বিস্ময়কর ভারসাম্যতা, উপযোগিতা ও আনুপাতিকতা বিদ্যমান তা স্বতঃই চালু হয়েছে, ঘটনাবশতই তা কাজ করতে শুরু করেছেম, এমন কথা কল্পনাও করা যায় না। Chadvalsh-এর ভাষায়ঃ

'কেউ স্রষ্টাকে মানুক আর অস্বীকারই করুক, যুক্তিসঙ্গতভাবেই তাকে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে যে, দুর্ঘটনার ভারসাম্যটি তার পক্ষে চলে গেল কি ভাবে?' (The Evidence of God, P-88, 1962)

পৃথিবীতে জীবনের উন্মেষ ও অবস্থিতির পশ্চাতে অনিবার্যভাবে রয়েছে বহু শত রকমের অবস্থার অবস্থিতি। সেগুলির বিশেষ আনুপাতিক হার অনুযায়ী নিছক ঘটনাবশতই একত্রিত হয়ে যাওয়া গাণিতিক হিসাবেও সম্পূর্ণ অসম্ভব। যদি তা–ই হয়ে থাকে এবং সেই সব অবস্থার বর্তমানতার ফল স্বরূপ এখানে জীবনের উন্মেষ ও অবস্থিতি সম্ভবপর হয়ে থাকে, তা হলে মানতেই হবে যে, সেই সব অবস্থার উদ্ভব ঘটানোর কারন স্বরূপ বিশ্ব প্রকৃতির কোন সচেতন সত্তার সক্রিয়তা বিদ্যমান।

সমগ্র বিশ্বলোকের তুলনায় পৃথিবী গ্রহটি একটি বিন্দুর অধিক কিছু নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের জানা দুনিয়াসমূহের মধ্যে তার গুরুত্ব সর্বাধিক। কেননা তার মধ্যেই বিস্ময়কর বাবে এমন সব অবস্থার উদ্ভব ঘটেছিল, যা আমাদের জ্ঞান অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বলোকের কোথাও পাওয়া যায় না।

পৃথিবরি আয়তনটার কথাই ধরা যাক। তার আয়তন বর্তমানের তুলনায় কম বা বেশী হরে একানে জীবনের উন্মেষ সম্ভবপর হতো না। পৃথিবী গোলক যদি চাঁদের আকার সমান ক্ষুদ্র–বর্তমানের আয়তনের চার ভাগের একভাগ হতো, তাহলে তার মধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর বর্তমান মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ছয় ভাগের এক ভাগ থাকত। আর তা হলে পৃথিবী পানি ও বাতাসকে নিজের উপর টেনে রাখতে পারত না। আয়তনের এই ঘাটতির কারণেই বর্তমানে চাঁদে পানি নেই, বাহাসও নেই। বাতাসের আচ্ছাদন না থাকার দরুন চাঁদ রাতের বেলা খুবই ঠান্ডা হযে যায় এবং দিনের বেলা উত্তপ্ত হয়ে চুল্লির মত জ্বলতেম থাকে পৃথিবীর আয়তন এখানকার তুলনায় কম হলে আকর্ষণ শক্তির হ্রাস প্রাপ্তির দরুন বিপুল পরিমাণ পানি ধরে না রাখতে পারার কারণে এখানকার আবহাওয়া ভারসাম্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যেত এবং পৃথিবী মানুষের বাসের

www.pathagar.com

অনুপযুক্ত হয়ে পড়ত। এই কারণেই জনৈক বিজ্ঞানী পানিকে 'বিরাট ভারসাম্য রক্ষাকারী চাকা' (Great Balance Wheel) নামে অভিহিত করেছেন। অপরদিকে বাতাসের বর্তমান অবস্থান মহাশূন্রে মিলিয়ে গেলে পৃথিবী পৃষ্ঠ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে চরম অবস্থার সৃষ্টি করত। আর হ্রাস পেলে চরম মাত্রায় হ্রাস পেত। পক্ষান্তরে পৃথিবীর আয়তন বর্তমানের তুলনায় দ্বিগুণ হরে তার মাধ্যাকর্ষণও দ্বিগুণ হযে যেত এবং তার ফল এই হতো যে, বর্তমানে পৃথিবীর উপর যে বাতাস পাঁচ মত মাইর উচ্চ পর্যন্ত পাওয়া যায়, তা খুব নীচে এসে গুটিয়ে যেত। তার চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১৫ থেকে ৩০ পাউন্ড পর্যন্ত বৃদ্ধি পেযে যেত। আর প্রাণীকুলের জীবনের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া নানাভাবে খবুই মারাত্মক হয়ে দেখা দিত।

অপর দিকে পৃথিবী যদি সূর্যের মত বড় হতো এবং তার দূরত্ব যথাযথ থাকত, তা হলে তার মাধ্যাকর্ষণ মক্তি দেড় শতগুণ বেড়ে যেত। তার ফলে বাতাসের চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে এক মাইলের পরিবর্তে শুধু চার মাইল থেকে যেত। তার ফলে বাতাসের চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে এক টন পর্যন্ত পৌছে যেত। এই অস্বাবাবিক চাপের দরুন জীবন্ত দেহগুলির প্রবৃদ্ধি সম্ভব হতো না। এক পাউন্ড জন্তুর ওজন এক শত পঞ্চাশ পাউন্ড হয়ে যেত। মানুষের দেহ চড়ুই পাখীর মত ক্ষুদ্রাকার হয়ে যেত এবং তাতে কোন রূপ মানসিক ও চৈন্তিক শক্তির উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা থাকত না। কেননা মানসিক মক্তি লাভের জন্য বিপুল পরিমাণে স্নায়বিক সূত্র থাকা একান্ত আবশ্যক। এ ধরনের ছড়ানো ছিটানো রগ-রেশা ব্যবস্থা থাকার জন্য এক বিশেষ মাত্রার দেহসত্তারও প্রয়োজন।

বাহ্যত আমরা পৃথিবীর উপরিবাগে উর্ধ্বমুখী অবস্থায় অবস্থান করছি; অধিক সত্য কথা হচ্ছে, আমারা তার নীচের দিকে উল্টো মাথায় ঝুলে রয়েছি। পৃথিবীটা মহাশূন্যে ঝুলন্ত থাকা একটা বলের মত। তারই চারদিকে মানুষ অবস্থান করছে আমরা উপমহাদেশের লোকেরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, তার ঠিক বিপরীত উপরের দিকে অবস্থিত হচ্ছে আমেরিকা। আমেরিকায দাঁড়ানো লোকেরা আবার এ অঞ্চলের নীচে অবস্থিত। পৃথিবীর স্তব্ধ স্থিত নয়, প্রতি ঘন্টায় এক হাজার মাইল গতিতে ক্রমাগত আবর্তিত হচ্ছে। এরূপ অবস্থায় পৃথিবীর উপর আমাদের অবস্থানটা ঠিক সেরূপ হওযাই স্বাভাবি ছিল, যেমন দ্রুতগতিতে চলমান সাইকেলের চাকার উপর রক্ষিত প্রস্তুর কণার হয়ে থাকে; কিন্তু তা হচে না। কেননা একটা বিশেষ অনুপারে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ও বাতাসের চাপ আমাদেরকে পৃথিবীর উপর স্থিত করে রাখছে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে একটা অসাধারণ মাধ্যাকর্ষণ রয়েছে। তা সব জিনিসই নিজের দিকে তীব্রভাবে টেনে রাখছে সেই সাথে উপর তেকে বাতাসের চাপও রয়েছে। এই দ্বিবিধ শক্তিই আমাদেরকে পৃথিবী গোলকের উপর চারদিকে ঝুলিয়ে রাখছে বাতাসের যে চাপ পড়ে, তা দেহের প্রতি বর্গ ইঞ্চির উপর প্রায় সাত সের পর্যন্ত জানা গেছে অর্থাৎ মাঝারি ধরনের ব্যক্তির গোটা দেহের উপর প্রায় ২৮০ মণ চাপ পড়ছে, যদিও কেউই এই ভারী বোঝাটা

www.pathagar.com

অনুভব না করে আনায়াসেই বহন করে চলেছে। কেননা বাতাস তো দেহের চার দিক থেকে চাপ দিচ্ছে। পানির মধ্যে ডুব দিলেও এই রকমটাই হয়। এছাড়া বাতাস হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার গ্যাসের সংমিশ্রণ। তার আরও বহু বিপুল কল্যাণ রয়েছে, যা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না।

নিউটন তাঁর অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণের ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, সব দেহই পরস্পরকে আকর্ষণ করে। কিন্তু কেন আকর্ষণ করে, সে প্রশ্নের কোন জবাব তাঁর নিকট ছিল না। তিনি স্বীকার করেছেন, আমি তার কোন বিশ্লেষণ দিতে পারছি না।

A. N. White Head তাঁর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেনঃ

এই কথা বলে নিউটন এক বিরাট দার্শনিক সত্যকে প্রকাশ করেছেন। কেননা প্রকৃতি যদি প্রাণহীন হয়ে থাকে, তাহলে তা আমাদেরকে কোন বিশ্লেষণ দিতে পারে না, ঠিক যেমন মৃত লাশ কোন ঘটনার বর্ণনা দিতে পারে না। সমস্ত বিবেকসম্মত ও যৌক্তিক বিশ্লেষণ সর্বশেষভাবে একটি উদ্দেশ্যবাদের প্রকাশ। অথচ মৃত বিশ্বলোকে কোনরূপ উদ্দেশ্যবাদের কল্পনা করা যায় না। (The Age of Analysis-p-85)

হোয়াইট হেড্-এর কথাটিকে সমুখে অগ্রসর করে নিয়ে বলা যেতে পারে, এই বিশ্বলোক যদি কোন চেতনাসম্পন্ন সত্তার ব্যবস্থাধীনে পরিচালিত না হয়ে থাকে, তাহলে তাতে এত অর্থপূর্ণতা, সুগভীর তাৎপর্য পাওয়া যাচ্ছে কেন?

পৃথিবী তার অক্ষের উপর চব্বিশ ঘন্টায় একবারের আবর্তন পূর্ণ করে। অথবা বলা যায়, প্রতি ঘন্টায় এক হাজার মাইল বেগে আবর্তিত হচ্ছে। এই গতি যদি ঘন্টায় দু' শ' মাইল হয়ে যায়—যা আদৌ অসম্ভব নয়—তাহলে এখানকার দিন ও রাত এখনকার তুলনায় দশ গুণ দীর্ঘ হয়ে যাবে। গ্রীষ্মকালের দিনগুলোতে সূর্যের প্রখর তাপ গাছপালাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবে। যা অবশিষ্ট থাকবে, তা দীর্ঘ রাত্রির শৈত্যে ঘুমের শিকার হবে। সূর্য আমাদের জীবনের উৎস। তার উপরিভাগের তাপমাত্রা হচ্ছে বারো হাজার ডিগ্রী ফারেনহাইট্। আর পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব প্রায় নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল এবং বিস্ময়করভাবেই এই দূরত্বটা স্থায়ী ও অপরিবর্তিত হয়েছে। এ ব্যাপারটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই দূরত্ব হ্রাস প্রাপ্ত হলে—মনে করুন, অর্ধেক দূরত্ব কমিয়ে সূর্য আরও নিকটে এসে গেলে—পৃথিবীর উপর যে তাপ বর্ষিত হতো, তাতে কাগজও জ্বলে যেত। পক্ষান্তরে বর্তমান দূরত্ব যদি দ্বিগুণ হয়ে যায়, তাহলে পৃথিবীর শীতলতার মাত্রা এত বেড়ে যাবে যে, এখানে জীবন-ই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। আর বর্তমানের সূর্যের স্থানে যদি একটা অসাধারণ তারকা এসে যায়—যেমন

www.pathagar.com

সূর্যের তুলনায় দশ হাজার গুণ বেশী তাপসম্পন্ন যে বড় তারকাটি রয়েছে, তাই এসে যায়, তাহলে পৃথিবীটা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

পৃথিবী সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছে, বিজ্ঞানীদের এই ধারণা যদি সত্য হয়, তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায় যে, শুরুতে পৃথিবীর তাপমাত্রা সূর্যের তাপমাত্রার সমান ছিল। আর তা হচ্ছে বারো হাজার ডিগ্রী ফারেনহাইট। অতঃপর তা ক্রমশঃ শীতল হতে শুরু করেছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা হ্রাস পেয়ে চার হাজার ডিগ্রী ফা. না হওয়া পর্যন্ত এখানে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন মিলিত হতে পারেনি। এরূপ হওয়ার পরই উভয় গ্যাসের সংমিশ্রণে পানি পাওয়া গেল। তারপর কোটি কোটি বৎসর পর্যন্ত পৃথিবীর উপরিভাগ ও তার শূন্যলোকে বহু বিপ্লবাত্মক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সম্ভবত আজ থেকে এক মিলিয়ন বছর পূর্বে পৃথিবী বর্তমান রূপে তৈরী হয়েছে। পৃথিবীর শূন্যলোকে যে সব গ্যাস পুঞ্জীভূত হয়ে ছিল, তার বড় অংশ মহাশূন্যে উঠে গেছে, একাংশ পানির রূপ পরিগ্রহ করেছে, একটি অংশ পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগে শোষিত হয়ে গেছে, আর একটি অংশ বাতাস রূপে আমাদের শূন্যলোকে প্রবহমান হয়ে আছে। তার বেশীর ভাগ অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন মিশ্রিত। এই বাতাসের ঘনত্ব পৃথিবীর প্রায় দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ। প্রশ্ন হলো, সমস্ত গ্যাস শোষিত হয়ে গেল না কেন? বর্তমানের তুলনায় বাতাসের পরিমাণ অধিক হলো না কেন? যদি সেটাই হতো, তাহলে এখানে মানুষ বেঁচে থাকতে পারত না। বৃদ্ধি প্রাপ্ত পরিমাণের গ্যাসের প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে কয়েক হাজার পাউন্ডের বোঝার তলায় জীবনের উন্মেষ হলেও তা মানুষের আকার আকৃতিতে ক্রম–বর্ধিত হতে পারত না।

পৃথিবীর উপরিস্তর মাত্র দশ ফুট পুরু হলে আমাদের শূন্যলোকে অক্সিজেন থাকত না। আর তা না থাকলে এখানে প্রাণীকুলের জীবন সম্ভবপর হতো না। অনুরূপভাবে সমুদ্র যদি আরও কয়েক ফুট গভীর হতো, তাহলে কার্বন ডাই–অক্সাইড ও অক্সিজেন শুষে নিত এবং পৃথিবীর উপরিভাগে কোন উদ্ভিদই বেঁচে থাকতে পারত না।

পৃথিবীর উপরিভাগের বাতাসময় শূন্যলোকে যদি বর্তমানের তুলনায় আরও পাতলা ও সূক্ষ্ম হতো, তাহলে যে উল্কা প্রতিদিন গড়ে দুই কোটি সংখ্যার উপর শূন্যলোকে প্রবেশ করে এবং রাত্রিবেলা জ্বলে যেতে দেখা যায়, তা পৃথিবীর সকল অংশে নিপতিত হতো। এই উল্কাপিন্ডসমূহ প্রতি সেকেন্ডে ছয় থেকে চল্লিশ মাইল বেগে চলে। তা পৃথিবীর উপরস্থ সকল দাহ্য পদার্থকেই জ্বালিয়ে দিত, ভূ–পৃষ্ঠকে চালুনীর মত ছিদ্রময় বানিয়ে দিত। উল্কাপিন্ডগুলো মানুষকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দিত। কিন্তু বর্তমানে বাতাসের স্তর অত্যন্ত শোভন পুরুত্বের কারণে আমাদের অগ্নি বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে চলছে। বাতাসের পুরুত্ব এতটা ঘন যে, সূর্যের রাসায়নিক তেজক্রিয়া (Actinic

www.pathagar.com

Rays) এতটা পরিমিতভাবে পৃথিবীতে পৌঁছায় যতটা উদ্ভিদগুলোর বেঁচে থাকার জন্য জরুরী। তার ফলে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস হচ্ছে ও ভিটামিন তৈরী হতে পারছে।

পরিমাণের এই আনুপাতিকতা ঠিক আমাদের প্রয়োজন মতো হওয়াটা কি সাংঘাতিক বিস্ময়ের ব্যাপার নয়?

পৃথিবীর উপরিভাগের শূন্যলোক ছয় ধরনের গ্যাসের সমষ্টি। তাতে শতকরা পঁচাত্তর ভাগ নাইট্রোজেন ও একুশ ভাগ অক্সিজেন রয়েছে। অবশিষ্ট গ্যাসসমূহ খুবই হাল্কা অনুপাতে পাওয়া যায়। এই শূন্যলোক থেকে পৃথিবীর উপরিভাগে প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে পনের পাউন্ড চাপ পড়ে। তাতে অক্সিজেনের অংশ হচ্ছে প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে তিন পাউন্ড সমান। বর্তমান অক্সিজেনের অবশিষ্ট অংশ মাটির স্তরসমূহে শোষিত হয়েছে। আর তা সারা দুনিয়ার সমস্ত পানির দশ ভাগের আট ভাগ। অক্সিজেন সমস্ত শুষ্ক এলাকার জন্তু-জানোয়ারের শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যম। এই উদ্দেশ্যে শূন্যলোক ছাড়া আর কোথাও থেকে তা অর্জন করা যায় না।

এখানে প্রশ্ন জাগে, এই চরম মাত্রার চলমান গ্যাসসমূহ কিভাবে পরস্পর সংমিশ্রিত হলো এবং জীবনের সাথে পূর্ণ সংগতিসম্পন্ন পরিমাণে ও অনুপাতে তা শূন্যলোকে অবশিষ্ট থাকল? এই অক্সিজেন যদি শতকরা একুশ ভাগের পরিবর্তে পঞ্চাশ ভাগ অথবা তারও বেশী পরিমাণে শূন্যলোকের অংশ হতো, তাহলে ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত দাহ্য পদার্থের দাহ্যতা এতই বৃদ্ধি পেত যে, একটি গাছে আগুন লেগে যেতেই সমস্ত জংগল মুহূর্তে ভষ্ম হয়ে যেত। আ তার আনুপাতিকতা হ্রাস পেয়ে শতকরা দশ ভাগ অবশিষ্ট থাকলে জীবন হয়ত শত শত বর্ষ পরে তার সাথে খাপ খাওয়াতে পারত। কিন্তু মানব সভ্যতা বর্তমানের রূপে কখনোই উৎকর্ষ লাভ করতে পারত না। আর মুক্ত গ্যাসসমূহ যদি অবশিষ্ট গ্যাসের ন্যায় পৃথিবীর সব জিনিসে শোষিত হয়ে যেত, তাহলে এখানে কোন প্রাণীরই বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না।

অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও কার্বন গ্যাসসমূহ আলাদা আলাদা ও বিভিন্ন রূপে সংমিশ্রিত ও যৌগিক হয়ে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জীবন তারই উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। এগুলোর একই সময়ে একই গ্রহে এই বিশেষ অনুপাত সহকারে স্বতঃই একত্রিত হয়ে যাওয়া এক হাজার কোটিতে এক বারের সমান সম্ভাবনাও নেই। জনৈক পদার্থবিদের উক্তি হচ্ছেঃ

> Science has no explanation to offer for the facts and to say it is accidental is to defy mathematics.

এসব সত্যের ও বাস্তবতার ব্যাখ্যাদানের জন্য বিজ্ঞানীদের নিকট কোন বক্তব্য নেই। একে দুর্ঘটনা বলাটাও অংক বিদ্যার সাথে মল্লযুদ্ধ করার শামিল।

www.pathagar.com

এভাবে অসংখ্য ব্যাপার ও ঘটনা আমাদের জীবনে বাস্তব হয়ে রয়েছে যার ব্যাখ্যা বা কারণ নির্ধারণ করতে গিয়ে এক উচ্চতর মহান মনের প্রত্যেক সৃষ্টিক্ষমতার দখল ও তার প্রত্যক্ষ কার্যকরতা স্বীকার না করে কোনই উপায় থাকে না।

পানিতে বিভিন্ন ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্বসমূহ রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, বরফের ঘনত্ব ও নিবিড়ত্ব (Density) পানির তুলনায় কম। পানি জমা বস্তুসমূহের মধ্যে এমন অনন্য, যা জমে যাওয়ার পর হালকা হয়ে যায়। জীবনের স্থিতির জন্য এটা বিরাট গুরুত্বের অধিকারী। এই কারণেই বরফ পানির উপরিভাগে ভাসতে পারছে, তা নদী–সমুদ্রের গভীর তলদেশে বসে থাকতে পারে না। অন্যথায় সমস্ত পানিই ধীরে ধীরে শক্ত ও প্রস্তরীভূত হয়ে যেত। তা পানির উপর একটা প্রতিবন্ধক স্তর হয়ে থাকে, তার নীচে তাপ–মাত্রা হিমাংকের (Freezing point) থেকে উপরের দিকেই থাকে। এ এক অনন্য বিশেষত্ব, যার কারণে মৎস্য এবং অন্যান্য জলজ জীবগুলো বেঁচে থাকতে পারছে। তারপর বসন্তকাল এলেই বরফ গলে যায়। পানিতে এই বিশেষত্বটি না থাকলে বিশেষ করে শীতপ্রধান দেশসমূহের লোকদের কঠিন অসুবিধার মধ্যে পড়ে যেতে হতো।

বিংশ শতকের শুরুতে আমেরিকায় Endothia নামের একটা রোগ বাদাম গাছের উপর আক্রমণ করে এবং খুব তীব্র গতিতে তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় জংগলের বৃক্ষ শ্রেনীতে ফাঁক দেখে বহু লোকই বলল যে, এই ফাঁক আর কখনোই পূর্ণ হবে না।

কিন্তু জংগলের এই ফাঁক খুব শীঘ্রই পূর্ণ হয়ে গেল। কেননা জংগলের অন্যান্য কিছু গাছ সম্ভবতঃ বৃদ্ধি লাভের জন্য এই ফাঁকের অপেক্ষায় ছিল। তখন পর্যন্ত সেই ফাঁক পায়নি বলে সে গাছগুলো বৃদ্ধি ও বিকাশ লাভ করতে পারেনি। কিন্তু এক্ষণে বাদাম গাছের অবর্তমানে সে গাছগুলো দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে ফাঁক পূর্ণ করে দিল। ফলে লোকেরা আর সেই ফাঁকের ব্যাপারটি অনুভব করতে পারলো না। অর্থাৎ এক ধরনের গাছের অনুপস্থিতিতে অন্য ধরনের গাছ বৃদ্ধি পেয়ে শূন্য স্থান পূরণ করে দিল।

বর্তমান শতকের আরও একটি ঘটনা। অষ্ট্রেলিয়ায় ক্ষেতের বেড়া তৈরীর জন্য নাগফণী নামের এক প্রকারের গাছ বপন করা হয়েছিল। সেখানে এই গাছের শত্রু কোন পোকা ছিল না। এ কারণে তা খুবই দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধি পেল। এমন কি ইংলন্ডের সমান এলাকাকে আছন্ন করে ফেলল। তা শস্য–ক্ষেত পর্যন্ত দখল করে নিয়ে চাষাবাদকে অসম্ভব করে তুলল। এর বিরুদ্ধে কোন পন্থাই তার প্রতিরোধে কার্যকর হলো না। ফলে নাগফণী গাছ অষ্ট্রেলিয়াকে বিজয়ী সেনা–বাহিনীর মতই গ্রাস করে ফেলল। শেষ পর্যন্ত ভূ–বিজ্ঞানীরা বহু সন্ধানের পর এমন এক ধরনের পোকার সন্ধান পেলেন, যারা নাগফণী খেয়ে বেঁচে থাকে, খুব দ্রুত গতিতে নিজেদের বংশ বৃদ্ধি করে

www.pathagar.com

ও চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়। অষ্ট্রেলিয়ায় তার শত্রুও ছিল না কেউ বা কিছু। এই পোকাই শেষ পর্যন্ত গোটা দেশ আছন্নকারী নাগফণীকে নির্মূল করে দিল। এক্ষণে দেশটি এই বিপদ থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা পেয়ে গেছে।

বস্তুতঃ এ হচ্ছে প্রকৃতির নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য রক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা কি কোন 'সচেতন পরিকল্পনা' ব্যতিরেকে স্বতঃই কার্যকর হতে পারে?

বিশ্বলোকে বিস্ময়কর মাত্রার গাণিতিক নিশ্চয়তা সদা কার্যকর। আমাদের সমুখবর্তী নিষ্প্রাণ চেতনা-বর্জিত বস্তু বা জড়-এর কার্যক্রম অসংগঠিত ও অবিন্যস্ত নয়। তা একটা সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীন। 'পানি' শব্দটি দুনিয়ার যেখানেই এবং যখনই বলা হবে, তার একটি মাত্র তাৎপর্য বোঝা যাবে; আর তা হচ্ছে, এমন একটা যৌগিক, যাতে শতকরা ১১'১ হাইড্রোজেন এবং শতকরা ৮৮'৯ অক্সিজেন বিদ্যমান। বিজ্ঞানী যখন গবেষণাগারে প্রবেশ করে পানিভর্তি কোন পাত্রকে উত্তপ্ত করবেন, তিনি থার্মোমিটার ছাড়াই বলতে পারবেন যে, ১০০ সেন্টিগ্রেডই হচ্ছে তার উত্তপ্ত হওয়ার সর্বশেষ মাত্রা—যতক্ষণ পর্যন্ত বাতাসের চাপ (Atmospheric pressure) ৭৬ এম· এম, থাকবে। বাতাসের চাপ তার চাইতে কম হলে সেই মাত্রার তাপ পাওয়ার জন্য কম শক্তির প্রয়োজন হবে, যা পানির অণুগুলো চূর্ণ করে বাষ্পে পরিণত করবে। এতে করে উত্তাপের মাত্রা এক'শ সেন্টিগ্রেড থেকে কম হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে বাতাসের চাপ ৭৬০ এম· এম-এর অধিক হলে উত্তাপের সর্বোচ্চ মাত্রাও সেই অনুপাতে অধিক হবে। এটা বহু বারই পরীক্ষা করা হয়েছে এবং আরও যত বার পরীক্ষা করা হবে, পূর্বেই নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা যাবে, পানির উত্তপ্ত হওয়ার সর্বোচ্চ মাত্রা কত। বস্তু ও শক্তির কার্যক্রমে এই নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা পাওয়া না গেলে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উদ্ভাবনীর জন্য কোন ভিত্তিই পাওয়া যেত না। কেননা তখন তো দুনিয়ায় শুধু আকস্মিকতা ও দুর্ঘটনারই একত্র রাজত্ব হতো এবং অমুক অবস্থায় অমুক পন্থায় কাজ করলে এরূপ ফল পাওয়া যাবে—পদার্থবিদ্‌দের পক্ষে এরূপ কথা বলা কখনই সম্ভবপর হতো না।

রসায়নের ক্ষেত্রে নব্য-শিক্ষার্থীরা সর্বপ্রথম মৌল উপাদানে এক শৃঙ্খলা ও পুনরাবৃত্তি পর্যবেক্ষণ করে। শতবর্ষ পূর্বে Mendleev নামক জনৈক রুশ রসায়নবিদ আণবিক মূল্যের বিচারে বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান সুবিন্যস্ত করেছিলেন। তাকে বলা হতো Periodic chart। তখন পর্যন্ত বর্তমানের সবগুলি মৌল উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়নি বলে তাঁর এ চার্টে বেশ কয়েকটি কোঠা শূন্য পড়েছিল। পরবর্তী কালে ঠিক অনুমান মতই তা পূর্ণ হয়ে যায়। এসব চার্টে সমগ্র উপাদান আণবিক সংখ্যানুপাতে স্বীয় বিশেষ গ্রুপে সন্নিবেশিত করা হয়। আণবিক সংখ্যা বলতে বোঝায় পরমাণুর কেন্দ্রে অবস্থিত সংখ্যক প্রোটন (Protons)। এই সংখ্যাটাই এক উপাদানের

www.pathagar.com

পরমাণু ও অপর উপাদানের পরমাণুর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। সবচেয়ে সরল উপাদান হচ্ছে হাইড্রোজেন। তার পরমাণু কেন্দ্রে একটি প্রোটন থাকে, হেলিয়ামে দুটি এবং লেথিয়ামে তিনটি থাকে। এভাবে বিভিন্ন উপাদানের তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভবপর হয়েছে এ কারণে যে, তাতে বিস্ময়করভাবে একটি গাণিতিক নীতি সদা কার্যকর রয়েছে। এ হচ্ছে নিয়ম শৃঙ্খলা ও বিন্যাসের একটা উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত। ১০১ সংখ্যার উপাদান চিনতে পারা গেছে শুধু তার ১৭ প্রোটন অধ্যয়নের সাহায্যে। প্রাকৃতিক এই বিস্ময়কর সংগঠনকে আমরা Periodic chance বলতে পারি না। একে বলতে হবে Periodic Law। আর এই নিয়ম-শৃঙ্খলা বিন্যাসের জন্য একজন ব্যবস্থাকারী পরিকল্পকের প্রয়োজন যে অনস্বীকার্য, তা কোন ক্রমেই ভুলে যাওয়া উচিত নয়। তাই বলতে হচ্ছে, আধুনিক বিজ্ঞান যদি স্রষ্টাকে অস্বীকার করে, তাহলে তা স্বীয় গবেষণার নির্ভুল ও অনিবার্য সিদ্ধান্তকেই অস্বীকার করে, যা অন্ততঃ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কাম্য নয়, কল্পনীয়ও নয়।

১৬৯৯ সনের ১১ আগষ্ট একটি সূর্যগ্রহণ হবে, যা করনাওয়াল থেকে পুরোপুরি অবলোকন করা যাবে। এটা একটা ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। কিন্তু তা নিছক অনুমান ভিত্তিক ছিল না। খগোল বিজ্ঞানীরা দৃঢ় প্রত্যয় নিয়েই এই ঘোষণা দিয়েছিলেন। তাদের বিশ্বাস ছিল, সৌর ব্যবস্থার বর্তমান আবর্তন ধারায় এই গ্রহণটা একান্তই নিশ্চিত। আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সংখ্যাতীত তারকাকে একই শৃঙ্খলে সজ্জিত দেখে বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। অগণিত শতাব্দীকাল থেকে মহাশূন্যে যেসব গোলক ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে, সেসব একই নির্দিষ্ট পথে আবর্তিত হচ্ছে। সেগুলো নিজস্ব অক্ষে এমন নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে আসা যাওয়া করছে যে, সেগুলোর অবস্থান-স্থলে এবং সেগুলোর মধ্যে সংঘটিতব্য ঘটনাবলী সম্পর্কে কয়েক শ' বছর পূর্বেও সম্পূর্ণ নির্ভুল অনুমান করা চলে। পানির একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিন্দু থেকে শুরু করে মহাশূন্যে বিস্তীর্ণ দূরবর্তী তারকা নক্ষত্রসমূহ পর্যন্ত এক দৃষ্টান্তহীন নিয়ম শৃঙ্খলা কার্যকর রয়েছে। ফলে সেগুলোর কার্যক্রম ব্যতিক্রমহীন, আমরা তার ভিত্তিতে এই দুনিয়ায় অতি সহজেই আইন তৈরী করতে পারি।

নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ আকাশ মার্গীয় গোলকগুলোর আবর্তনের একটা ব্যাখ্যা দিয়েছে, যার উপর ভিত্তি করে A. C. Adams ও U. Leerier না দেখেই এবং তখন পর্যন্ত না জানা একটা গ্রহের অস্তিত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। উত্তর কালে ১৮৪৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসের এক রাত্রিতে বার্লিন অবজার্ভেটরীর দূরবীক্ষণ যন্ত্র তাদের প্রদর্শিত দিকের আকাশ-লোকের দিকে ঘোরাতেই উক্ত গ্রহটি স্পষ্ট পরিলক্ষিত হলো, সৌর গ্রহের অভ্যন্তরে অনুরূপ একটি গ্রহ অবস্থান করছে। এই গ্রহটিরই বর্তমান নামকরণ হচ্ছে নেপচুন (Neptune)।

www.pathagar.com

কী সাংঘাতিক অকল্পনীয় ব্যাপার এটি! বিশ্বলোকে এই গাণিতিক নিশ্চয়তা স্বতঃই কার্যকর হয়েছে, কোন বোকা লোকও কি তা ধারণা করতে পারে?

বিশ্বলোকে নিহিত যৌক্তিকতা ও অর্থপূর্ণতার আরও একটি দিক রয়েছে। তাতে এত সব সম্ভাবনা সংরক্ষিত যে, মানুষ যথাসময়ে হস্তক্ষেপ করে তাকে নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারে। নাইট্রোজেন এর ব্যাপারটি পর্যালোচনা করলেই তা বোঝা যাবে। বাতাসের প্রতি প্রবাহে শতকরা ৭৮ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। তা ছাড়াও তাতে থাকে বহু রাসায়নিক উপাদানের অংশ। ফলে তাকে যৌগিক নাইট্রোজেন বলা যায়। গাছের অংকুর ও চারা এই নাইট্রোজেন পায়, আমাদের খাদ্যের নাইট্রোজেন অংশও তা থেকেই আসে। তা না হলে মানুষ ও জীবগুলো ক্ষুধায় মরে যেত।

মাত্র দুটি উপায়েই বিশ্লেষণযোগ্য যে, নাইট্রোজেন মাটির সাথে মিশ্রিত হয়ে সারে পরিণত হয়। এই নাইট্রোজেন মাটির সাথে মিশ্রিত না হলে কোন খাদ্য ফসল বা চারা জন্মাতে পারে না। নাইট্রোজেনের মাটির সাথে মিশ্রিত হওয়ার একটি পন্থা হচ্ছে ব্যাকটেরীয় প্রতিক্রিয়া। তা ব্যাকটেরিয়া সম্পন্ন চারার শিকড়ের মধ্যে থাকে এবং বাতাস থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে তাকে সংমিশ্রিত নাইট্রোজেনের রূপ দিতে থাকে। চারাটি শুকিয়ে শেষ হয়ে গেলে এই মিশ্রিত বা যৌগিক নাইট্রোজেনের কিছু অংশ মাটিতে মিশে থাকে।

মাটির নাইট্রোজেন লাভের দ্বিতীয় পন্থা হচ্ছে বিদ্যুতের চমক। যখনই শূন্যলোকে বিদ্যুতের প্রবাহ ঘটে, প্রতি–বারই তা কিছু পরিমাণ অক্সিজেনকে নাইট্রোজেনের সাথে মিশ্রিত করে দেয় এবং বৃষ্টির সাহায্যে আমাদের ক্ষেত–খামারে পৌঁছে যায়। এ পন্থায় যে নাইট্রিট নাইট্রোজেন সহজে পাওয়া যায়, বছরে এক একর জমিতে তার আনুমানিক পরিমাণ হচ্ছে পাঁচ পাউন্ড, তা ত্রিশ পাউন্ড সোডিয়াম নাইট্রেটের খরচ।[১]

আসলে এই দু'টি প্রক্রিয়াই অযথেষ্ট ছিল। এই কারণেই যে ক্ষেতে দীর্ঘ কাল ধরে চাষাবাদের কাজ হয়ে আসছে, সে সবের নাইট্রোজেন নিঃশেষ হয়ে যায়। আর এ জন্যই চাষী ফসলের রদ–বদল করে থাকে। বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে ঠিক যে সময়ে জন–সংখ্যা বৃদ্ধি ও বেশী চাষাবাদের দরুন যৌগিক নাইট্রোজেনের স্বল্পতা অনুভূত হতে লাগল, ঠিক সেই সময়ই বাতাসের সাহায্যে কৃত্রিমভাবে যৌগিক নাইট্রোজেন বানানোর প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হলো,—এটা কি কম বিস্ময়ের ব্যাপার? যৌগিক নাইট্রোজেন বানানোর জন্য নানা প্রক্রিয়ায় চেষ্টা চালিয়ে আসা হচ্ছিল। একটি প্রক্রিয়া ছিল, শূন্যলোকে কৃত্রিমভাবে বিদ্যুতের চমক সৃষ্টি করা। বলা হয়, বাতাসের বিদ্যুতের চমক সৃষ্টির জন্য প্রায় তিন লক্ষ অশ্ব–শক্তির প্রয়োগ করা হয়েছে। পূর্বে যেমন অনুমান করা গিয়েছিল, তাতে খুব সামান্য পরিমাণ নাইট্রোজেন তৈরী হয়েছিল। কিন্তু এক্ষণে

১. Lyon, Bockman and Brady. The Nature and Properties of Soils

www.pathagar.com

মানুষের পক্ষে আল্লাহ্ প্রদত্ত চিন্তা-শক্তির সাহায্যে আরও এক পা অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়েছে এবং মানব-ইতিহাসের দশ সহস্র বছর পর এই গ্যাসকে সারে পরিবর্তিত করার পন্থাসমূহ করায়ত্ত হয়েছে। এর ফলেই মানুষ তার খাদ্যের সেই অপরিহার্য অংশ তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে, যা না হলে তাকে অভুক্ত থেকে মরতে হতো। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম বার যথাসময়ে মানুষ খাদ্যাল্পতা সমস্যার সমাধানের পন্থা উদ্ভাবিত করতে পারল। বিপদটি ঠিক যে মুহূর্তে মাথার উপর এসে পুঞ্জীভূত হচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই তা দূর করার পন্থাও আয়ত্তাধীন হলো। এটা কি শুধু হঠাৎ ঘটে যাওয়া ব্যাপার মাত্র?

এই বিশ্বলোকে এই ধরনের তাৎপর্যপূর্ণ ও বিজ্ঞানময় অসংখ্য দিক রয়েছে, বিজ্ঞান আমাদের জানিয়ে দিয়েছে যে, আমরা যতটা জানতে পেরেছি, তার তুলনায় জানতে পারিনি—এমন জিনিসের সংখ্যা অনেক—অনেক গুণ বেশী। তা সত্ত্বেও যতটা জানা গিয়েছে, তা-ও এত বেশী যে, তার কোন তালিকা রচনা করাও কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। কেউ তা বর্ণনা করতে শুরু করলেও তা কোন দিনই শেষ হবে না। স্পষ্ট মনে হবে, মহাসমুদ্রের অতলস্পর্শ বারিরাশির একটি সামান্য বিন্দুই শুধু স্পর্শ করা হয়েছে। বস্তুত সমস্ত তত্ত্ব যদি উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায় এবং অতঃপর দুনিয়ার সমস্ত মানুষ তা লিপিবদ্ধ করতে শুরু করে, আর সর্বপ্রকার উপায় উপকরণ তার সহযোগী-সাহায্যকারীও হয়, তবু বিশ্বলোকের যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্যের বর্ণনা সম্পূর্ণ করা কোন দিনই সম্ভবপর হবে না। কুরআন মজীদের এই দাবি যথার্থ ও অনস্বীকার্য।ঃ

> পৃথিবীর সমস্ত গাছ যদি কলম হয় এবং বর্তমান সমুদ্রগুলোর সাথে আরও সপ্ত সাগর তার কালি হওয়ার কাজ করে, তাহলেও আল্লাহ্র কালিমা লেখা শেষ হবে না।

বিশ্বলোকের পূর্ববর্ণিত বিস্ময়কর ও অস্বাভাবিক তাৎপর্য ও অর্থবহতা স্বীকার করেও আল্লাহ্তে অবিশ্বাসী বিজ্ঞানীরা তার ভিন্নতর একটা ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেন। তারা এসবের মূলে কোন সদা-সক্রিয় ব্যবস্থাপক ও পরিচালক আছেন বলে মনে করতে রাযী নন। তারা এই সবকে একটা Chance বা accident মাত্র বলে বিশ্বাস করেন। টি· এইচ· হাক্সলীর কথা হচ্ছে, 'ছয়টি বানর যদি টাইপ রাইটার নিয়ে বসে কোটি কোটি বছর পর্যন্ত তা পেটাতে থাকে, তাহলে তাদের কালো করা কাগজগুলোর স্তূপের শেষ কাগজখানিতে হয়ত শেক্সপিয়ারের লক্ষ কোটির একটি সনেট' পাওয়া যেতে পারে। অনুরূপভাবে কোটি শত-কোটি বছর ধরে 'বস্তু'র অন্ধ আবর্তনের ফলেই এই বিশ্বলোক অস্তিত্বলাভ করেছে বলা যায়।[২]

---

২. The Mysterious Universe p-3-4

কিন্তু হাক্সলীর এই কথাটি নিতান্তই অর্থহীন। আজ পর্যন্ত যত জ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মানুষের আয়ত্তাধীন হয়েছে, তাতে এই বিশ্বলোকের অস্তিত্ব লাভের মত কোন বিরাট ও বিস্ময়কর দুর্ঘটনার কথা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করার মত কোন কারণ জানা যায় নি। দমকা হাওয়ার প্রবাহ কখনও লাল গোলাপের রেণূ (pollen) উড়িয়ে শ্বেত গোলাপের উপর ফেলে দেয়, যার ফলে হলুদ বর্ণের গোলাপ ফোটে বলে মনে করা হয়। কিন্তু তাই বলে গোলাপ ফুলের অস্তিত্বটা এবং বিশ্বলোকে তার নিরন্তর উপস্থিতি অবস্থিতি এবং গোটা বিশ্বলোকের সাথে তার নিবিড় বিস্ময়কর সংযোগ কেবলমাত্র দমকা হাওয়ার অবদান বলে বিশ্বাস করা শুধু হাস্যকরই নয়, চরম পাগলামিও বটে। এই কারণেই অধ্যাপক Edwin Conklin বলেছেনঃ

'দুর্ঘনার ফলে জীবনের উদ্গম হওয়ার কথাটি ঠিক এমনই,
যেমন, যদি বলা হয় যে, কোন প্রেসে বিস্ফোরণ সংঘটিত
হওয়ার ফলে একটি বিরাট অভিধান ছাপা হয়ে বের হয়ে এসেছে।[৩]

বিজ্ঞানীরা এই আকস্মিম দুর্ঘটনারও একটা ব্যাখ্যা দিয়ে তার যথার্থতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁরা এটিকে 'নিরেট গাণিতিক বিধানের দুর্ঘটনা' (Purely Mathematical Laws of chance) বলে চালিয়ে দিতে চেয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য হলোঃ

আকস্মিক দুর্ঘটনা (chance) কোন অযৌক্তিকভাবে ধরে নেয়া ব্যাপার নয়। এটি বহু বড় ও উন্নত মানের গাণিতিক মতাদর্শ। যেসব ক্ষেত্রে অকাট্য তত্ত্ব বা তথ্য জানা যায় না, সে সব ক্ষেত্রেই তা প্রয়োগ করা হয়। এই মতাদর্শের বলে যে সব নির্ভুল মৌলনীতি লাভ করা যায়, তদ্বারা আমরা কোন্‌টি ঠিক আর কোন্‌টি বেঠিক, তা খুব সহজেই নির্ধারিত করতে পারি। কোন বিশেষ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সম্ভাব্যতার হিসাব করে তার সংঘটিত হওয়াটা কতটা সম্ভবপর, সে বিষয়ে নির্ভুল অনুমান করতে পারি।[৪]

বিশ্বলোকে 'বস্তু' অত্যন্ত কাঁচা অবস্থায় স্বতঃই মওজুদ ছিল এবং তাতে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার একটি ধারাও আপনা আপনি শুরু হয়ে গিয়েছিল—এই কথা ধরে নেয়ার মূলে কোন যুক্তিই থাকতে পারে না।[৫] তা সত্য বলে ধরে নিলেও অনুরূপ পন্থায় গোটা বিশ্বলোক অস্তিত্ব লাভ করেছে, এমন কথা মনে করা যায় না। স্রষ্টা–অবিশ্বাসী বিজ্ঞানীরা গণিত–এর যে অনিবার্যতার দোহাই দিয়েছেন, তা–ই আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে অস্তিত্বলাভ করেছে, এই কথারও তীব্রভাবে প্রতিবাদ করে। কেননা এই পৃথিবীর

৩. The Evidence of God -p-174

৪. ঐ—পৃঃ ২৩

৫. বস্তু কি করে মওজুদ থাকল, কি করে তাতে ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়া দেখা দিল? এ প্রশ্নের অকাট্য জবাব না দেয়া পর্যন্ত তা সত্য বলে মেনে নেয়া যায় না।

www.pathagar.com

বয়স ও দৈহিক পুরুত্ব কি, তা বিজ্ঞান জানতে পেরেছে, কিন্তু আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে বর্তমান জগত অস্তিত্ব লাভ করেছে, একথা প্রমাণ করা তার দ্বারা সম্ভব নয়।

দশটি ধাতব মুদ্রা আপনার হাতে নিন এবং এক হতে দশ পর্যন্ত তার উপর নম্বর লাগিয়ে দিন। অতঃপর সেগুলো একত্রিত করে আপনার পকেটে ফেলে নেড়েচেড়ে দিন। তারপর সেগুলো পরস্পরা অনুযায়ী এক থেকে দশ পর্যন্ত পরপর তুলতে চেষ্টা করুন এবং প্রত্যেকবার যে মুদ্রাটি তুলবেন সেটি সাথে সাথেই পুনরায় পকেটে ফেলে দেবেন। এক্ষণে তুলতে গিয়ে এক নম্বরের মুদ্রাটি প্রথমবারেই আপনার হাতে উঠে আসবে, তার সম্ভাবনা 'দশের মধ্যে এক' মাত্র। এক নম্বরের ও দুই নম্বরের মুদ্রা পর পর আপনার হাতে উঠে আসবে তার সম্ভাবনা এক শ'র মধ্যে এক। এক থেকে তিন নম্বর পর্যন্তকার মুদ্রা পরপর উঠে আসবে, তার সম্ভাবনা এক হাজারের মধ্যে এক। এক থেকে চার পর্যন্তকার মুদ্রা পরপর আপনার হাতে উঠবে, তার সম্ভাবনা দশ হাজারের মধ্যে এক। এমন কি, এক থেকে দশ নম্বর পর্যন্তকার মুদ্রা পরপর হাতে উঠে আসবে, তার সম্ভাবনা দশ বিলিয়ন বা দশ শত কোটিতে একবার মাত্র।

ক্রেসী মরিসন (Cressy Morrison) এই উপমাটি উল্লেখ করে লিখেছেনঃ

'The object in dealing with so simple a problem is to show how enormously figures multiply against chance.[৬]

উপরন্তু সরল দৃষ্টান্তটি স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, ঘটনাবলীর সংখ্যানুপাতে সম্ভাবনার সংখ্যা অনক গুণ বেশী হয়ে থাকে। তাই বলতে হয়, সব কিছুই যদি নিছক আকস্মিক দুর্ঘটনার ফল হয়ে থাকে, তাহলে এই বিশ্বলোককে অস্তিত্ব লাভ করতে কত শত সহস্র অযুত যুগের প্রয়োজন হতে পারে, তা কি অনুমান করা সম্ভব?

একটি জীবন্ত সত্তার দেহ জীবন্ত কোষের (living cells) সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে। কোষ অতীব সূক্ষ্ম ও জটিল যৌগিক, cytology বা 'কোষবিদ্যা' তা নিয়ে আলোচনা করে। যে সব উপাদানাংশ দিয়ে কোষ গড়ে ওঠে, প্রোটিন তার মধ্যে অন্যতম। আর প্রোটিন একটা রাসায়নিক যৌগিক, কঠিন হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও গন্ধক—এই পাঁচটি মৌল উপাদানের সংমিশ্রণে তা গড়ে ওঠে। প্রোটিন অণূ এসব মৌলিক পদার্থের প্রায় চল্লিশ হাজার পরমাণূ দ্বারা গঠিত।

বিশ্বলোকে এক শ'রও বেশী রাসায়নিক পদার্থ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও অবিন্যস্ত অবস্থায় ছড়িয়ে রয়েছে। এই সব মৌলিক পদার্থের অসংবদ্ধ অবিন্যস্ত অবস্থা থেকে বের হয়ে এই পাঁচটি পদার্থের মিলিত মিশ্রিত হওয়ার দরুণ একটা প্রোটিন অণু স্বতঃই অস্তিত্ব লাভ করবে, এটা কতটা সম্ভব বলে মনে করা যেতে পারে? 'বস্তু'র যে পরিমাণটাকে ক্রমাগত আন্দোলিত করার ফলে আকস্মিকভাবে এই ফল লাভ সম্ভব হতে পারে

৬. Man does not stand alone-p17

www.pathagar.com

এবং যে সময় কালের মধ্যে এই কাজটি সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে, তা হিসাব করে জানা যেতে পারে।

সুইজারল্যান্ডের গণিতবিদ অধ্যাপক Charleseugeneguye হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, এই ধরনের কোন আকস্মিক ঘটনার সম্ভাব্যতা $\frac{১৬০}{১০}$ এর তুলনায় মাত্র এক ডিগ্রী হতে পারে। $\frac{১৬০}{১০}$ এর অর্থ, দশ সংখ্যাকে দশ সংখ্যা দিয়ে একশ' ষাটবার পর পর পূরণ করতে হবে। অন্য কথায় দশ সংখ্যা লিখে তারপরে এক শ' ষাটটি শূন্য বসাতে হবে। এরূপ একটি সংখ্যা যে গণনা-অযোগ্য, তা বলাই বাহুল্য।

একটি প্রোটিন অণুর আকস্মিকভাবে অস্তিত্ব লাভের জন্য সমগ্র বিশ্বলোকের বর্তমান 'বস্তু' পরিমাণের কোটি কোটি গুণ অধিক 'বস্তু'র প্রয়োজন। তাকে একত্রিত করে আন্দোলিত করা হলে এই কার্যক্রম থেকে কোন ফল পাওয়ার সম্ভাবনা ২৪৩ x ১০ বছর পর দেখা দেবে।

এমিনো এসিডের (Amino Acids) সুদীর্ঘ ধারাবাহিকতার ফলে প্রোটিন গড়ে ওঠে। যে পন্থায় এই ধারাসমূহ পরস্পর মিলিত হয়, এক্ষেত্রে তা-ই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তা ভুল পন্থায় একত্রিত হলে তা জীবনের স্থিতির সহায়ক হওয়ার পরিবর্তে একটা ধ্বংসকারী বিষে পরিণত হবে। অধ্যাপক J. B. Leathes হিসাব করেছেন যে, একটা সরলতম প্রোটিনের ধারাসমূহ লক্ষ কোটি পন্থায় ৪৮/১০ একত্রিত করা যায়। এই সমস্ত সম্ভাবনা একটি মাত্র প্রোটিন অণুর অস্তিত্ব দান নিছক একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা হিসাবেই কখনও সংঘটিত হবে, তা সম্পূর্ণ রূপে কল্পনাতীত ব্যাপার।

তাছাড়া প্রোটিন তো নিছক একটা রাসায়নিক পদার্থ, তাতে জীবনের অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু প্রোটিন যখন জীব-কোষের অংশ হয়, তখন তাতে জীবনের উষ্ণতা আসে কোথেকে, এই প্রশ্নের কোন জবাবই উপরিউক্ত বিশ্লেষণে খুঁজে পাওয়া যাবে না। উপরন্তু কোষের একটি মাত্র অংশ হচ্ছে প্রোটিন। এই পর্যবেক্ষণীয় অণূর অস্তিত্বের বিশ্লেষণই শুধু দেয়া হয়েছে। তা হলে একটি জীবন্ত দেহের কত অসংখ্য অর্ধ সংখ্যক অণূর সংমিশ্রণে দেহ গড়ে উঠতে পারে বলে মনে করতে হবে?

বিজ্ঞান বিশ্বলোকের বয়স জানতে চেষ্টা করেছে। বিজ্ঞানের অনুমান হচ্ছে, বর্তমান বিশ্বলোক পঞ্চাশ লক্ষ কোটি বছর থেকে অস্তিত্বমান হয়ে রয়েছে। কিন্তু একটি প্রোটিন অণুর আকস্মিকভাবে অস্তিত্ব লাভের জন্য এই দীর্ঘ বয়সও কিছু মাত্র যথেষ্ট নয়। কিন্তু যে পৃথিবীর উপর আমাদের জ্ঞাত জীবনের উন্মেষ ঘটেছে, তার বয়স তো নিশ্চিত রূপেই জানা গেছে।[৭]

---

৭. Human Destiny-p-30-36

www.pathagar.com

খগোলবিদদের অনুমান অনুযায়ী পৃথিবী সূর্যের একটা খন্ড। অপর একটি বৃহদায়তন তারকার আকর্ষণে বিচ্ছিন্ন হয়ে তা মহাশূন্যে আবর্তিত হচ্ছিল। তখন পৃথিবী সূর্যের মতই একটি জ্বলন্ত অগ্নি–গোলক ছিল। তাতে তখন কোন ধরনের কোন জীবনের উন্মেষ হওয়া ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতঃপর তা ক্রমশঃ শীতল হতে হতে জমে গেল এবং এই জমে যাওয়ার পরই তাতে জীবনের উন্মেষ হওয়া সম্ভবপর হয়েছে।

পৃথিবী যখন থেকে শীতল ও শক্ত হয়েছে, সেই সময় থেকে এ পর্যন্ত তার বয়স কত হয়েছে, তা বিভিন্ন উপায়ে নির্ভুলভাবে জানা যেতে পারে। Radio Active Elements তন্মধ্যে একটি উত্তম উপায়। তেজস্ক্রিয় উপাদানের পরমাণুর বিদ্যুৎ বিন্দুসমূহ একটা বিশেষ অনুপাতে নির্গত হতে থাকে। এই কারণেই তা উজ্জ্বল দেখা যায়। এই নির্গমন বা বিস্তারের কারণে সেগুলোর বৈদ্যুতিক অণুর সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে এবং তা ধীরে ধীরে অ–তেজস্ক্রিয় ধাতুতে পরিণত হতে থাকে। ইউরেনিয়াম এই পর্যায়েরই এক ধরনের তেজস্ক্রিয় উপাদান। তা বিস্তৃত কার্যক্রমের কারণে একটা বিশেষ ও সুনির্দিষ্ট হারে সীসায় রূপান্তরিত হতে থাকে। প্রমাণিত হয়েছে যে, এই পরিবর্তনের হার কোন ধরনেরই কঠিনতর তাপ বা চাপে প্রভাবিত হয় না। পরিবর্তনের এই গতিকে আমরা অটল মনে করতে পারি। ইউরেনিয়ামের বিন্দুসমূহ বিভিন্ন প্রস্তরে পাওয়া যায়। আর এই প্রস্তরের কঠিন রূপ ধারণের সময় থেকেই যে তা তার অংশ হয়ে আছে, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। ইউরেনিয়ামের সঙ্গে সীসা পাওয়া যায়। ইউরেনিয়ামের সাথে যত সীসা পাওয়া যায় তা ইউরেনিয়ামের বিচ্ছিন্ন হওয়ার দরুন অস্তিত্ব লাভ করেছে, এমন কথা বলা যায় না; কেননা ইউরেনিয়াম থেকে নির্মিত সীসা সাধারণ সীসা থেকে কিছুটা হালকা হয়ে থাকে। এই কারণে সীসার যে কোন খন্ড সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, তা ইউরেনিয়াম থেকে নির্মিত,না অন্য কিছু থেকে। এ থেকে হিসাব করা যায় যে, যে প্রস্তরে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় সেখানে কত কাল থেকে তার উপর বিস্তৃতির কার্যক্রম চলছে। আর যে সময় প্রস্তর জমাট বেঁধেছে, সেই সময় থেকেই তার সাথে ইউরেনিয়াম যুক্ত হয়ে আছে, এই কারণে আমরা তদ্বারা মূল প্রস্তরের জমাট বাঁধার সময়–কালটা সহজেই জনতে পারি।

এ ধরনের অনুমান থেকে বলা যায় যে, প্রস্তর জমাট বেঁধেছে অন্ততপক্ষে চৌদ্দ শত মিলিয়ন বছর অতিবাহিত হয়েছে। যে সব প্রস্তর পৃথিবীর প্রাচীনতম বলে জানা গেছে, সে সবের অধ্যয়ন থেকেই এই অনুমানটা গড়ে ওঠে। বলা যেতে পারে, পৃথিবীর বয়স তার চাইতেও দ্বিগুণ তিন গুণ বেশী বছর হবে। কিন্তু ভূ–পর্যবেক্ষণের অপরাপর সাক্ষ্য এই রূপ অস্বাভাবিক আন্দাজ–অনুমানকে যথার্থ বলে মনে করে না। জে ডবলিউ· এন· সবলিউন পৃথিবীর বয়স দু' হাজার মিলিয়ন বছর বলে অনুমান করেছেন এবং এটা একটা মধ্যম ও উত্তম অনুমান বটে।[৮] কিন্তু এক নিষ্প্রাণ প্রোটন অণুর যৌগিকের

৮. Limitation of Science-p-78

www.pathagar.com

ঘটনাবশতঃ অস্তিত্বলাভের জন্য যখন শত সহস্র যুগের চাইতেও অধিক সময়ের প্রয়োজন, তখন শুধু দু' হাজার মিলিয়ন বছর ভূ-পৃষ্ঠে জীবন্ত ও পূর্ণাঙ্গ অবয়বসম্পন্ন জীবগুলোর দশ লক্ষেরও অধিক এবং উদ্ভিদের দু' লক্ষেরও অধিক প্রকার কি করে অস্তিত্ব লাভ করল এবং প্রত্যেক প্রকারের সংখ্যাতীত জীব-জন্তু ও উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়ে জলভাগে ও স্থলভাগে কি করে ছড়িয়ে পড়ল? তা ছাড়া এসব নিম্ন স্তরের প্রাণীদেহ থেকে ক্রমবিকাশ লাভ করে এত অল্প সময়ের মধ্যে মানুষের মতো একটি উচ্চ ও উন্নতমানের সৃষ্টি আকস্মিকভাবে কি করে অস্তিত্ব লাভ করে বসল? অথচ বিবর্তনবাদী মতাদর্শ প্রজাতিসমূহের মধ্যে যে সব আকস্মিক বা ঘটনাবশতঃ সংঘটিত পরিবর্তনসমূহের উপর ভিত্তি স্থাপন করেছে, তন্মধ্যে প্রতিটি পরিবর্তন পর্যায়ে গণিত-বিশেষজ্ঞ patau হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, একটি প্রাণীসত্তার নতুন পরিবর্তন সম্পূর্ণ হতে দশ লক্ষ বংশ অতিবাহিত হওয়া সম্ভব।[৯]

এ প্রেক্ষিতে অনুমান করা যায়, নিছক ক্রমবিকাশের অন্ধ বস্তুগত কার্যক্রমের সাহায্যে কুকুরের ন্যায় পাঁচ অঙ্গুলীসম্পন্ন পূর্বপুরুষের বংশে অসংখ্য বারের পরিবর্তন সমূহের একত্রিত হওয়ার ফলে ঘোড়ার ন্যায় একটা ভিন্নতর জন্তু হতে কত দীর্ঘ হতেও দীর্ঘতর সময়ের প্রয়োজন হয়ে থাকবে।

এ পর্যন্তকার বিস্তারিত আলোচনা মার্কিন অবয়ব পারদর্শী Martin Books Kreider-এর এই কথাগুলোকে অকাট্য সত্য প্রমাণ করেঃ

> The mathematical probability of chance occurence of all the necessary factors in the right proportion is almost nill.[১০]

বস্তুত সৃষ্টিকর্মের সমস্ত জরুরী কার্য-কারণের যথার্থ অনুপাতসহ হঠাৎ করে বা ঘটনাবশত একত্রিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা গাণিতিকভাবে সম্পূর্ণ অসম্ভব প্রায়। আকস্মিকভাবেও ঘটনাবশত সৃষ্টি-কর্ম সম্পন্ন হওয়া সংক্রান্ত মতবাদ যে নিতান্তই ভিত্তিহীন, উপরিউক্ত দীর্ঘ ও বিস্তারিত আলোচনা থেকে তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। বস্তুত ঘটনাবশত (Accidentally) না কোন অণু অস্তিত্ব লাভ করেছে, না কোন পরমাণু। উপরন্তু এই বিশ্বলোকের অস্তিত্ব লাভ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করতে পারে, এমন মন ও মানসও গড়ে উঠতে পারেনি, নিতান্ত আকস্মিকভাবে বা ঘটনাবশত। সে জন্য যত দীর্ঘ হতেও দীর্ঘতর সময় ধরে নেয়া হোক না কেন। এ ধরনের মতবাদ গাণিতিকভাবে যেমন অবাস্তব, যুক্তির দিক দিয়েও তা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এক ফোঁটা পানি মাটির উপর পড়ে আপনা-আপনি পৃথিবীর মানচিত্র তৈরী করতেপারে—এই রূপ কথা যেমন অর্থহীন, এ-ও তেমনি। তার নিকট প্রশ্ন করা

৯. The Evidence of God-p-117
১০. The Evidence of God-p 67

www.pathagar.com

যেতে পারে যে, ঘটনাবশত ঘটে যাওয়া এই ঘটনার জন্য মাটি, মাধ্যাকর্ষণ, পানি ও পানির পাত্র কেমন করে কোথেকে পাওয়া যাবে?

প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী Haekel বলেছিলেন, 'আমাকে বাতাস, পানি, রাসায়নিক উপাদান ও সময় দিলে আমি মানুষ বানিয়ে দিতে পারি'। কিন্তু এ কথা বলতে গিয়ে তিনি (হেইকল)ও বস্তুগত অবস্থাকে জরুরী ঘোষণা করে নিজের দাবিরই বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়েছেন, নিজেই নিজের কথার প্রতিবাদ করেছেন। মারিসন তাঁর সম্পর্কে বলেছেঃ

হেইকল এই কথা বলে ভ্রূণ ও স্বয়ং জীবনের সমস্যার ব্যাপারটির কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলেন। মানুষের অস্তিত্ব দানের জন্য তাকে সর্বপ্রথম অ-পর্যবেক্ষণীয় অণু সংগ্রহ করতে হবে। পরে তাকে বিশেষ পদ্ধতিতে সুবিন্যস্ত করে ভ্রূণ গড়তে হবে, তাতে জীবনের সঞ্চার করতে হবে। তার পরও তাঁর এই 'ঘটনা বশত-ই সৃষ্টিকর্মের সফল হওয়ার সম্ভাবনা কয়েক কোটির মধ্যে মাত্র একবারই হতে পারে। তাঁর সফলতা ধরে নিলেও তাকে Accident না বলে তিনি তার মেধার (Intelligence) ফল মনে করবেন।[১১]

সর্বশেষে প্রখ্যাত মার্কিন পদার্থবিদ George Earldawis-এর একটি উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনার সমাপ্তি টানতে চাচ্ছি। তিনি লিখেছেনঃ বিশ্বলোক নিজেই যদি নিজেকে সৃষ্টি করতে পেরে থাকে, তাহলে তার অর্থ হবে, তা-ই সৃষ্টিকর্তা হওয়ার অপরিহার্য গুণাবলীর অধিকারী। এরূপ অবস্থায় আমরা বিশ্বলোককেই স্রষ্টা মানতে বাধ্য হব। ফলে আমরা 'স্রষ্টা'র অস্তিত্ব মেনে নিলাম বটে, কিন্তু তা হবে এমন এক বিরল 'স্রষ্টা' যা একই সময় অতিপ্রাকৃতিক সত্তাও হবে, আবার সাথে সাথে বস্তুগত সত্তা-ও। অন্য কথায় স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয় দিক দিয়ে এ রূপ এক অর্থহীন স্রষ্টার প্রতি ঈমান আনার পরিবর্তে এমন এক স্রষ্টার প্রতি ঈমান গ্রহণকে আমি অগ্রাধিকার দেব, যিনি এই বস্তুজগত সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তিনি নিজে তার অংশ নন। বরং তিনি তার ব্যবস্থাপক, পরিচালক, নিয়ন্ত্রণকারী ও প্রভু'। [The Evidence of God p-7]

সেই শাশ্বত সত্তাই হচ্ছেন বিশ্বলোকের স্রষ্টা মহান আল্লাহ্। তাই আল্লাহ্র অস্তিত্ব শাশ্বত ও অনস্বীকার্য।

১১. Man does not stand alone-p-87

www.pathagar.com

ফ্রডারিক এ্যাঞ্জেলস বলেছেনঃ'মানুষের সর্বপ্রথম শরীর ঢাকার জন্য কাপড় এবং উদর পূর্তির জন্য খাবারের প্রয়োজন। তার পরই সে দর্শন ও রাজনীতির বিষয়াদি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে।'

কিন্তু এই কথাটি আদৌ সত্য নয়। আসলে মানুষ সর্বপ্রথম একটি প্রশ্নের জবাব পেতে চায়। সে প্রশ্নটি হলো 'আমি কে? কি এই বিশ্বলোক? আমার জীবন কিভাবে উন্মেষিত ও সূচিত হলো? আর কোথায় গিয়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটবে?'

এ হচ্ছে মানব প্রকৃতি নিহিত একটা অত্যন্ত মৌলিক এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। মানুষ যে জগতে বাস করে সেখানে সবকিছুই আছে, নেই কেবল এটি প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব। সূর্য আলো দেয়, তাপ বর্ষণ করে কিন্তু এ সূর্য কি জিনিস এবং সে কেন মানুষের সেবায় নিরন্তর নিয়োজিত?—তা মানুষ জানে না। বাতাস মানুষকে জীবন দান করছে, কিন্তু তাকে ধরে কে জিজ্ঞাসা করবে, তুমি কে, কেন এরূপ করছ, সে সাধ্য নেই মানুষের। মানুষ নিজেকে দেখছে। কিন্তু সে মূলত কি এবং কেন এই জগতে এসেছে জানে না। এই সব প্রশ্নের জবাব নির্ধারণ করতে মানুষের মন ও মনীষা সম্পূর্ণ অক্ষম। এ অক্ষমতা অবশ্য তাকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। এসব প্রশ্নের জবাব মানুষ পেতে চায়। কারণ প্রশ্নগুলো যে মানুষের মন ও প্রাণকে অস্থির করে রাখে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কখনও এই অনুভব এত তীব্র হয়ে জেগে উঠে যে, তা মানুষকে পাগলও বানিয়ে দেয়। কাজেই এ্যাঞ্জেলসের উক্তিটি মানুষের নিতান্ত জৈবিক দিকের প্রকাশ, তার মানবিক দিকের নয়।

এ্যাঞ্জেলস নাস্তিক ছিল বলেই সবাই জানে। অথচ তার এ নাস্তিকতাবাদ বিপরীত পরিবেশের প্রতিক্রিয়া, যা অনেক পরে তার জীবনে দেখা দিয়েছে, এই কথা কারও অজানা নয়। তার প্রাথমিক জীবন ধর্মীয় পরিমন্ডলে অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু সে যখন বড় হয়ে উঠল এবং দৃষ্টিতে প্রখরতা, গভীরতা জাগল, তখন আনুষ্ঠানিক ও চলতি ধর্মের প্রতি তার মনে জেগে উঠল বীতশ্রদ্ধা। তার সময়ের অবস্থার কথা সে নিজেই তার এক বন্ধুকে লিখিত এক চিঠিতে এভাবে বর্ণনা করেছেঃ

> আমি প্রতিদিন প্রার্থনা করি—সারাটি দিন প্রার্থনা করি যেন আমার নিকট প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হয়। যেদিন থেকে আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে সেদিন থেকে এই দোয়া করাই আমার একমাত্র কাজ হয়ে আছে। আমি তোমার বিশ্বাসকে গ্রহণ করতে পারছিনে। আমি এই কথাগুলো লিখছি, আর আমার অন্তর কাঁদছে—দুই চোখে অবিরল ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু আমি অনুভব করছি যে, আমি

www.pathagar.com

অভিশপ্ত নই। আমি আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছে যাব বলে আশা করি। তাঁর দর্শন লাভের জন্য আমি খুবই আকাঙ্খী ও আশাবাদী, এ আমার প্রাণের শপথ। আমার এই অনুসন্ধিৎসা ও কামনাটা কি জিনিস?—এ হচ্ছে পবিত্র আত্মার আলোকসম্পাত। পবিত্র ইনজীল যদি দশ হাজার বারও এর প্রতিবাদ করে, তবু আমি তা মানতে পারিনে।

এ হচ্ছে মহাসত্যের সেই তীব্র অনুসন্ধিৎসা যুবক এ্যাঙ্গেলস–এর হৃদয়ে যা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সে সঠিক জবাব লাভ করতে পারেনি, তার অন্তর পায়নি সান্ত্বনা। ফলে প্রচলিত খৃষ্ট ধর্মের প্রতি ঈমান হারিয়ে নিছক অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনের কুয়াশায় আচ্ছন্ন হলো তার মন ও মগজ।

মানব–মনের এ এক আকুল পিপাসা, এক অদম্য বাসনা। মানুষের প্রকৃতিতে এক সৃষ্টিকর্তা ও সর্বনিয়ন্তার চেতনা জন্মগতভাবেই বর্তমান। এই পিপাসা ও কামনা–বাসনার নিগূঢ় সত্য এটাই। এ হচ্ছে তার অবচেতনার এক অনিবার্য অবিভাজ্য অংশ। আর তাই ঝংকৃত হচ্ছে এ কয়টি শব্দে, 'আল্লাহ্ তা'আলাই আমার সৃষ্টিকর্তা, আর আমি একমাত্র তারই বান্দাহ, দাস'।

এ হচ্ছে এক নিঃশব্দ প্রতিশ্রুতি। প্রত্যেক ব্যক্তিই জন্ম থেকেই এ প্রতিশ্রুতি সঙ্গে নিয়ে এ দুনিয়ায় আসে। একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, মনিব, মালিক, করুণাময়, অনুগ্রহশীল ও নিয়ন্তা, নিয়ামক সংক্রান্ত এই ধারণা ও অনুভূতি সম্পূর্ণ অলক্ষ্যে মানুষের প্রতিটি ধমনী ও শিরা–উপশিরা, প্রতি রক্ত বিন্দু ও হৃদপিন্ডের প্রতিটি স্পন্দনের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত আছে। এ অনুভূতি না থাকলে প্রতিটি মানুষ তার মধ্যে একটা মহাশূন্যতার তীব্র যন্ত্রণা বোধ করবে। যে মনিব–মালিককে সে দেখতে পায়নি তাঁকে পাওয়ার জন্যে, তাঁকে পুরোপুরি গ্রহণ করার জন্যে এবং নিজের সবকিছুই তারই নিকট সমর্পণ করার জন্যে তার আত্মাই তাকে নিরন্তর চাপ দিচ্ছে। সে চাপকে সে কিছুতেই অগ্রাহ্য করতে পারে না।

এরূপ অবস্থায় যে লোক আল্লাহ্র যথার্থ পরিচয় লাভ করতে পারল, সে তার এই হৃদায়াবেগের সঠিক পরিণতি লাভ করেছে বলে মনে করতে হবে। আর যারা আল্লাহ্র পরিচয় পায় না বাইরের কোন কারণে, তাদের হৃদয়াবেগ কোন কৃত্রিম জিনিসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে, এতে সন্দেহ নেই। প্রত্যেকেই এমন এক সত্তার অনুসন্ধান করছে, যার তরে তার এই পবিত্র হৃদয়াবেগ উৎসর্গীকৃত হবে। সে নিজেকে ধন্য ও চরিতার্থ মনে করবে চরম আরাধ্য ও পরম কাম্যকে পেয়ে। ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের সরকারী–বেসরকারী ভবনের উপর নিজেদের সার্বভৌমত্বের প্রতীক রক্তিম সূর্য খচিত পতাকা উড্ডীন করা হলো, তখন স্বাধীনতা সংগ্রামী ও স্বাধীনতাকামী আপামর জনতা সাফল্য ও লক্ষ্য অর্জনের আনন্দে অশ্রুবর্ষণ করেছিল। কেননা এই দৃশ্য দেখবার জন্যেই তো তাদের চোখ এতদিন ধরে উদগ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করছিল। স্বাধীনতার লক্ষ্য এবং তার সাথে লোকদের হৃদয়ের গভীর সম্পর্কের বাস্তব প্রকাশ ছিল এই অশ্রু। আর এই হচ্ছে স্বীয় পরম আরাধ্য ও পরম কাম্য লাভের আনন্দ।

www.pathagar.com

এর জন্য কত অসংখ্য লোক মহামূল্য জীবন দান করেছে। কেউ যখন জাতির কোন স্মরণীয় নেতার সমাধিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে, তার সামনে মস্তক অবনমিত করে দাড়ায় তখন সে ঠিক সেই কাজই করে, যা করে একজন ধার্মিক ব্যক্তি রুকু-সিজদার মাধ্যমে তার আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে। একজন কমিউনিস্ট যখন লেনিনের প্রতিকৃতির কাছ থেকে চলে যাওয়ার সময় মাথার টুপী তুলে নেয় এবং তার পায়ের গতি মন্থর হয়ে আসে তখন সে তার আরাধ্যের উদ্দেশ্যে ভক্তি-শ্রদ্ধায় উদ্বেলিত হৃদয়াবেগ উজাড় করে ঢেলে দেয়, যেমন করে এক আল্লাহ্র-অনুরাগী আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে মাথা নত করে।

আসল কথা হলো, প্রত্যেকেই নিজের জন্যে কোন-না-কোন মনিব, মালিক, নিয়ন্তা গ্রহণ করতে এবং তারই উদ্দেশ্যে অন্তরের সব আবেগ উজার করে ঢেলে দিতে একান্তভাবে বাধ্য। এ থেকে কারোই নিস্তার নেই। সে মনিব, নিয়ন্তা—যেই হোক না কেন। কিন্তু বিশ্বস্রষ্টা এক আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে মানুষ আর যার উদ্দেশ্যেই হৃদয়াবেগের এই অর্ঘ্য পেশ করে—ইসলামের দৃষ্টিতে তাই হচ্ছে শির্ক। আর এই শির্ক সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণা হলোঃ

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

শির্ক হলো সবচেয়ে বড় জুলুম।

'জুলুম' অর্থ কোন জিনিসকে তার আসল স্থানের পরিবর্তে অন্য স্থানে স্থাপন করা। মাথার টুপী যদি পায়ের তলায় রাখা হয় কিংবা পায়ের জুতা তুলে রাখা হয় মাথার উপর, তাহলে অতি বড় জুলুমের কাজ হবে। অনুরূপভাবে উপাস্য আরাধ্য মালিক-নিয়ন্তারূপে স্বীকৃতি লাভের যার কোন অধিকার নেই তাকে সেই অধিকার দেয়া কিংবা যার অধিকার ন্যায়ত রয়েছে, তাকে সে অধিকার না দেয়া জুলুমের কাজ। মানুষ যখন স্বীয় মনস্তাত্ত্বিক শূন্যতা ভরাট করার উদ্দেশ্যে প্রকৃত বিশ্বস্রষ্টাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো দিকে ঝুকে পড়ে, এক আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে যখন কেউ অন্য কাউকে নিজের জীবনের আশ্রয় ও নির্ভর হিসেবে স্বীকার করে নেয় তখন সে তার নিজের জন্যে বাঞ্ছনীয় ও সুশোভন স্থান ত্যাগ করে। সে এক পবিত্র ভাবধারার প্রয়োগ করে সম্পূর্ণ ভুল পন্থায় ও অশোভন ক্ষেত্রে।

এ আবেগ নিতান্ত স্বভাবগত, প্রকৃতি নিহিত। এই কারণে প্রথম পর্যায়ে তা খুবই স্বাভাবিকভাবে জাগ্রত হয়। আসল ও প্রকৃত আরাধ্যের প্রতিই থাকে তার ব্যাকুলতা। কিন্তু অবস্থা ও পরিবেশগত দোষ-ত্রুটি তাকে সম্পূর্ণ ভুল পথে চালিত করে। কিছুদিন পর্যন্ত মানুষ যখন একটা বিশেষ ধরনের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন তাতেই সে বেচে থাকার আনন্দ পায়। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী বার্টান্ড রাসেল বাল্যকালে একজন ধার্মিক লোক ছিলেন। তখন তিনি রীতিমত আরাধনা, উপাসনা করতেন। এই সময় একদিন তার পিতা তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার পছন্দসই প্রার্থনা কোন্‌টা?' বালক

www.pathagar.com

রাসেল বললেন, 'আমার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আমি আমার পাপের দুর্বহ ভারে নিষ্পেষিত, জর্জরিত।'

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, তখন আল্লাহ্ই বার্টান্ড রাসেলের আল্লাহ্ ছিলেন। কিন্তু রাসেল যখন তের বছর বয়সে পৌছলেন, তখন তিনি ধর্মীয় আরাধনা উপাসনা ত্যাগ করলেন। ধর্মীয় ঐতিহ্য ও প্রাচীন মূল্যবোধ থেকে বিদ্রোহী পরিবেশে বসবাস করার কারণে তাঁর বিদ্রোহের প্রবণতা প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। পরবর্তীকালে বার্টাণ্ড রাসেল পুরোপুরি নাস্তিক হয়ে গেলেন। এ সময় তাঁর প্রিয় ছিল গণিতশাস্ত্র ও দর্শন। ১৯৫৯ সনের ঘটনা। লন্ডনস্থ বি. বি. সি. এক প্রশ্নোত্তর প্রোগ্রামে ফ্রীম্যান রাসেলকে জিজ্ঞেস করলেন, 'গণিতশাস্ত্র ও দর্শনে মশগুল থাকাটা কি আপনি সামগ্রিক ধর্মীয় হৃদয়াবেগের বিকল্প হিসেবে পেয়েছেন?' রাসেল উত্তর দিলেনঃ 'জি–হ্যাঁ; আমি চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত এ নিশ্চিন্ততা ও পরম প্রশান্তি লাভে পুরোপুরি সফল হয়েছি। প্লেটো এরই সম্পর্কে বলেছিলেন যে, 'গণিত চর্চার মাধ্যমেই এ জিনিস পাওয়া সম্ভবপর। এ এক শাশ্বত ও অনন্ত জগৎ। এ জগৎ কালের বন্ধন থেকে মুক্ত। এর মধ্যে আমি ধর্মের মতই এক পরম প্রশান্তি লাভ করেছি'।

বিশ্ববিশ্রুত এ মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ্কে মা'বুদ না বানিয়ে 'মাবুদহীন' জীবন যাপন করতে পারেন নি। অনতিবিলম্বে অন্য কাউকে মা'বুদের স্থানে বসাতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। আল্লাহ্কে মা'বুদ বানাতে অস্বীকার করলেও মা'বুদের অপরিহার্যতা অস্বীকার করার উপায় ছিল না তাঁর। তাঁর মানস জীবনে যে–স্থানে এক সময় মহান আল্লাহ্কে বসিয়েছিলেন,উত্তরকালে সেখানে আসীন করেছিলেন গণিতশাস্ত্র ও দর্শনকে। শুধু তাই নয়, গণিতশাস্ত্র ও দর্শনকে তিনি ঠিক সেই ধরনের গুণ–সিফাতেও ভূষিত করলেন, যা একমাত্র আল্লাহ্রই থাকতে পারে। আর তাহল চিরন্তনতা, শাশ্বততা ও সময়ের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। কেননা, এ ছাড়া ধর্মের ন্যায় সেই পরম প্রশান্তি লাভ তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হতো না—যার জন্যে তাঁর প্রকৃতি অধীর হয়ে উঠেছিল।

১৯৬৩ সনের ৩রা অক্টোবর দিল্লী থেকে প্রকাশিত 'হিন্দুস্তান টাইমস' পত্রিকায় তদানীন্তন ভারতের প্রধান মন্ত্রী পন্ডিত নেহেরুর একটা ছবি প্রকাশিত হয়। সে ছবিটি দেখলে স্পষ্ট মনে হবে, তিনি 'রুকূ' করছেন। তিনি দু'হাঁটুর উপর উপুড় হয়ে দু'হাত জুড়ে ঠিক রুকূ'র মতোই নত হয়ে আছেন। এটা ছিল গান্ধী–জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে গৃহীত একটা ছবি। রাজঘাঠে গান্ধী সমাধির সন্নিকটে জাতির জনককে ভক্তি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য পেশ করছিলেন তিনি এইরূপ বিনায়বনত মস্তকে ও ভক্তিভরে দাঁড়িয়ে।

এ ধরনের ঘটনা প্রত্যেক বছর প্রায় প্রতিটি দিনই দুনিয়ার কোন না কোন স্থানে সংঘটিত হচ্ছে। বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্কে মানে না—স্বীকার করে না, তাঁর উপাসনা–আরাধনা করাকে নিতান্ত অর্থহীন মনে করে—এমন লক্ষ লক্ষ লোক নিজ নিজ গ্রহণ করা আরাধ্য উপাস্যের সামনে নত হয়ে নিজেদের দাসত্বসূচক ভক্তি–শ্রদ্ধার হৃদয়াবেগকে পরিতৃপ্ত ও চরিতার্থ করছে। মোদ্দাকথা, 'ইলাহ্' মানুষের এক স্বাভাবিক

www.pathagar.com

ও প্রকৃতিগত প্রয়োজন। এ প্রয়োজনকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না, কস্মিনকালেও কেউ তা পারেনি। এ এক শাশ্বত সত্য। এর মধ্যে কোন কৃত্রিমতার স্থান নেই এবং 'ইলাহ্' যে সত্য, অনস্বীকার্য এই তার অকাট্য প্রমাণ। মানুষ যদি এক আল্লাহ্‌র সামনে নতি স্বীকার নাও করে, তবু তাকে ঠিক সেই সময় অন্য কোন 'ইলাহ্'র সামনে নতি স্বীকার করতে হবেই। কেননা 'ইলাহ্' গ্রহণ না করলে তার প্রকৃতি নিহিত বোধ অন্য কিছু দিয়ে ভরাট হতে পারে না।

এ কথা এখানেই শেষ নয়। আরও অগ্রসর হয়ে বলা চলে, এক আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যারা অন্য কাউকে মা'বুদ বানায়, পরম মানসিক সুখ ও প্রশান্তি থেকে তাদের বঞ্চিত থাকা অবধারিত। সন্তানহীন কোন মা যদি পুতুল কিনে কোলে নেয়, বুকে জড়িয়ে ধরে তা দিয়ে সন্তান বাৎসল্যজনিত মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে চেষ্টা করে, তাহলে ব্যাপারটা যেমনি দাঁড়ায়, এও ঠিক তেমনি। একজন আল্লাহ্-অবিশ্বাসী নাস্তিক বৈষয়িক জীবনে যত সাফল্যই লাভ করুক, তার জীবনে এমন সব মুহূর্ত অবশ্যই আসবে, যখন সে বেদনার সাথে অনুভব করতে বাধ্য হবে যে, সে যা কিছু লাভ করেছে তা শুধু আত্ম প্রবঞ্চনা। আসল ব্যাপার এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং সে তার থেকে অনেক দূরেই রয়ে গেছে।

পন্ডিত নেহেরু ১৯৩৫ সনে কারাগারে বন্দী অবস্থায় আত্মজীবনী রচনা সম্পূর্ণ করে তার শেষে লিখেছেন, 'আমি মনে করি, আমার জীবনে একটা অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে। এক্ষণে তার দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হবে। এ অধ্যায়ে কি হবে—কি ঘটবে, সে সম্পর্কে আমি কিছুই অনুমান করতে পারিনে। জীবন-গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায় তালাবদ্ধ।'

-Neheru Autobiography, London, 1953, p. 597

উত্তরকালে নেহেরু-জীবনের 'পরবর্তী অধ্যায়' উম্মুক্ত হলে দেখা গেল, তিনি বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী এবং দুনিয়ার জনসংখ্যার ষষ্ঠ অংশের উপর নিরংকুশ অধিকারের শাসন চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এই পাওয়া কি তাঁকে পরিতৃপ্ত, নিশ্চিন্ত করেছিল? তিনি তাঁর জীবনের চরম উন্নতির কালেও তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন জীবনগ্রন্থের অনেক পৃষ্ঠাই তখনও তালাবদ্ধই রয়েছে। তাঁর জীবনের শেষভাগে সেই প্রশ্নটিই তাঁর মন ও মানসলোকে প্রবলভাবে আবর্তিত হচ্ছিল ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই প্রশ্নটি নিয়েই তো প্রতিটি মানুষ ধূলির ধরণীতে জন্মগ্রহণ করে। ১৯৬৪ সনের জানুয়ারী মাসে নতুন দিল্লীতে প্রাচ্যবিদদের (Orientalists) আন্তর্জাতিক কংগ্রেস অধিবেশনে ভারত ও অন্যান্য দেশ থেকে বারোশত প্রতিনিধি যোগদান করেন। এক পর্যায়ে পন্ডিত নেহেরু ভাষণদান প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি একজন রাজনীতিবিদ। চিন্তা-ভাবনার সুযোগ ও অবসর আমার খুবই কম। তা সত্ত্বেও অনেক সময় আমি একথা ভাবতে বাধ্য হই যে, এ দুনিয়াটা আসলে কি, কেন এই জগৎ? আমরা কি, আমরা কি করছি? আমার প্রত্যয় রয়েছে, এমন কিছু শক্তি আছে, যা আমাদের নিয়তি নির্ধারণ করে থাকে।' —National Herald, Jan. 6, 1964

www.pathagar.com

বস্তুত অনিশ্চয়তাবোধের এ এক কঠিন উদ্বেগ। আল্লাহ্‌কে নিজের একমাত্র ইলাহ্ ও মা'বুদরূপে গ্রহণ করতে অস্বীকারকারী লোকের হৃদয়-আকাশে গাঢ় কুয়াশার ন্যায় সমাচ্ছন্ন হয়ে আছে এই অনিশ্চয়তাবোধের উদ্বেগ। বৈষয়িক ব্যতিব্যস্ততা ও সাময়িক আনন্দ স্রোতে কখনও কখনও মনে হয়, পরম মানসিক প্রশান্তি লাভ হয়েছে এবং উদ্বেগ-অনিশ্চয়তাবোধের মাতামাতি স্তব্ধ হয়েছে। কিন্তু এ ধারণা ক্ষণস্থায়ী ও এই কৃত্রিম পরিবেশ নিঃশেষ হয়ে যেতেই প্রকৃত মহাসত্য ভেতর থেকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে। আর তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সত্যিকার পরিতৃপ্তি, নিশ্চিন্ত ও চরিতার্থতা থেকে সে এখনও বঞ্চিতই রয়ে গেছে।

আল্লাহ্‌তে অবিশ্বাসী লোকদের মন-মানসের এ অবস্থা শুধু একটা বৈষয়িক ও জৈবিক অস্থিরতা-অশান্তির ব্যাপারই নয়। এটা তার চাইতেও অনেক বেশী গুরুতর ও এক স্থায়ী সমস্যা। আসলে এ এক অন্ধকারাচ্ছন্ন ও আশ্রয়-বঞ্চিত জীবনের লক্ষণ। এই জীবন নিয়েই সে বেঁচে আছে। এ এক ভয়াবহ জীবনের প্রাথমিক সংকোচন। এই ধরনের প্রত্যেক ব্যক্তিই মৃত্যুর পর এরই সম্মুখীন হতে বাধ্য হয়। এটা এমন এক কঠিন বিপদের আগাম সংকেত, তার আত্মাকে শেষ পর্যন্ত এতেই নিমজ্জিত হতে হবে। এ হচ্ছে কাফির, মাশরিকদের জন্য তৈরী করা জাহান্নামের ধুঁয়া বিশেষ। ঘরে আগুন লাগলে তার ধুঁয়া নিদ্রিত ব্যক্তির নাকের ছিদ্রপথে মগজে প্রবশ করে তাকে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দেয়। ধুঁয়ার ঝাঁঝে জাগ্রত হয়ে সে যদি ছুটে ঘরের বাইরে চলে যায় তাহলে সে নিজেকে আগুনের লেলিহান শিখা থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে অগ্নিশিখা যদি নিকটেই পৌছে যায় এবং আগুনের তাপ স্পর্শে সে যদি ঘুমন্ত অবস্থা থেকে জাগ্রত হয় তাহলে তখনকার জাগৃতি তার কোনই কাজে আসে না। সে পুড়ে মরে। এ থেকে প্রমাণিত হয় মানুষের চেতনাহীনতাই তার আগুনের ভস্ম হওয়া ললাট লিখন ছিল। কাজেই চূড়ান্ত পরিণতির নিকটবর্তী হওয়ার পূর্বেই জাগ্রত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সামাজিক জীব হিসেবে সবাইকে নিজেদের সততা ও ন্যায়পরতার একটা বিশেষ মানদন্ডে দৃঢ়ভাবে গড়ে তোলা অপরিহার্য প্রয়োজন। এ ছাড়া সমাজ ও সভ্যতার কাঠামো কস্মিনকালেও সঠিক রূপে গড়ে উঠতে এবং স্থায়ী হতে পারে না। কিন্তু বিশ্বস্রষ্টা ও সর্বনিয়ন্তা আল্লাহ্‌কে বাদ দিলে এ প্রয়োজন পূরণ করা কিভাবে সম্ভব হতে পারে, তা মানুষ জানে না। শত শত বছরের অভিজ্ঞতার পরও মানুষ তারই সন্ধানেউদ্‌ভ্রান্ত।

জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যে উহার উত্তম সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য 'ভাল স্বভাবের সপ্তাহ' উদ্‌যাপন করা হয় বিভিন্ন দেশে। কিন্তু তারপরও সরকারী কর্মচারীদের অফিসারসুলভ মন-মানসিকতা ও আচার-আচরণ দূর হয় না। তখন বোঝা যায়, এ উদ্দেশ্যে 'চরিত্রের' দোহাই যথেষ্ট নয়। বিনাটিকিটে রেলভ্রমণের প্রবণতা রোধ করার উদ্দেশ্যে সব ষ্টেশনে বড় বড় পোষ্টার লাগানো হয়, 'বিনাটিকিটে রেল ভ্রমণ সামাজিক অপরাধ' (Ticketless travel is a social evil)।

কিন্তু তা সত্ত্বেও বিনাটিকিটে রেলভ্রমণের প্রকোপ যখন হ্রাস পায় না, তখন প্রমাণ হয় যে, 'সামাজিক অপরাধ' কথাটি লোকদের মনে এমন অনুভূতি জাগায় না, যা নিয়ম-শৃঙ্খলা পালনে মানুষকে উদ্বুদ্ধ ও একনিষ্ঠ করতে পারে। পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়, Crime does not pay—'অপরাধের পরিণতি শুভ হয় না'। কিন্তু অপরাধের ক্রমবৃদ্ধি চোখে আঙ্গুল দিয়ে বলে দেয়, বৈষয়িক ক্ষতি বা বিপদের ভয়ের মধ্যে এমন শক্তির অভাব যা মানুষকে অপরাধ থেকে বিরত রাখতে পারে। শহর-নগর ও অফিস-আদালতের প্রাচীন গাত্রে নানা ভাষায় ও বড় বড় অক্ষরে লিখে রাখা হয়, 'ঘুষ নেয়া ও ঘুষ দেয়া উভয়ই পাপ।' কিন্তু একটি লোক যখন নিজ চক্ষে দেখতে পায়, এই বিজ্ঞাপনের ঠিক নিচে বসেই ঘুষের কারবার প্রবল বেগে ও নির্বিঘ্নে চলছে, তখন সে একথা মানাতে বাধ্য হয় যে, এ ধরনের প্রচারণা ঘুষ নেয়া দেয়া বন্ধ করার ব্যাপারে কিছুমাত্র অবদান রাখতে পারে না। রেলের কক্ষে কক্ষে এই মর্মে বিজ্ঞাপন লাগানো হয়, 'রেলওয়ে জাতীয় সম্পদ। তার ক্ষতি জাতীয় ক্ষতির শামিল।' কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি রেলগাড়ীতে চড়েই দেখতে পাবেন, তার বহু প্রয়োজনীয় মাল-সামান খোয়া গিয়েছে। এতে করে কি একথা প্রমাণ হয় না যে, জাতীয় স্বার্থের দোহাইও জাতীয় সম্পদ ও সম্পত্তি রক্ষা করতে সক্ষম নয়? 'জাতীয় স্বার্থ' কথাটায় হয়ত এতটা শক্তি নেই যা মানুষকে জাতীয় স্বার্থের জন্যে ব্যক্তিস্বার্থ কুরবান করতে প্রস্তুত করতে পারে।

"জাতীয় উপায়-উপকরণ ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করা দেশ ও জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা মাত্র।" নানা দেশের বরেণ্য নেতা ও শাসক শ্রেণীর লোকদের মুখে এ ধরনের বক্তৃতা, ভাষণ খৈ-এর মত ফোটে এবং আসর মাত করে দেয়। কিন্তু সেই সঙ্গে বড় সড় জাতীয় প্রকল্প ব্যর্থ হয়ে যায় শুধু এ কারণে যে, তার জন্যে বরাদ্দকৃত অর্থের সিংহভাগই সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল লোকদের পকেটে চলে গেছে। চোরাচালান ও চোরাকারবারের ব্যাপারটিও এই একই রকম। এসবের বিরুদ্ধে জাতীয় সম্পদের ক্ষতি ও জনগণের দুঃখ কষ্ট বৃদ্ধির কথা বলে লোকদের এ থেকে বিরত থাকতে সরকারীভাবে যত নির্দেশ জারি করা হচ্ছে, ততই দুর্নীতির মাত্রা ও প্রকোপ বেড়েই যাচ্ছে। ফলে শত চেষ্টা-প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জাতীয় পুনর্গঠনের জন্যে জরুরী মান (standard) থেকে গোটা জাতিই বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। বিশেষ একটি দেশ সম্পর্কে নয়, বর্তমান দুনিয়ার প্রায় প্রতিটি দেশ ও জাতি সম্পর্কেই এই কথা প্রযোজ্য। জাতীয় পুনর্গঠনের জরুরী 'মান' সৃষ্টির জন্যে যত উপায়ই অবলম্বন করা হচ্ছে, প্রায় সবই চরমভাবে ব্যর্থ প্রমাণিত হচ্ছে।

এসব নিদর্শন একটি কথাকেই প্রকট করে তুলেছে তা হচ্ছেঃ আল্লাহ্‌বিহীন সমাজ ও সভ্যতা বিশ্ব-মানবতাকে একটি কর্দমাক্ত গভীর নর্দমায় ফেলে দিয়েছে। যে রেল লাইনের উপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে মানবতার গাড়ী খুবই সহজ ও সরলভাবে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পারতো, বর্তমান আল্লাহ্‌বিহীন জীবন-দর্শন মানবতাকে তা থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে। আজকের মানুষের জীবন নোঙ্গরহীন, পালহীন ও হালহীন নৌকার মত

www.pathagar.com

মহাসমুদ্রে পড়ে খাবি খাচ্ছে। এ নৌকা কি করে এ ঝঞ্জা বিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রের বুকে রক্ষা পেয়ে নির্বিঘ্নে বন্দরে পৌছতে পারবে, তা এসব সমাজ কান্ডারী ও রাষ্ট্রনায়কদের আদৌ জানা নেই। তাঁরা নিজেরাও মোটামুটিভাবে দিশেহারা।

এ অবস্থার একমাত্র সমাধান হচ্ছে, আল্লাহ্‌র দিকে বিশ্বমানবতার প্রত্যাবর্তন। আল্লাহ্‌র দেয়া বিধানের ভিত্তিতে জীবন ও সমাজের পুণর্গঠন; ধর্মের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতায় পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন। মানব জীবনের পুনর্গঠনের জন্য এটাই হচ্ছে সর্বোত্তম—শুধু সর্বোত্তম কেন, একমাত্র ভিত্তি। এ ছাড়া অন্য কোন ভিত্তির উপরই মানবজীবনের পুনর্গঠন, প্রচেষ্টা সুন্দর, নির্মল ও সম্ভব হতে পারে না।

ভারতে আমেরিকার এক সময়ের রাষ্ট্রদূত মিঃ চেষ্টার বৌল্‌স্‌ (Chester Bowles) লিখেছেন, 'উন্নয়নশীল দেশগুলো শিল্পোন্নয়ন অর্জন পর্যায়ে দুই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন, আর দুটো সমস্যাই অত্যন্ত জটিল। একটি হলো —মূলধন, কাঁচামাল ও শিল্পদক্ষতা যদি তাদের থেকেও থাকে, তবু উত্তম পন্থায় অধিক সাফল্যজনকভাবে তার ব্যবহার কিরূপে করা যেতে পারে, তার সমস্যা। —আর দ্বিতীয় জটিল সমস্যার সম্পর্ক হচ্ছে সে সব দেশের জনগণ ও প্রতিষ্ঠানের সাথে। শিল্পের দ্রুত উন্নয়নের সাথে সাথে যত দোষ আর খারাবি দূর হবে তার চাইতে অধিক দোষ ও খারাবি যাতে সৃষ্টি না হয় তার নিশ্চয়তা লাভ করাও আমাদের জন্য জরুরী। মিঃ গান্ধীর ভাষায়, 'বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-তথ্য লাভ ও আবিষ্কার-উদ্ভাবন শুধু লোভ ও লালসা বৃদ্ধির উপায় ও হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াতে পারে। আসলে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে স্বয়ং মানুষ।' —The Making of a just Society, Delhi, 1963, p. 64-69

বৌলসের ভাষায় জনগণই হচ্ছে পরিবেশ। তারই ক্ষেত্রে উন্নয়ন কার্যসূচী চালু করা হয়। উন্নতির জন্য জরুরী দ্রব্য সম্পদ, মূলধন ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রভৃতি সামাজিক ও রাজনৈতিক শূন্যতার মধ্যে কখনও কার্যকর হতে পারে না।

কিন্তু এ শূন্যতা কি করে ভরাট করা যেতে পারে? যে পরিবেশে জনগণ ও সরকারী কর্মচারী সততা, বিশ্বস্ততা ও পারস্পরিক ভিত্তিতে উন্নয়ন কার্যাবলীতে নিজ নিজ অবদান রাখতে পারে, সে ধরনের সমাজ-পরিবেশ কি করে গড়ে উঠতে পারে? আধুনিককালের চিন্তাবিদদের নিকট এ প্রশ্নের কোন জবাব নেই। আর বস্তুতই আল্লাহ্‌বিহীন সভ্যতার পরিবেশে তা হতেও পারে না। এ ধরনের সমাজ-পরিবেশে সব উন্নয়ন প্রকল্পই একটা কঠিন বৈপরীত্যের সম্মুখীন। তা হলো, ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ ও সামাজিক সামষ্টিক দৃষ্টিকোণের মধ্যে দ্বন্দ্ব। এসব দেশের সামাজিক সামষ্টিক কার্যক্রম হচ্ছে একটা শান্তিপূর্ণ ও সচ্ছল সমাজ গঠন। কিন্তু সেই সঙ্গে তার চিন্তাবিদ্‌গণ যখন বলেন, 'বস্তুনিষ্ঠ আনন্দ ও সন্তোষ তৃপ্তি লাভই হচ্ছে মানুষের লক্ষ্য।' তখন তাঁরা নিজেরাই নিজেদের আগে-বলা কথার প্রতিবাদ করেন, তার অসত্যতা ঘোষণা করেন। তাঁরা সমাজকে যেভাবে দেখতে চান, ব্যক্তিদের গড়ে তোলেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবধারায়। এই কারণেই এ ধরনের জাতীয় প্রকল্পসমূহ মূল লক্ষ্যের দৃষ্টিতে আজ

www.pathagar.com

পর্যন্ত সাফল্য লাভ করতে পারেনি। সব বস্তুনিষ্ঠ জীবন দর্শনই সর্বোত্তম সমাজ গড়ে তুলতে অত্যন্ত করুণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন।

বস্তুনিষ্ঠ আনন্দ ও সন্তোষ-তৃপ্তিলাভকে জীবন-লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করা হলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাসনা-কামনা চরিতার্থ করতে চেষ্টা করবে স্বাভাবিকভাবে। কিন্তু অন্যের স্বার্থে আঘাত না দিয়ে—তার অংশ থেকে চুরি বা অপহরণ না করে, নিজের কামনা-বাসনা পুরোপুরিভাবে কেউ পূর্ণ করতে পারে না। তার ফলে এক ব্যক্তি যখন নিজের সব কামনা-বাসনা পূর্ণ করতে চেষ্টা করে তখন সমাজের শত মানুষের উপর কঠিন বিপদ ঘনিয়ে আসে অনিবার্যভাবে। ব্যক্তির আনন্দ ও সন্তোষ সমাজের স্বার্থ ও সন্তোষকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। একটা সীমাবদ্ধ আয়ের ব্যক্তি যখন দেখতে পায় যে, তার ন্যায্য আয় তার যাবতীয় বাসনা পরিপূরণের যথেষ্ট হচ্ছে না, তখন সে অন্য লোকদের অধিকার হরণ, বিশ্বাস ভঙ্গ, চুরি, ডাকাতি, লুটতরাজ, ঘুষ, চোরাকারবারের ন্যায় বড় বড় অপরাধজনক উপায় অবলম্বন করে অভাব পূরণ করতে শুরু করে দেয়। কিন্তু এভাবে এক ব্যক্তি তার একার বাসনা-কামনা চরিতার্থ করে গোটা সমাজকে সেই নিদারুণ দৈন্যের চোরাবালিতে নিক্ষেপ করে, যার মধ্যে সে নিজেই ফেঁসে গিয়েছিল।

আধুনিক জগৎ আর একটি মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন। ইতিহাসে কখনও এই ধরনের কোন বিপদের অভিজ্ঞতা মানবতা লাভ করেছে এমনটা দেখা যায় না। এটা হল শিশু অপরাধ প্রবণতা (Juvenile delinquency)। বর্তমান সমাজ জীবনের এটি এক অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এই শিশু অপরাধীরা কোথা থেকে আসে? বস্তুনিষ্ঠ পরিতৃপ্তি ও চরিতার্থতা লাভের সমাজ মানসিকতাই হলো এদের জন্ম—উৎস। একটি বিবাহিত দম্পতি কিছুদিন একসঙ্গে বসবাস করার পর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণহীন হয়ে পড়ে এবং নিজ নিজ যৌনতৃপ্তি লাভের জন্য যে যার পথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত তারা তালাক গ্রহণ করে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই বিচ্ছেদের মূল্য হিসেবে সমাজকে গ্রহণ করতে হয় কতকগুলো অনাথ শিশুর লালন-পালনের দায়িত্ব, যারা তাদের পিতা-মাতা জীবিত থাকতেও 'ইয়াতীম'। এসব শিশু পিতা-মাতার আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর সমাজ-পরিবেশে কোন স্থান পায় না। একদিকে তারা হয় বিলকুল মুক্ত ও আযাদ, আর অন্যদিকে সমাজ পরিবেশের প্রতি আস্থাহীন। এই অবস্থাই তাদের মারাত্মকভাবে অপরাধ প্রবণ বানিয়ে দেয়।

স্যার আলফ্রেড ডেনিং (Alfred Denning) ঠিকই বলেছেন, 'অল্প বয়স্ক ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের অধিকাংশই ভেঙ্গে যাওয়া পরিবার (broken homes) থেকেই আত্মপ্রকাশ করে থাকে।"
—The Changing Law,p. III

বস্তুত বর্তমান জীবনের সর্ব প্রকার খারাবি ও বিপর্যয়ের মূল কারণ হলো, আধুনিক দুনিয়ার ব্যক্তিগত দর্শন ও সামাজিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পরস্পর বিরোধী। যেসব ঘটনাকে আমরা অবাঞ্ছিত বলে মনে করি—অপরাধ, অন্যায় ও উচ্ছৃঙ্খলতা বা দুষ্কৃতি—আসলে

www.pathagar.com

তা কোন না কোন ব্যক্তির কিংবা দলের অথবা শ্রেণীর বা জাতির নিজস্ব বস্তুনিষ্ঠ সুখ-সন্তোষ ও আনন্দ লাভ করার চেষ্টা-প্রচেষ্টা মাত্র। আর এই চেষ্টা-প্রচেষ্টারই সামাজিক পরিণতি হচ্ছে নরহত্যা, অত্যাচার, হানাহানি, মারামারি, লুটতরাজ, নারীহরণ, জালিয়াতি, চুরি-ডাকাতি, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও এই ধরনের আরও বহু অপকীর্তি। এ সবের মাধ্যমে এ বস্তুনিষ্ঠ জীবন দর্শনের বাস্তব প্রকাশ ঘটে। আর এই হচ্ছে পারস্পরিক বৈপরীত্য, অসঙ্গতি ও সামঞ্জস্যহীনতার সুস্পষ্ট প্রকাশ।

এই বৈপরীত্য মানবজীবনকে এক কঠিন সংঘাতের সম্মুখীন করে দিয়েছে। কাজেই এ থেকে রক্ষা পেতে হলে জীবন-দর্শনের মৌলিক পরিবর্তন একান্ত অপরিহার্য। দুনিয়ার ব্যক্তিগত জিনিসসমূহের পরিবর্তে পরকালে আল্লাহ্র সন্তোষলাভকে ব্যক্তি তথা সামাজিক জীবনের চরম ও পরম লক্ষ বলে গ্রহণ করতে হবে। ব্যক্তি ও সমাজকে পারস্পরিক বৈপরীত্য থেকে মুক্ত করে পারস্পরিক সহযোগিতা, আনুকূল্য ও পরিপূরকতার মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে। ব্যক্তি, সমাজ ও জাতিকে সুষম উন্নতি ও প্রগতির পথে অগ্রসরমান করতে এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। আর এটা হচ্ছে পরকাল বিশ্বাসের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, উন্নয়নমূলক প্রকল্পের যথার্থ সাফল্য লাভের এই হচ্ছে একমাত্র ভিত্তি। সেই সঙ্গে একথাও পরিষ্কার বোঝা যায় যে, মানুষের প্রকৃত জীবন-লক্ষ্য এটাই। কোন অপ্রকৃত জিনিস জীবনের জন্য এতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং তার সাথে এতটা সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে না কখনও।

এ যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও অস্ত্রোপচার পদ্ধতি বিস্ময়কর উন্নতি লাভ করেছে। মৃত্যু ও বার্ধক্য ছাড়া অন্য সর্ব প্রকার দৈহিক রোগ, জরা ও কষ্টের প্রতিবিধানে বিজ্ঞান চরম সাফল্য অর্জন করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু সেইসঙ্গে নতুন নতুন কত যে রোগ দেখা দিচ্ছে নতুন নামে,-তার ইয়ত্তা নেই। স্নায়ুবিক রোগ (Nervous disease) একটা নতুন নাম। কিন্তু এই স্নায়ুবিক রোগটা আসলে কি? আধুনিক সমাজ যে কঠিন বৈপরীত্যে বিপর্যস্ত, এ তারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। বস্তুনিষ্ঠ সভ্যতা মানুষের লবণ, ধাতু ও গ্যাস মিশ্রিত অংশের পরিচর্যায় যথেষ্ট শক্তি ও গুরুত্ব আরোপ করেছে। মানুষের চেতনা, ইচ্ছা ও বাসনা সমন্বিত অংশকে তার প্রয়োজনীয় খোরাক থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। ফলে প্রথম অংশটি বাহ্যত পরিপুষ্ট ও সুষম হয়ে উঠেছে কিন্তু দ্বিতীয় অংশ নানাবিধ রোগ-ব্যাধিতে জর্জরিত। অথচ মানবসত্তার প্রকৃত মানবীয় অংশ মানুষ—এই অংশেই নিহিত।

আধুনিক আমেরিকা সম্পর্কে সেখানকার দায়িত্বশীল সূত্রসমূহের অনুমান হচ্ছে, তাদের বড় বড় শহরে শতকরা আশিটি রোগী মৌলিকভাবে মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণে (psychic causation) সংঘটিত হচ্ছে। মনস্তত্ত্ববিদগণের অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে, এই রোগ দেখা দেয়ার কয়েকটি মৌলিক কারণ হলো অপরাধ-প্রবণতা, অসন্তোষ ভীতি, আশংকাবোধ, উদ্বেগ, নৈরাশ্য ও হতাশা, দ্বিধা, সংকোচ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষমতা, সংশয়, হিংসা-দ্বেষ, স্বার্থপরতা, একঘেঁয়েমিজনিত বিরক্তি (Boredom)

www.pathagar.com

প্রভৃতি। এসব উপসর্গ সম্পর্কে গভীরভাবে বিবেচনা করলে এ কথাই স্বীকার করতে হবে যে, এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্‌বিহীন জীবনের অনিবার্য পরিণতি। আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান মানব মনে দৃঢ় প্রত্যয় ও আস্থার সৃষ্টি করে। আর এই প্রত্যয়ই জীবনের সর্বপ্রকার জটিলতার আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায়। ঈমান একটা উচ্চতর লক্ষ্য মানুষের সামনে তুলে ধরে। ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্দেশ্যগুলো তার নিকট নগণ্য হয়ে দাঁড়ায়, ছোট-খাটো সমস্যা সহজ হয়ে যায়, চরম উন্নতি লক্ষ্যপানে তার চলা হয় নির্বিঘ্ন। ঈমান তার মনে এনে দেয় একটা প্রবল কর্মপ্রেরণা। এই কর্মপ্রেরণাই সব নৈতিক বিশেষত্ব ও সৌন্দর্যের একমাত্র ভিত্তি। ঈমান মানব মনে জাগিয়ে দেয় একটা প্রবল প্রতীতি (বিশ্বাস) শক্তি। এই প্রতীতি সম্পর্কে স্যার উইলিয়াম ওসলে (Sir Willam Osle) বলেছেনঃ তা এমন এক বিরাট গতিশীল শক্তি (Great moving force), যা কোন দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন করা যায় না, না কোন লেবরেটরীতে যাচাই করা যায়।'

বিশ্বাসের এই শক্তিই মূলত মনস্তাত্ত্বিক সুস্থতার মৌল উৎস। যার মানসলোকে এ শক্তির স্ফূরণ ঘটেনি, তা যে নানাবিধ রোগ-ব্যাধির ক্ষেত্রে পরিণত হবে, তা বিচিত্র কি! আর এরূপ মন ও মানস নানাবিধ রোগ-ব্যাধির শিকার হওয়া ছাড়া অন্য কোন পরিণতি যে আদপেই নেই তা বলাই বাহুল্য। এ কালের বিশেষজ্ঞরা মনস্তাত্ত্বিক কিংবা স্নায়ুবিক রোগ-ব্যাধির কারণ নির্ণয়ে বিস্ময়কর মেধা ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু এ সব নবোদ্ভূত রোগ-ব্যধির নির্ভুল চিকিৎসার পন্থা বের করতে তাঁরা মর্মান্তিকভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। একজন খৃষ্টান পন্ডিতের উক্তি অনুযায়ী, 'আমাদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার দ্বার বন্ধকারী তালাটির বিস্তারিত বিবরণ দানে মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসাবিদগণ (Psychiatrists) প্রাণপণে চেষ্টা চালিয়েছেন মাত্র।'

আধুনিক সমাজ একই সময় দুটি বিপরীত-ধর্মী কাজ করছে। একদিকে তা বস্তুগত সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করছে, আর অন্যদিকে ধর্মকে ত্যাগ ও উৎখাত করে এমন পরিস্থিতি উদ্ভব করছে, যার ফলে জীবন ও সমাজকে নানা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে বাধ্য করছে। একদিকে রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে ঔষধ সেবন করাচ্ছে, অন্যদিকে বিষের ইনজেকশন দিচ্ছে। আমেরিকান চিকিৎসাবিদ ডাঃ পাউল আর্নেস্ট এ্যাডলফ (Paul Earnest Adloph)-এর একটি উদ্ধৃতি এখানে বিশেষ উল্লেখ্য। তিনি বলেছেন, 'যখম হলে দেহে সূক্ষ্ম প্রোথিত কোষসমূহ (Body tissues) যেসব পরিবর্তন দেখা যায়, সে বিষয়ে আমি মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র থাকা অবস্থায়ই তা অবহিত হয়েছিলাম। অণুবীক্ষণের সাহায্যে কোষসমূহের পর্যবেক্ষণে আমি লক্ষ্য করলাম যে, কোষসমূহের উপর বিভিন্ন অনুকূল প্রভাব পড়ায় যখম খুব ভালভাবে সেরে উঠে। শিক্ষা সমাপ্ত করে আমি যখন চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবেশ করলাম, তখন আমার একটা আত্মবিশ্বাস ছিল যে, যখম সারার নিয়ম আমি এতটা জানি যে, চিকিৎসা সংক্রান্ত জরুরী উপকরণ প্রয়োগ করলে আমি নিশ্চিত অনুকূল ফল সৃষ্টি করতে সক্ষম। কিন্তু বেশীদিন না যেতেই এ আত্মবিশ্বাসে একটা বড় আঘাত লাগল।

www.pathagar.com

আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম, আমি মেডিকেল বিজ্ঞানে এমন একটা উপাদানকে উপেক্ষা করেছিলাম, যা ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আর তা হচ্ছে—আল্লাহ্।

হাসপাতালে যেসব রোগী দেখার ভার আমার উপর অর্পিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে একজন ছিল সত্তর বছরের বুড়ী। তার পাছায় যখম হয়েছিল। এক্স-রে ছবি দেখে জানা গেল যে, সূক্ষ্ম কোষসমূহ (Tissues) খুব দ্রুত ভাল হয়ে আসছে। দায়িত্বশীল (Incharge) সার্জন ২৪ ঘন্টার মধ্যে এই বুড়িকে বিদায় করে দেয়ার জন্যে আমাকে নির্দেশ দিলেন, কেননা এখন সে কোনরূপ অবলম্বন ছাড়াই চলাফেরা করতে পারছিল।

রোববার দিন সাপ্তাহিক সাক্ষাতের জন্য তার মেয়ে হাসপাতালে উপস্থিত হলে। আমি তাকে বললাম, তার মা যেহেতু নিরাময় হয়ে গেছে, সে যেন আমাগীকাল এসে তাকে বাড়ী নিয়ে যায়। মেয়েটি একথার জবাবে কিছু না বলে সোজা তার মার নিকট চলে গেল। সে তার মাকে বলল, সে তার স্বামীর সাথে এ সম্পর্কে পরামর্শ করেছে এবং সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, তাকে বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না, বরং তার চাইতে ভাল ব্যবস্থা হিসেবে তাকে কোন 'বুড়োদের কেন্দ্রে (Old people's home) পৌছিয়ে দেয়া হবে।

কয়েক ঘন্টা পর আমি যখন সেই বৃদ্ধার নিকট গেলাম, আমি লক্ষ্য করলাম, খুব দ্রুত বৃদ্ধার অবস্থার অবণতি হচ্ছে। পরে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই তার মৃত্যু হলো। তবে যখমের কারণে নয়, বরং মনে আঘাত লাগার কারনে (Not of her broken hip, but of a broken heart)।

আমি সর্ব প্রকার চিকিৎসা উপায়ে তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে বাঁচল না। তার নিতম্বের অস্থি তো সম্পর্ণূ ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার ভাঙ্গা মনের কোন চিকিৎসা করা সম্ভব হয়নি। ভিটামিন, ধাতব পদার্থ এবং ভাঙ্গা হাড় যথাস্থানে নিয়ে আসার সব উপায় প্রয়োগ করা সত্ত্বেও সে সুস্থ হতে পরল না, বাঁচলো না কেন? এ জন্যেই যে,তার সুস্থতার জন্যে যে উপাদানটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা কোন ভিটামিন নয়, কোন ধাতব পদার্থ অথবা অস্থিগুলোর জোড়া লাগা ও যখম সেরে যাওয়াও নয়। সে একমাত্র জিনিসটি হলো আশা ও আকাঙ্খা (Hope)। জীবনের আশাই যখন নিঃশেষ হয়ে গেল, তখন তারই অনিবার্য প্রভাবে তার স্বাস্থ্যও শেষ হয়ে গেল।

এ ঘটনাটি আমার মধ্যে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কেননা আমার স্পষ্ট মনে হচ্ছিল, এ বৃদ্ধা যদি আল্লাহ্-ভিত্তিক আশা-আকাঙ্খার (God of Hope) সাথে পরিচিত হতো—যেমন আমি একজন খৃস্টান হিসেবে বিশ্বাস রাখি—তাহলে তাকে এরূপ দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হতো না। —The Evidence of God, p. 212-14

আধুনিক উন্নত জগৎ কি ধরনের বৈপরীত্যের সম্মুখীন, তা এ দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। এ জগতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমনিভাবে উৎকর্ষ সাধন করা হচ্ছে, যার ফলে আল্লাহ্র অস্তিত্ব না থাকার শামিল হয়ে যায়। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাই

www.pathagar.com

আল্লাহ্ ও ধর্মের প্রতি বিশ্বাস ও সংবেদনশীলতাকে মানবমন থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করে দিচ্ছে। আসল মানুষটিকে মৃত্যু ও অনিবার্য্য ধ্বংসের সম্মুখীন করে দিয়ে তার দেহ–বস্তু–সত্তাকে উন্নত করে তুলবার চেষ্টা চালানো হচ্ছে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। এরই ফলে ঠিক যে মুহূর্তে ভাঙ্গা হাড়ে জোড়া লাগাবার চেষ্টায় সাফল্য অর্জিত হয়, সেই মুহূর্তেই বিশ্বাসের বুনিয়াদ ভেঙ্গে পড়ার কারণে তার দিলটা ঠুনকো কাঁচের মতো চুরমার হয়ে যায়। বাহ্যিক ও দৈহিক স্বাস্থ্য বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তাকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয়।

এটা সম্পূর্ণ বৈপরীত্য ও অসঙ্গতিরই স্বাভাবিক পরিণতি। বর্তমানে গোটা বিশ্বমানবতাই এই মারাত্মক বৈপরীত্যের আঘাতে চূর্ণ–বিচূর্ণ হচ্ছে। শুভ্র, নির্মল, মূল্যবান পরিচ্ছদে ভূষিত দেহ প্রকৃত শান্তি, সুখ, স্বস্তি ও নিশ্চিন্ত থেকে বঞ্চিত। গগনচুম্বী প্রাসাদসমূহ এ কারণেই আজ উজাড় ও সর্বস্বান্ত দিলের আবাসস্থলে পর্যবসিত। আলো ঝলমল নগরী মারাত্মক ধরনের অপরাধ ও দুঃখ–দৈন্যের লীলাভূমি। সুসংগঠিত ও শক্তিশালী রাষ্ট্র ব্যবস্থা অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র ও অবিশ্বাসের শিকারে হেস্ত–নেস্ত। বড় বড় সোনালী প্রকল্প চরিত্রের ত্রুটি ও দুর্বলতার কারণে ব্যর্থ ও নীল–নক্শার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকছে। এক কথায়, বস্তুগত উন্নতি ও প্রগতি সত্ত্বেও মানুষের জীবন আজ নিঃস্ব, বিপন্ন ও বস্তুশূন্য। এ সবই শুধু একটি কারণের পরিণতি, আর তা হচ্ছে—আজকের মানুষ আল্লাহ্কে ত্যাগ করেছে, তার বৈষয়িক জীবনে আল্লাহ্র বিধান অনুসরণ ও আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের জন্যে তৎপরতা গ্রহণ আজ সম্পূর্নরূপে নিঃশেষিত। মানুষের সৃষ্টিকর্তা মালিক–মনিব তার সামনে জীবনের যে অমিয় উৎস উপস্থাপিত করেছিলেন, আজকের মানুষ নিজেই নিজেকে তা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

মনস্তাত্ত্বিক রোগের পূর্ববর্ণিত স্বরূপ অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রকট এবং তা এক অনস্বীকার্য মহাসত্য। বিজ্ঞানের পারদর্শীরাও এর যথার্থতা ও বাস্তবতা স্বীকার না করে পারেন নি। বিশ্ববিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ অধ্যাপক ইউঙ্গ (G. G. Wng) নিজের সারা জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন এ ভাবে ঃ

বিগত ত্রিশ বছরে পৃথিবীর সব সুসভ্য দেশের লোকেরা আমার নিকট (তাদের মনস্তাত্ত্বিক রোগ–ব্যাধি সম্পর্কে) পরামর্শ চেয়েছে। আমার সেসব রোগীর মধ্যে জীবনের শেষার্ধে উপনীত লোক অর্থাৎ ৩৫ বৎসরের অধিক বয়স্ক লোকদের মধ্যে সর্বশেষ বিশ্লেষণে জীবনের ধর্মনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণ লাভ করা ছাড়া এক ব্যক্তিরও অন্য কোন সমস্যা ছিল না। সত্যি কথা হচ্ছে, এদের প্রত্যেকেরই রোগ ছিল শুধু এই যে, ধর্ম প্রতি যুগে ও পর্যায়ে তার অনুসারীদের যে বস্তুটি দেয় তারা তা হারিয়ে ফেলেছে। উপরন্তু এই রোগীদের মধ্যে একজন লোকও ধর্ম বিশ্বাস পুণরায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত পূর্ণরূপে নিরাময়তা লাভ করতে পারেনি। Quoted by C. A. Coulson : Science And Christian Belief. p. 110

www.pathagar.com

সমঝদার লোকদের পক্ষে এ কথাগুলোতে কোনরূপ অস্পষ্টতা নেই। এগুলো অতীব স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল কথা। তা সত্ত্বেও নিউইয়র্ক একাডেমী অব্ সাইন্স-এর প্রধান, এ ক্রেসী মরিসন-এর নিম্নোদ্ধৃত উক্তির আলোকে আলোচ্য বিষয়টি অধিকতর স্বচ্ছ হয়ে উঠবে। তিনি বলেছেন, (বয়স্কদের প্রতি) আদব ও সম্মান প্রদর্শন, বদন্যতা-ঔদার্য, চরিত্রের বলিষ্ঠতা, নৈতিকতার উচ্চতর আদর্শ এবং এই ধরনের অন্যান্য যেসব গুণ, বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্‌র গুণাবলী (Divine attributes) বলে বিশেষিত ও পরিচিত, তা নাস্তিক্যবাদ ও আল্লাহ্ অবিশ্বাস থেকে কখনই উদ্ভূত হয় না। মূলত এটা হচ্ছে অহমিকার এক অদ্ভুত ধরন। এ ক্ষেত্রে মানুষ নিজেই নিজেকে আল্লাহ্‌র আসনে অধিষ্ঠিত করে। কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস ও প্রত্যয় না থাকার দরুণ সভ্যতা ও সমাজের ধ্বংস অবধারিত। এর ফলে আত্মসংযম ও স্ব-নিয়ন্ত্রণ নিঃশেষ হয়ে যাবে, চারদিকে সর্বাত্মক খারাবি ছড়িয়ে পড়বে। তাই এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান পুনর্গঠন ও দৃঢ়করণ একান্তই জরুরী। —Man does not Stand Alone, p. 123

— সমাপ্ত —

www.pathagar.com

গ্রন্থকার পরিচিতি

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) বর্তমান শতকের এক অনন্যসাধারণ ইসলামী প্রতিভা। এ শতকে যে ক'জন খ্যাতনামা মনীষী ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা কায়েমের জিহাদে নেতৃত্ব দানের পাশাপাশি লেখনীর সাহায্যে ইসলামকে একটি কালজয়ী জীবন-দর্শন রূপে তুলে ধরতে পেরেছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম।

এই ক্ষণজন্মা পুরুষ ১৩২৫ সনের ৬ মাঘ (১৯১৮ সালের ১৯ জানুয়ারী) সোমবার, বর্তমান পিরোজপুর জিলার কাউখালী থানার অন্তর্গত শিয়ালকাঠি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি শর্ষীনা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে আলিম এবং ১৯৪০ ও ১৯৪২ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে যথাক্রমে ফাযিল ও কামিল ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানগর্ভ রচনাবলি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণায় নিরত থাকেন। ১৯৪৬ সালে তিনি এ ভূখণ্ডে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেন এবং সুদীর্ঘ চার দশক ধরে নিরলসভাবে এর নেতৃত্ব দেন।

বাংলা ভাষায় ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) শুধু পথিকৃতই ছিলেন না, ইসলামী জীবন দর্শনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় ৬০টিরও বেশি অতুলনীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'কালেমা তাইয়েবা', 'ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা', 'মহাসত্যের সন্ধানে', 'বিজ্ঞান ও জীবন বিধান', 'বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব', 'আজকের চিন্তাধারা', 'পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি', 'সুন্নাত ও বিদয়াত', 'ইসলামের অর্থনীতি', 'ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন', 'সুদমুক্ত অর্থনীতি', 'ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা', 'কমিউনিজম ও ইসলাম', 'নারী', 'পরিবার ও পারিবারিক জীবন', 'আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ', 'আল-কুরআনের আলোকে শিরক ও তওহীদ', 'আল-কুরআনের আলোকে নবুয়্যাত ও রিসালাত', 'আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার', 'ইসলাম ও মানবাধিকার', 'ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা', 'রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী দাওয়াত', 'ইসলামী শরীয়াতের উৎস', 'অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম', 'অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে ইসলাম', 'শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি', 'ইসলামে জিহাদ', 'হাদীস শরীফ (তিন খণ্ড)' ইত্যাকার গ্রন্থ দেশের সুধীমহলে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছে। এছাড়া অপ্রকাশিত রয়েছে তাঁর অনেক মূল্যবান পাণ্ডুলিপি।

মৌলিক ও গবেষণামূলক রচনার পাশাপাশি বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামী মনীষীদের রচনাবলি বাংলায় অনুবাদ করার ব্যাপারেও তাঁর কোনো জুড়ি নেই। এসব অনুবাদের মধ্যে রয়েছে মওলানা মওদূদী (রহ)-এর বিখ্যাত তফসীর 'তাফহীমুল কুরআন', আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী-কৃত 'ইসলামের যাকাত বিধান (দুই খণ্ড)' ও 'ইসলামে হালাল হারামের বিধান', মুহাম্মদ কুতুবের 'বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত' এবং ইমাম আবু বকর আল-জাস্‌সাসের ঐতিহাসিক তফসীর 'আহকামুল কুরআন'। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যাও ৬০টিরও ঊর্ধ্বে।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)-র অন্তর্গত ফিকাহ্ একাডেমীর একমাত্র সদস্য ছিলেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সূচিত 'আল-কুরআনে অর্থনীতি' এবং 'ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস' শীর্ষক দুটি গবেষণা প্রকল্পেরও সদস্য ছিলেন। প্রথমোক্ত প্রকল্পের অধীনে প্রকাশিত দুটি গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধ তাঁরই রচিত। শেষোক্ত প্রকল্পের অধীনে তাঁর রচিত 'সৃষ্টিতত্ত্ব ও ইতিহাস দর্শন' নামক গ্রন্থটি এখনও প্রকাশের অপেক্ষায়।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) ১৯৭৭ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব ইসলামী শিক্ষা সম্মেলন ও রাবেতা আলমে ইসলামীর সম্মেলন, ১৯৭৮ সালে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ইসলামী দাওয়াত সম্মেলন, একই বছর করাচীতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশীয় ইসলামী মহাসম্মেলন, ১৯৮০ সালে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত আন্তঃপার্লামেন্টারী সম্মেলন এবং ১৯৮২ সালে তেহরানে অনুষ্ঠিত ইসলামী বিপ্লবের তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

এই মনীষী ১৩৯৪ সনের ১৪ আশ্বিন (১৯৮৭ সালের ১ অক্টোবর) বৃহস্পতিবার এই নশ্বর দুনিয়া ছেড়ে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। (ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন)

খায়রুন প্রকাশনী ©

www.pathagar.com